আজকের নেতা

সফল নেতৃত্বের শত কৌশল

এস. এম. জাকির হুসাইন

রোহেল পাবলিকেশনস্
ঢাকা

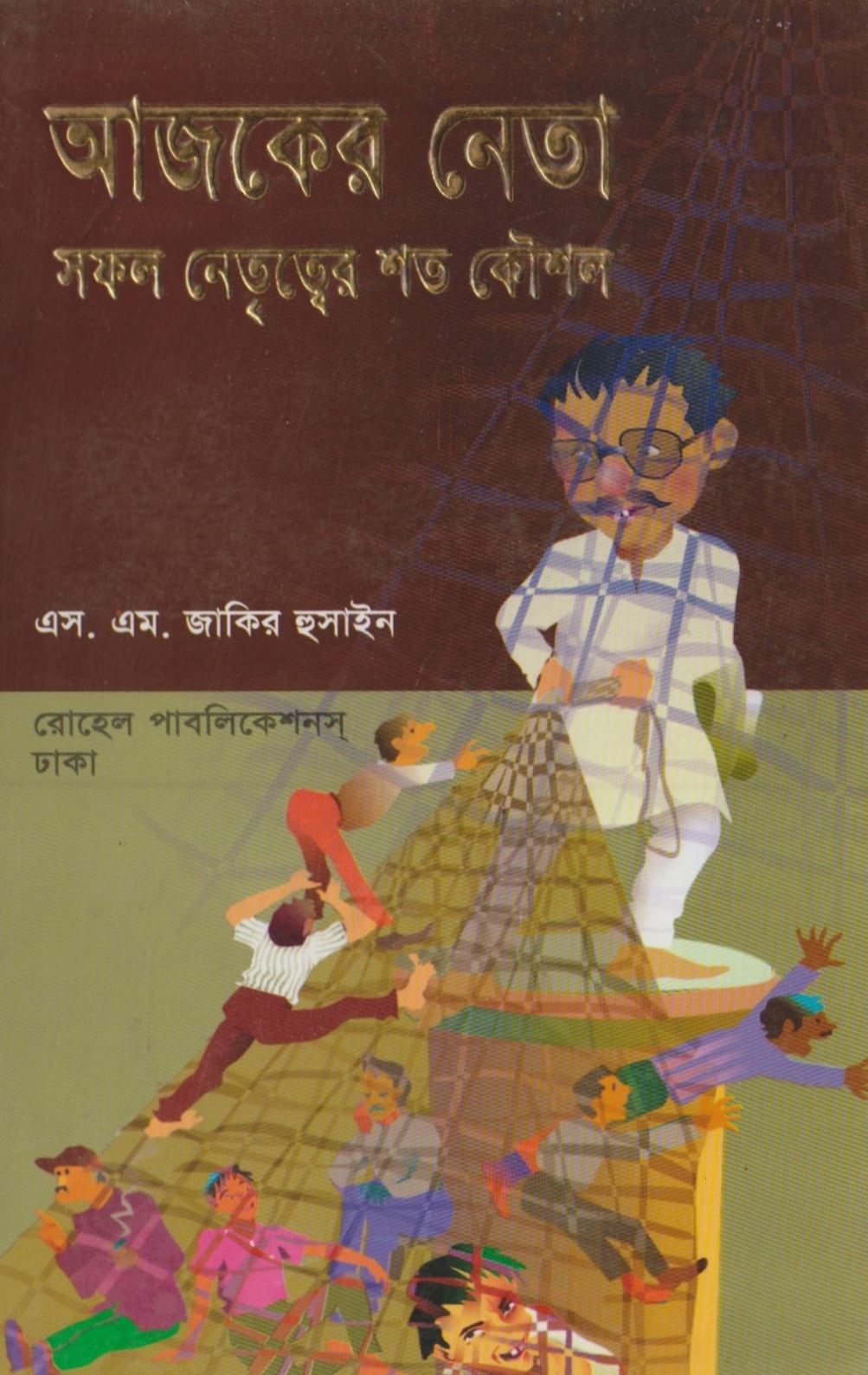

আজকের নেতা

সফল নেতৃত্বের শত কৌশল

এস. এম. জাকির হুসাইন, *MBA*

Author of

Effective Writing Skills for Advanced Learners
Tactics for Effective Reading & Critical Thinking
A Systematic Approach to Critical Reasoning & Analytical Ability
A Passage to the English Language (Grammar)
A High Level English Course (Books 1 & 2)
Word Learning Magic (Books 1 , 2 , & 3)
Tactics for Learning Prepositions
Word Making Tactics (Books 1 & 2)
How to Speak English Fluently
The Anatomy of the English Sentence
Short-Cut Ways of Speaking English
British & American English Differentiated
Tough English Made Simple
Magic Rules of Pronunciation
A Comprehensive Textbook of Degree English
বাংলা ভাষা পরিক্রমা (ব্যাকরণ ও রচনা)
চোখের তলে জলের ঝিলিক (কবিতা)
কল্পকণা (কবিতা)
And Others

রোহেল পাবলিকেশনস্

৩৮/২ক, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

© লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ বা পুরো বইটি ফটোকপির, ছাপার, টাইপিংয়ের, বা হস্তাক্ষরের দ্বারা কপি করা যাবে না, কম্পিউটার বা অন্য কোনো কিছুতে সঞ্চিত ক'রে রাখা যাবে না, কিংবা ই-মেইল বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করা যাবে না।

প্রকাশক
মোঃ সফিউর রহমান

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭

দ্বিতীয় প্রকাশ
মার্চ, ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
লেখক

প্রচ্ছদ অংকন
কম্পিউটার্ট

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে
আল্-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৩৪,পাঁচ ভাই ঘাট লেন (লক্ষীবাজার) ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১২৫.০০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

কৌশলে কি না হয়।

— পঞ্চতন্ত্র

কৌশল একটি গুণ বটে। . . . কিন্তু যদিও তা একটি গুণ, তার সাথে কিছু দোষও জড়িত রয়েছে। কৌশল এবং শঠতার মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম। মূল পার্থক্য নির্ভর করে [কৌশল প্রয়োগকারীর] উদ্দেশ্যের উপর।

— বার্ট্রান্ড রাসেল

কৌশল গোপন করতে পারাই
সবচেয়ে বড় কৌশল।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং
সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্ব
চিরকাল অক্ষুণ্ন থাক এই কামনায় . . .

www.pathagar.com

আপনি কেন নেতা নন, তা না জেনে যেমন আপনি নেতা হতে পারবেন না, তেমনি, আপনি কেন নেতা, তা না জেনেও নেতৃত্বের ক্ষমতা অটুট রাখতে পারবেন না। সুতরাং জানতে হবে—কী আপনি জানেন এবং কী আপনি জানেন না। জ্ঞানই সকল ক্ষমতার উৎস।

তবে এই বইটি আপনাকে জ্ঞান দেবে না, জ্ঞানের সন্ধান দেবে। এখানে জ্ঞান বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি পড়লেই বুঝা যাবে। কোনো বই আপনাকে ক্ষমতা হাতের নাগালে এনে দিতে পারে না, তবে তার সন্ধান দিতে পারে। এই বইটির উদ্দেশ্য ঠিক তাই।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আকাশে সূর্য উঠলে তা দেখার জন্য যেমন টর্চ জ্বালানোর দরকার পড়ে না, তেমনি, সত্যিকার অর্থে উৎকৃষ্ট মানের বই প্রকাশ করতে পারলে তা বেশিদিন আগ্রহী পাঠকের চোখের আড়াল হয়ে থাকতে পারে না। এ কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছি বাংলাদেশের ইদানিংকালের অবিতর্কিত জনপ্রিয় ক্ষমতাধর লেখক এস. এম. জাকির হুসাইনের কঠোর সাধনালব্ধ একাধিক অনন্য বই প্রকাশ করার মাধ্যমে। সারাদেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পাঠকমহলের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পেয়েছি। পেয়েছি গুণিজনদের প্রাণঢালা উষ্ণ অভিনন্দন। ফলে, শুধু ব্যবসায়ের খাতিরেই নয়, সমাজের কিছুটা উপকারে আসতে পারার বিনীত আত্মপ্রসাদ এবং সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়েও প্রকাশ ক'রে যাচ্ছি উক্ত লেখকের একের পর এক বিভিন্ন বই। বিদ্যোৎসাহী মহলে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। আর তা হবেই না বা কেন : মৌমাছি তো সেই ফুলের দিকেই ছুটবে, যাতে মধু আছে।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলতেই হয়। ভালো মানের বইয়ের জন্য আমাদের দেশের সব পাঠককেই বিভিন্ন বিদেশি বইয়ের মুখাপেক্ষী হতে হয়। সে-সব বইয়ের মান নিঃসন্দেহে অতি উঁচু, তবে অন্তত বাংলাদেশের পাঠক সমাজের ক্রয় ক্ষমতার পুরোপুরি বাইরে—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে, অন্তত এদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি বা বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে ভাষা এবং এদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে, সর্বোৎকৃষ্ট মানের কৌশল এবং পদ্ধতি আসতে পারে কেবল এ দেশেরই কোনো যোগ্য লেখকের হাত থেকে, এ ব্যাপারে সম্ভবত অনেকেই আমার সাথে একমত। তার প্রমাণও পেয়েছি পাঠকদের মতামত থেকে। তাদের অনেকের মতে, এই লেখকের অধিকাংশ বই-ই গুণে-মানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আন্তর্জাতিক মানের প্রথম শ্রেণীর বইয়েরই সমকক্ষ। এই মূল্যায়ন পাঠক সমাজের। আর এ কারণেই ক্রমে ক্রমে অধিক উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু এই বইটি সম্বন্ধে আমার নিজেরই কিছু মন্তব্য করতে ইচ্ছে করছে। নিঃসন্দেহে, আমার মতে, এই বইটি এই লেখকের এ যাবত প্রকাশিত শীর্ষস্থানীয় বইগুলোর শীর্ষে স্থান ক'রে নিতে পারবে। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই বিধৃত হয়েছে লেখকের সুদীর্ঘ দেড় বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম—অধ্যয়ন, বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ, তথ্য থেকে চিন্তার নির্যাস নিংড়ে নেয়া—ইত্যাদির সুস্পষ্ট প্রমাণ। বিশেষ ক'রে লেখকের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সুখপাঠ্য এবং পরিপক্ক গদ্যরীতি পাঠককে রীতিমত মোহাবিষ্ট করতে পারবে ব'লে আমার বিশ্বাস। সত্যি বলতে কি, তার রচনারীতি এবং উপস্থাপন ভঙ্গি তাকে পরিপূর্ণ স্বকীয়তা এনে দেবে ব'লে বিশ্বাস করা যায়। আশা করি এই বইটির মাধ্যমে লেখক যে-নোতুন পাঠক-সমাজে আবির্ভূত হলেন, সেখানেও তিনি অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করবেন এবং রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। কারণ, আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে চাই, ঠিক এই বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় এটাই যে প্রথম ক্ল্যাসিক্যাল বই শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বলা যায় যে, এর চেয়ে বেশি কার্যকর এবং শক্তিধর বই অন্তত বাঙালি পাঠকের জন্য ইংরেজি ভাষাতেও বিরল। যাহোক, সব চেয়ে বড় সত্য কথা হল এই যে, বইটির গুণ-মানের বিচারের প্রকৃত অধিকার এবং ক্ষমতা রয়েছে সুধী পাঠকেরই।

বিনীত

মোঃ সফিউর রহমান

www.pathagar.com

সবাই নেতা নয়, কেউ কেউ নেতা

তবে তার মানে এই নয় যে কেবল জন্মসূত্রেই কেউ নেতৃত্বগুণ লাভ করতে পারেন। নেতা তিলে তিলে তৈরিও হয়। অর্জিত দক্ষতা কাউকে নেতা করে। কাউকে নেতা করে পরিস্থিতি। কিন্তু নেতৃত্ব ধ'রে রাখার যোগ্যতা কেবল তারই আছে যিনি জানেন যে তিনি নেতা। এবং কেবল তিনিই নিজেকে নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন যিনি জনগণের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচক্ষণ জ্ঞানের অধিকারী।

নেতাকে বুদ্ধিজীবি হতে হবে—প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো সেই কথাটি আজও সত্য। তবে, নেতৃত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, বুদ্ধিজীবী হলেন তিনি, যিনি সাধারণ জনগণের বুদ্ধিহীনতা, আবেগপ্রবণতা, এবং গতানুগতিক আচরণ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণার অধিকারী। অর্থাৎ, কঠোর এবং অশিষ্ট মনে হলেও একথা সত্য যে, বুদ্ধিজীবী তিনি, যিনি জানেন জনগণ কত বুদ্ধিহীন!

নেতার কৌশলই তার সকল ক্ষমতার উৎস। এবং তার সকল কৌশলের উৎস হল তার জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞান মানে তথাকথিত মাথা-পাকানো একাডেমিক জ্ঞান বা বিদগ্ধ তত্ত্বপ্রীতি নয়। এই জ্ঞানের প্রধান উৎস হল পাবলিকের অজ্ঞানতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা। আমরা কী কী জানি না, তা আবিষ্কার করতে পারার ইতিবাচক নামই হল জ্ঞান।

জনগণ সম্বন্ধে জ্ঞান মানে হল তাদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে জ্ঞান। আর, বিপরীতক্রমে, নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় অজ্ঞতা হল জনগণের জ্ঞান সম্পর্কে আগা-গোড়া অবহিত না থাকা।

সফল নেতা তিনিই হতে পারেন, যিনি জনগণ কতটা অজ্ঞ, তা বিজ্ঞের মত বুঝতে পারেন, এবং জনগণ যা বোঝে, সে সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতাকে নিজেই ভয় ক'রে চলেন।

নেতার এই "জ্ঞানই" তার সকল কৌশলের উৎস; তার এই কৌশল তার সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি; এবং তার সকল ক্ষমতার উৎস হল জনগণ।

ধাঁধাঁর মত শোনালেও দুঃখজনকভাবে সত্য যে, নেতৃত্বের বিফলতার প্রধান কারণ নেতার অজ্ঞতা নয়; বরং যা তার বিফলতার প্রধান কারণ তা হল তার "বিজ্ঞতা"। নেতৃত্বের ইমারত তখনই ধ্বসে পড়তে শুরু করে, যখন নেতা কেবল গ্রন্থাবলী থেকে আহরণ করা জ্ঞান নিয়েই এবং ইতিহাসের কিছু তথ্য মুখস্থ ক'রেই ভেবে বসেন যে তিনি নেতৃত্বের গূঢ়তত্ত্ব জেনে ফেলেছেন। ইতিহাস কেবল নেতৃত্বের সফলতার এবং বিফলতার উদাহরণ এবং বাস্তব ব্যাখ্যা সরবরাহ করে মাত্র; তা কখনোই নেতৃত্বের কৌশলের প্রধান "উৎস" সরবরাহ করার যোগ্যতা রাখে না।

www.pathagar.com

নেতৃত্বের প্রকৃত কৌশল তাদের কাছ থেকে শেখা চাই, যাদের উপর তা প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং বাস্তবতাকে "অনুভব" করার চেষ্টা করতে হবে। ইতিহাসের পুঞ্জিভূত বাস্তব অবস্থিতি এবং অস্তিত্ব হল বর্তমানের বাস্তবতা। অন্য কথায়, সব ইতিহাসের প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক পরিণতি হল বর্তমান। সুতরাং ঐতিহাসিক সত্যকে কার্যকরভাবে "অনুধাবন" করতে হলে তাকাতে হবে বর্তমানের দিকে।

আমরা গতানুগতিক ধারার পদ্ধতি অনুসারে সত্যের সন্ধানে অতীত থেকে যাত্রা ক'রে বর্তমানের দিকে অগ্রসর হই। এতে যা ফল হয় তা হল শুধু এই যে, অতীত কেন অতীতের মত ছিল, তা বুঝা যায়। কিন্তু বর্তমান কেন বর্তমানের মত, তা বুঝা যায় না। তা জানতে হলে আমাদেরকে দার্শনিক যাত্রা শুরু করতে হবে বর্তমান থেকে অতীতের দিকে। অর্থাৎ, বর্তমান কেন অতীত নয়, তা জানতে হবে। আর তা না জানতে পারলে বর্তমান কেন বর্তমানের মত, তা কার্যকরভাবে জানা যাবে না।

এই বইটি আপনাকে নেতা বানিয়ে দেবে না; এ শুধু আপনাকে বলতে চেষ্টা করবে আপনি কিভাবে নিজেকে নেতৃত্বগুণসম্পন্ন ক'রে তুলতে পারেন। এবং কিভাবে আপনি লীডার হবার পথ পরিষ্কার করার জন্য ফলোয়ার সৃষ্টি করতে পারেন।

সব কিছুকেই সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। ইতিহাসও মানুষেরও সৃষ্টি। ফলে, আবশ্যিকভাবে, মানুষও ইতিহাসের সৃষ্টি। কিন্তু মনে রাখা দরকার, মানুষের চেয়ে ইতিহাস কোনো অংশেই বেশি শক্তিশালী নয়।

হাতে-গোণা কয়েকজন ব্যক্তিই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে, ইতিহাসও প্রধানত কেবল হাতে-গোণা কয়েকজন ব্যক্তির গল্পই ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আমাদেরকে শোনায়। অতএব, ইতিহাসে সব কিছুর সমাধান নেই। কারণ, ইতিহাস মানেই সম্পূর্ণ বাস্তবতার চিত্র নয়। এই "হাতে-গোণা" কয়েক জনের একজন হতে হলে পুরো বাস্তবতাকে বুঝতে হবে।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মূল্য হল এই যে, তা সমস্যায় ভরা। ইতিহাস থেকে সমাধান পাবার চেয়ে সমস্যা আহরণ করার অভিযান চালানোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সকল সমাধানের মূল সূত্র নিহিত বর্তমানের বাস্তবতায়, ইতিহাসের গল্পের মধ্যে নয়।

সুতরাং, আবারও বলতে হয়, আপনি কিভাবে নেতা হবেন সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব জনগণ কিভাবে আপনাকে অনুসরণ করতে চায় তা থেকে। অন্য কথায়, জনগণের কাছ থেকেই শিখে নিতে হবে আপনি কিভাবে তাদের নেতা হবেন। জনগণই ভালো জানে কী কৌশল প্রয়োগ ক'রে আপনি তাদের নেতা হতে পারেন। তবে জনগণকে প্রশ্ন ক'রে তা জানা সম্ভব নয়; তা জানা সম্ভব জনগণের কাছ থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ ক'রে।

www.pathagar.com

এই বইয়ের মূল উপজীব্য যে-কৌশলগুলি, তা এসেছে ঠিক এই উপায়েই। সুতরাং পুরো বইটিতেই বাংলাদেশের হাল আমলের চলমান নেতৃত্বের ধারা প্রতিফলিত হয়েছে। "কৌশল" আকারে উপস্থাপিত হয়েছে জনগণ কিভাবে আগ্রহের সাথে শাসিত হতে চায়, তার সাধারণীকৃত (generalized) নির্যাস। বইটি যদি পাঠককে কিঞ্চিত আনন্দ দিতে পারে, তাহলেই আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

প্রশ্ন জাগতে পারে, শুরু করলাম "জ্ঞান" আহরণের প্রয়োজনের কথা ব'লে, কিন্তু শেষ করছি "আনন্দ" দেয়ার ক্ষীণ আশা ব্যক্ত ক'রে—কেন? তাহলে তো কারণ বলতেই হয়।

সকল সফল এবং কার্যকর জ্ঞানই আনন্দদায়ক। শুধু তাই নয়, জ্ঞান—হোক তা বস্তুগত বা ভাবগত—তার পরমে পৌঁছে আনন্দে পরিণত হয়। আবার, বিপরীতপক্ষে, সব পরিণত আনন্দই স্মৃতির ভাণ্ডারে বাস্তব এবং প্রয়োগযোগ্য জ্ঞানের আকর হিসেবে সঞ্চিত থাকে। আরো ব্যাপক অর্থে বলতে হয়, সব সার্থক জ্ঞানই আমাদের মধ্যে মহৎ অনুভূতির সৃষ্টি করে; এবং মহান অনুভূতিও পরিণামে জ্ঞানের সক্রিয়তা পায়। সুতরাং, প্রসঙ্গত সংক্ষেপে বলা যায়, জ্ঞানের সার্থকতাকে যেমন তার এই অনুভূতি-সৃষ্টির ক্ষমতা দ্বারা যাচাই করা যায়, তেমনি মহৎ অনুভূতির অস্তিত্বও তার জ্ঞানসুলভ কার্যকারিতার দ্বারা আবিষ্কার করা যায়।

অতএব, পাঠককে কিছুটা আনন্দ দিতে পারলেই বইটি লেখার পেছনে আমার ব্যয়িত প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করব।

এস. এম. জেড. এইচ.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সবাই নেতা নয়, কেউ কেউ নেতা (লেখকের ভূমিকা) . . . vii

অধ্যায় ১ : সূচনা : বইটির উৎপত্তি, বিষয়বস্তু, পরিধি, এবং "স্বকীয়তা" ১

উৎপত্তি ২
বিষয়বস্তু এবং পরিধি : কী নিয়ে এবং কাদের জন্য বইটি ৪
বইটির "স্বকীয়তা" ৫

অধ্যায় ২ : ক্ষমতা, ক্ষমতার উৎস এবং প্রকারভেদ ৭

ক্ষমতা ৯
প্রভাব ১০
ক্ষমতার বিভিন্ন উৎস ১১
ভয় ১২
উদ্দীপনা ১৫
জ্ঞান ১৬
কাজ ১৭
ক্ষমতার উপর ক্ষমতা (Power over power) ১৮
সম্পর্ক ১৮
নিয়ন্ত্রণ ১৯
রহস্য ২১
দূরত্ব ২১
দৃশ্যমান ক্ষমতা (Visible power) ২৫

অধ্যায় ৩ : প্রভাবশালী হবার উপায় ২৭

নজরে পড়ার বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার কৌশল ৩১

www.pathagar.com

কৌশল — ১	:	শূন্যতা পূরণ Fill in a vacuum)	৩২
কৌশল — ২	:	ঘোলা পানিতে মাছ ধরা (Fish in troubled water)	৩৬
কৌশল — ৩	:	চোখকে আক্রমণ করা (Look different)	৩৯
কৌশল — ৪	:	নিজের ঢাক অন্যকে দিয়ে পিটানো (Have your own trumpet blown by others)	৪১
কৌশল — ৫	:	নিজেই নিজের বিরোধিতা করা (Create opposition)	৪৩
কৌশল — ৬	:	শত্রুর দ্বারা পরিচিতি লাভ (Have a big enemy)	৪৫
কৌশল — ৭	:	সন্ত্রাস দ্বারা পরিচিতি লাভ (Getting known by terror)	৪৯
কৌশল — ৮	:	ছোট পুকুরে বড় মাছ (A big fish in a small pond)	৫২
কৌশল — ৯	:	নোতুন বোতলে পুরনো মদ (Old wine in new bottle)	৫৪
কৌশল — ১০	:	ইস্যু শিকার (Issue hunting)	৫৬
কৌশল — ১১	:	জনহিতকর কাজ (Benevolent activities)	৫৯

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪ : প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার উপায় ৬১

কৌশল — ১ : নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ
(Take control of something) ৬৩

কৌশল — ২ : লো-বল টেকনিক
(Play the low-ball technique) ৬৭

কৌশল — ৩ : বলকে চালু রাখা
(Set the ball rolling) ৭৪

কৌশল — ৪ : বাছাই সমালোচনা
(Selective criticism) ৭৯

কৌশল — ৫ : বড় গাছে নাও বাঁধা
(Make alliance with big people) ৮২

কৌশল — ৬ : উদ্দেশ্যপূর্ণ নির্যাতনভোগ
(Purposeful undergoing of sufferings) ৮৫

কৌশল — ৭ : হাতি পড়লেই এক লাথি
(Beat the dead horse) ৮৯

অধ্যায় ৫ : নেতৃত্বের লড়াই ৯১

কৌশল — ১ : ফাঁকা আওয়াজ
(Empty bluster) ৯৩

কৌশল — ২ : উস্কানির রাজনীতি
(The politics of inducement) ৯৬

কৌশল — ৩ : কুকুরকে ব্যস্ত রাখা
(Keep the dog busy) ৯৮

www.pathagar.com

কৌশল — ৪ : বিভক্ত ক'রে জয় কর
(Divide and rule) ১০০

কৌশল — ৫ : কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা
(Fighting fire with fire) ১০২

কৌশল — ৬ : অপরের শক্তিকে নিজের কাজে ব্যবহার করা ১০৭

কৌশল — ৭ : বদনাম এড়ানোর উপায় ১১১

অধ্যায় ৬ : পাবলিক মনস্তত্ত্ব ১১৭

জনতা আবেগপ্রবণ নাকি যুক্তিশীল? ১১৯

জনতা কাকে সমর্থন করবে? ১২৪

অধ্যায় ৭ : দল পরিচালনা এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ কর্মী ব্যবস্থাপনা ১৩৩

কৌশল — ১ : আনুগত্যের দ্বারা নেতৃত্ব দান
(Leading by following) ১৩৫

কৌশল — ২ : অ্যাকশন থেরাপি এবং মগজধোলাই ১৪০

কৌশল — ৩ : ঝিকে মেরে বউকে শেখানো ১৪৯

কৌশল — ৪ : ঠেলা বনাম টানা
(Push vs. Pull) ১৫২

কৌশল — ৫ : বিভক্ত ক'রে জয় কর
(Divide and rule) ১৫৮

কৌশল — ৬ : সর্বদা শত্রুকে স্মরণ করা
(Always remember your enemy)

www.pathagar.com

অধ্যায় ৮ : ক্ষমতা ও নেতৃত্বের ১৪টি অমোঘ সূত্র ১৬১

সূত্র — ১ : বিরোধিতার সূত্র
(Law of opposition) ১৬৩

সূত্র — ২ : ক্ষমতার সূত্র
(Laws of power) ১৬৭

ক. ক্ষমতা অনিবার্য
(Power is inevitable) ১৬৭

খ. ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে চায়
(Power begets power) ১৬৮

গ. ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে চায়
(Power tends to be institutionalized.) ১৬৮

ঘ. প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত ক্ষমতা বিশেষ মহলে বৈধ
(Institutionalized power is legitimate in a speicified circle.) ১৬৯

ঙ. ক্ষমতার অস্তিত্ব মনস্তাত্ত্বিক
(Power is psychological) ১৭০

চ. প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বিশেষ সূত্র :
Use it, or lose it. ১৭২

ছ. সকল সামাজিক ক্ষমতাই রাজনৈতিক চরিত্র পেতে চায়
(All types of social power tend to obtain a political nature.) ১৭৩

www.pathagar.com

সূত্র — ৩ : জোট গঠনের সূত্র
(Law of group formation) ১৭৫

সূত্র — ৪ : সরলতার সূত্র
(Law of candor) ১৮৩

সূত্র — ৫ : সফলতার সূত্র
(Laws of success) ১৮৭

সূত্র — ৬ : টিকে থাকার সূত্র
(Law of survival) ১৮৯

সূত্র — ৭ : সমর্থক ছাড়া নেতার অস্তিত্ব মিথ্যা
(No leader without follower) ১৯০

অধ্যায় ৯ : সুতরাং, প্রিয় নেতা . . . ১৯১

www.pathagar.com

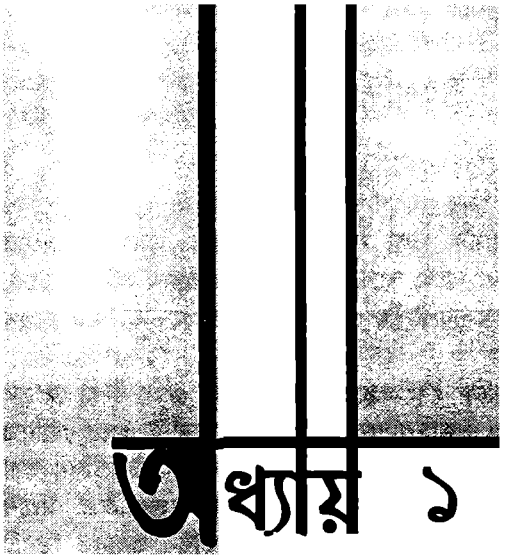

অধ্যায় ১

সূচনা: বইটির উৎপত্তি, বিষয়বস্তু, পরিধি, এবং "স্বকীয়তা"

www.pathagar.com

উৎপত্তি

এই বইটি মূলত ন্যূনধিক দেড় বছরের একটানা অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ, এবং বিশ্লেষণের ফসল। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ের কঠোর শ্রমপূর্ণ প্রয়াসকে কেউ কেউ গবেষণা বললেও আমি তা বলতে চাই না। অধ্যয়ন, তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ, এবং বিশ্লেষণের *প্রক্রিয়াটিকে* হয়তো গবেষণা বলা যাবে, তবে তার *ফলকে,* অর্থাৎ এই বইটিকে, সরাসরিভাবে কোনো গবেষণাকর্ম বলার উপায় নেই কয়েকটি কারণে যা নিচে উল্লেখ করা হল।

প্রথমত, সরাসরি বাস্তবতা থেকে এবং গ্রন্থাবলী পত্র-পত্রিকা থেকে নেয়া যে-সব তথ্য থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলিকে 'কৌশল' বা 'সূত্র' আকারে বইটিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সে-সব তথ্যাবলীকে বইতে অনেক ক্ষেত্রেই উপস্থাপন করা হয়নি—না আলোচনার মধ্যে, না পাদটীকায়, না কোনো সংযোজিত অংশে (appendix)। অর্থাৎ, উপস্থাপিত হয়েছে কেবল প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলি। প্রধানত তিনটি কারণে বইটিকে এভাবে সাজানো হয়েছে। এক, বইটিকে সর্বস্তরের পাঠকের জন্য **সহজপাঠ্য** ক'রে তোলার জন্য এ থেকে গবেষকের আনুষ্ঠানিক এবং টেকনিক্যাল স্টাইল বাদ দেয়া হয়েছে। পাতায় পাতায় পাদটীকা, ক্ষণে ক্ষণে রেফারেন্স, মুহুর্মুহু অ্যাক্‌নলেজমেন্ট ইত্যাদি নিঃসন্দেহে বইটির "প্রাতিষ্ঠানিক" নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে দিত, তবে তা বইটিকে এসব টেকনিক্যাল বিষয় দিয়ে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলত। ফলে তা সর্বস্তরের পঠনযোগ্যতা হারাত। তাছাড়া গবেষণার উক্ত "আনুষ্ঠানিক" পদ্ধতি অনুসরণ করলে উপস্থাপনের ভঙ্গিও পাল্টে যেত।

দুই, উদ্দেশ্য ছিল বইটিকে শুধু **সহজপাঠ্য** ক'রে তোলা নয়, **সুখপাঠ্য**ও ক'রে তোলা। আর একথা তো সবারই জানা যে, কোনো লেখাকে সুখপাঠ্য ক'রে তুলতে হলে তাতে লেখকের টোন্ বা বাচনভঙ্গি হিসেবে নৈর্ব্যক্তিকতার (impersonality) বদলে প্রত্যক্ষতা (directness) এবং বন্ধুত্বপূর্ণতাকেই বেছে নিতে হয়। লেখার তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) স্টাইল লেখাকে পরোক্ষ (indirect) এবং নিরস ক'রে দেয়। তাছাড়া নৈর্ব্যক্তিক না হয়েও বস্তুনিষ্ঠ (objective) হওয়া যায়। আমি চেয়েছি পাঠকের সাথে সরাসরি আন্তরিকভাবে কথা বলতে। ফলে, উদাহরণস্বরূপ, এ কাজ করা বিপজ্জনক, "বা" বাস্তবতা এরূপ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে, "বা" এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে ব'লে মনে হয় এরূপে পরোক্ষভাবে কথা বলার বদলে আমি পাঠককে সরাসরি বলেছি "এরূপ কাজ করবেন না"। তবে সব সময়েই লক্ষ্য রাখা হয়েছে যেন অতি-অনানুষ্ঠানিকতা বা "আন্তরিক প্রত্যক্ষতা" কোনো ক্রমে গুরুগম্ভীর সিদ্ধান্তের মর্যাদাকে হালকামিপূর্ণ বা তরল না ক'রে দেয়।

তিন, আমরা অনেকেই নিজ নিজ বিশ্বাসকে আদর্শ বা 'মতবাদের' মর্যাদা দিতে চাই। ফলে, আমাদের বিশ্বাস, সঙ্গত কারণেই, হয়ে পড়ে সংকীর্ণ, অন্ধ, যুক্তিহীন, এবং আবশ্যিকভাবে আবেগনির্ভর। এরূপ মানসিকতা নিয়ে আমরা যখন কোনো বাস্তবতাকে বা ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করি, তখন, ঘটনা স্পষ্ট এবং বাস্তব এবং অনন্য (unique)

www.pathagar.com

হওয়া সত্ত্বেও, তার সম্পর্কে আমাদের একেক জনের ব্যাখ্যা একেক ধরনের হয়ে থাকে। অন্য কথায়, একই ঘটনাকে আমি দেখছি এক ভাবে, আরেক জন দেখছেন আরেকভাবে, আরো একজন দেখছেন আরো এক ভাবে। দৃষ্টি সবার ঠিক থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গি একেক জনের একেক রকম। তাছাড়া আসলে খুব কম লোকই বস্তুজগত থেকে আহরণ করা জ্ঞান দ্বারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঝালাই করতে চায়। অনেকে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা শুধু নিজেদের পূর্ব থেকে গঠিত বিশ্বাসকেই পাকাপোক্তভাবে ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করে। তারা নোতুন কিছু শেখে না, নিজের (অন্ধ) বিশ্বাসকে নোতুন ব্যাখ্যা দান করে মাত্র। অর্থাৎ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা তাই বুঝি যা আমরা বুঝতে চাই, তাই দেখি যা দেখার জন্য আমরা আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত। ফল একই : আমরা হাজার জ্ঞান অর্জন করা সত্ত্বেও নিজেরাই নিজেদেরকে অতিক্রম ক'রে উঠতে পারি না। সংকীর্ণতাপূর্ণ আত্মপ্রীতি রয়েই যায়। এসব কারণে, যে-সব তথ্য পর্যবেক্ষণ ক'রে আমি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, কিংবা অন্যান্য লেখক বা মনীষীর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত (generalization) বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় যে-সব বাস্তবতা দ্বারা নোতুন ক'রে যাচাই ক'রে দেখার চেষ্টা করেছি, সেগুলি যদি সরাসরি আলোচনায় টেনে আনতাম, তাহলে প্রতিটি উদাহরণের ক্ষেত্রেই কিছু কিছু পাঠক বইটি পড়তে পড়তেই লেখকের সাথে মানসিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তেন, যার ফলে, অন্তত সে-সব পাঠকের ক্ষেত্রে, বইটি তার সুখপাঠ্যতা হারাত। তাছাড়া কিছু কিছু তথ্য আছে যা সম্পর্কে সবাই-ই কম-বেশি জ্ঞাত, তবুও যা এত অস্পষ্ট এবং বিতর্কিত (এবং ভয়ংকরও বটে!) যে, সেগুলিকে দশ জনের সামনে ঢাক পিটিয়ে শোনানো সম্ভব নয়। হয়তো সম্ভব, তবে অযথা বিতর্ক এবং "পক্ষপাতিত্বের দুর্নামের ভয়" এড়াবার জন্য আমি সেগুলিকে পাঠকের সামনে হাজির করিনি। অন্তত, লেখক হিসেবে আমি যতদূর পর্যন্ত এই বইটির বিষয়বস্তুর এবং উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত, ততদূর পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় যে-কারণে বইটিকে আমি সরাসরি গবেষণাকর্ম বলতে অনিচ্ছুক তা হল, এতে সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ 'কৌশল', 'সূত্র') উপস্থাপিত হয়েছে, তবে কোন কোন তথ্য থেকে কিভাবে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে তা দেখানো হয়নি। বইটির উপস্থাপনে অবরোহ (deductive) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, অর্থাৎ ব্যাপক সাধারণীকৃত (generalized) সিদ্ধান্তকে প্রথমে উপস্থাপন ক'রে পরে তা প্রমাণ করার জন্য তথ্য বা উদাহরণ দেয়া হয়েছে—প্রথমত কারো কারো কাছে এরূপ মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে প্রতিটি 'কৌশলের' বা 'সূত্রের' নিচে যে-উদাহরণগুলি দেয়া হয়েছে, সেগুলি 'কৌশলগুলিকে' বা 'সূত্রগুলিকে' প্রমাণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে উদাহরণ এবং সুখপাঠ্য ও সরলীকৃত ব্যাখ্যা দেয়ার উদ্দেশ্যে।

তৃতীয়ত, বইটিতে উপস্থাপিত অনেক 'কৌশল' এবং 'সূত্র' আগে থেকেই অনেকের জানা। সুতরাং সে-সব ক্ষেত্রে নেতৃত্বের তাত্ত্বিক আলোচনায় আমি কোনো নোতুন মাত্রা যোগ করিনি। তবে সে-সব ক্ষেত্রে আমি যা করেছি তা হল, বিভিন্ন কৌশলকে নোতুন কায়দায় এবং অনেকটা পদ্ধতিগতভাবে সংঘবদ্ধ করেছি, তাদের যুগোপযোগী

www.pathagar.com

বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছি, এবং অন্যান্য উদাহরণের মাধ্যমে সেগুলিকে তাত্ত্বিক পর্যায় থেকে পুরোপুরি ব্যবহারিক পর্যায়ে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেছি। তবে, নিঃসন্দেহে, এমন অনেক চমৎকার এবং বিস্ময়করভাবে কার্যকর কিছু কৌশলকে বাস্তবতা থেকে ছেঁকে বের করে এনেছি, যেগুলির ব্যাপারে কোনো বিশ্লেষক বা গবেষক এ পর্যন্ত অন্তত এদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোনো উল্লেখ বা আলোচনা ক'রেছেন ব'লে আমার জানা নেই। সেগুলির নামকরণ করেছি। বাস্তব উদাহরণ সহ সেগুলির পক্ষে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি। আমার ব্যাখ্যাকে অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ, বা অন্য কোনো কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারো কারো কাছে অসঙ্গত মনে হতে পারে, তবে, আমার পর্যবেক্ষণজাত আবিষ্কারগুলি (অর্থাৎ 'কৌশল' এবং 'সূত্র') পুরোপুরি বাস্তবতা থেকে নেয়া।

বিষয়বস্তু এবং পরিধি : কী নিয়ে এবং কাদের জন্য বইটি

বইটির বিষয়বস্তু, যা এর নাম থেকেই সহজে অনুমেয়, হল নেতৃত্বের রাজনৈতিক (political) অর্থাৎ কৌশলগত দিক। একথা সার্বজনীন যে, পলিটিক্সের সাথে আবশ্যিকভাবে 'কৌশলে'র প্রশ্ন জড়িত। ঢিলেঢালাভাবে বলা যায়, পলিটিক্সের মূল ভিত্তিই বিভিন্ন কৌশল—সামরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের বিচক্ষণতাপূর্ণ পরিচালনা। কিন্তু ম্যানেজারসুলভ পরিচালনা আর নেতাসুলভ পরিচালনার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। যে-কোনো বিষয়ের নেতাসুলভ পরিচালনাই পলিটিক্স। সুতরাং পলিটিক্স যে শুধু থাকবে রাজনীতিতে তা নয়, তা থাকতে পারে (এবং থাকেও) যে-কোনো ব্যবসায়িক অব্যবসায়িক বা অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে বা সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে। লক্ষ্যণীয়, বাংলায় 'রাজনীতি' বলতে আমরা যা বুঝি বা বুঝাই, তা ইংরেজি 'পলিটিক্স' দ্বারা যা বুঝানো হয় তা থেকে এসব কৌশলগত বিবেচনায় সূক্ষ্মভাবে ভিন্ন। সরাসরি বলতে গেলে, "পলিটিক্স"-এর একটি ব্যাপক চলতি অর্থই হল "কৌশল"। সুতরাং পলিটিক্স থাকতে পারে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যেও। **এই বইয়ের মূল বিষয়বস্তু হল এই অর্থে "পলিটিক্স", অর্থাৎ নেতৃত্বের কেবল কুটিল এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ কৌশলগত দিক। এ কৌশল রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের বা গ্রুপের নেতৃত্বের বেলায় প্রযোজ্য।**

তবে নেতৃত্বের সব কৌশলই যে এই বইতে স্থান পেয়েছে, তা নয়। এখানে কেবল সবচেয়ে কার্যকর এবং গুরুত্বপূর্ণ কৌশলের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। অনেক কৌশলকে বইয়ের অবয়বকে ছোট রাখার প্রয়োজনে বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করার লোভ সংবরণ করতে হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে অন্য কোনো বইতে সেগুলিকে অবশ্যই স্থান দেয়া হবে।

www.pathagar.com

বইটির পরিধির প্রশ্নেও উপরের কথাগুলি চ'লে আসে। তবে এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা দরকার; তা হল এই যে, বইটি প্রথমত তাদের উদ্দেশ্যে লেখা যারা মাঠ পর্যায়ের নেতা—যেমন ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড, থানা, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের নেতা, এবং যারা নেতৃত্বের ভুবনে প্রথম প্রবেশ করতে চান, এবং যারা যে-কোনো ব্যবসায়িক, অব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক বা অন্য কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য বা উচ্চ পর্যায়ের নেতা। তবে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দায়িত্বের স্বরূপ স্তরে স্তরে ভাগ করা সম্ভব হলেও প্রতি স্তরের নেতার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলের ধরনকে চুলচেরা বিচারে আলাদা করা যায় না। ফলে, অনেক কৌশল আছে যেগুলিকে সব স্তরের নেতাদেরকেই প্রয়োগ করতে হয়। এ কারণে বইটি একেবারে শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরও অনেক কাজে আসবে ব'লে আশা করা যায়।

উপরন্তু, আমার বিশ্বাস, বইটি রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক মনস্তত্ত্ব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, এবং শিল্প মনোবিজ্ঞানের (industrial psychology) ছাত্রদেরও বিশেষ উপকারে আসবে। কারণ, ছাত্রজীবনে একাডেমিক প্রয়োজনে যেমন তাদেরকে বাস্তবতার পলিটিক্স এবং পলিটিক্সের বর্তমান বাস্তবতার ব্যাপারে গূঢ় জ্ঞান রাখার প্রয়োজন, তেমনি ভবিষ্যতের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিজেকে সফল নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারার মধ্যেও তাদের পেশাগত সফলতা সরাসরি নির্ভরশীল। এ কারণে, আমি মনে করি, বইটির একটি বিশেষ একাডেমিক মূল্যও রয়েছে।

বইটির "স্বকীয়তা"

বইটির নিজস্ব কোনো গুণগত বৈশিষ্ট্য আছে কি না, বা এতে লেখকের চিন্তাধারার কোনো মৌলিকত্ব ফুটে উঠেছে কি না, তা বিচার করার অধিকার কেবল পাঠকেরই আছে, লেখকের নয়। তবে লেখক হিসেবে আমি সচেতনভাবে যে-দিক থেকে বইটিকে স্বকীয় ক'রে তোলার চেষ্টা করেছি তা হল এর বিষয়বস্তুর লক্ষ্যবিন্দু (focus) নির্ধারণ, এবং তা নিয়ে দু'একটি কথা বলা দরকার ব'লে মনে করি।

বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে দেশে এবং বিদেশে যত গবেষণা ও পর্যালোচনা-বিশ্লেষণ হয়েছে এবং হচ্ছে, এবং তার ফলশ্রুতিতে যে-সব article বা essay বা বই প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে, সেগুলির starting point বা শুরু হল সরকারের তথা ক্ষমতাসীন দলের পলিটিক্সের উৎসবিন্দু দিয়ে। ফলে, সে-সব আলোচনায় স্থান পেয়েছে প্রধানত এই বিষয়গুলি : কিভাবে ক্ষমতাসীন দল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্ষমতা-কাঠামো বিছিয়ে দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক (অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত) ক্ষমতা-বলয়ের পরিধি বিস্তৃত করে, কিভাবে বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগ ক'রে ক্ষমতা-কাঠামোয় ইচ্ছানুযায়ী রদ-বদল ঘটায়—অর্থাৎ তারা উপর থেকে কিভাবে নিচের দিকে যথাযথ চ্যানেল বেয়ে জনগণ পর্যন্ত পৌঁচায় তার বিবরণ-বিশ্লেষণ। সে-

www.pathagar.com

সব আলোচনায় প্রধানত সেই কৌশলগুলি স্থান পায় যেগুলি প্রয়োগ ক'রে ক্ষমতাসীন দল দেশের (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতা-কাঠামোর উপর **"নিয়ন্ত্রণ"** প্রতিষ্ঠা ক'রে, এবং তার মধ্য দিয়ে কিভাবে বিরোধী দলগুলির সাথে রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অবতীর্ণ হয়। ফলে, সে-সব আলোচনায় জনগণ থেকে যায় গৌণ। অন্য কথায়, সে-সব আলোচনার বিষয় হল প্রধানত ক্ষমতাসীন দল (বা বিরোধী দল) কেন্দ্রীয় প্রভাবের চৌম্বক শক্তি দিয়ে জনগণের মধ্য থেকে কিভাবে মাঠ-পর্যায়ের বা লোকাল পর্যায়ের নেতাকে উপরে টেনে এনে জনগণকে পক্ষে আনার চেষ্টা চালায় তাই। কিন্তু একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি কিভাবে নিজের দক্ষতা দ্বারা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেন বা প্রভাব অর্জন ক'রে প্রত্যক্ষভাবে জনতার প্রতিনিধিত্ব ক'রে ক্ষমতার মই বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকেন, তা অধিকাংশ গবেষক বা বিশ্লেষক উপেক্ষা ক'রে যান। অথচ গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রতিনিয়ত প্রভাবের চারিত্র্য বদলাচ্ছে প্রধানত এই উপায়েই। গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্ণায়ক হল পার্টি, আর এই বইয়ের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হল নেতৃত্ব বা স্বয়ং নেতা। আমার মতে, সফল নেতৃত্বই সফল পার্টির মূল ভিত্তি। সুতরাং আমি যে-লক্ষ্যকে সামনে রেখে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছি তা হল : কিভাবে জনগণের নিকট থেকে ক্ষমতা লাভ ক'রে ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক সোপানে নেতারা উঠে আসেন, এবং আসা যায়, এবং কিভাবে যোগ্যতা অর্জন ক'রেই নেতা হওয়া যায় এবং নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখা বা তার শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। এই বইয়ের গোটা বিষয়বস্তুর (theme) ভিত্তি হল সেই একেবারে গোড়ার কথাটি : জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। কেবলমাত্র জনগণের বিচক্ষণতাপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমেই সফল নেতা হওয়া সম্ভব। এবং, এ থেকে এটাও অনুমেয় যে, এই বইয়ের সকল প্রস্তাবনার আরেকটি মৌলিক পূর্বধারণা হল এই যে : একমাত্র সফল নেতৃত্বের মধ্য দিয়েই সফল নীতি বা মতবাদকে বিকশিত করা ও টিকিয়ে রাখা যায়। অতএব, এই বইটির প্রাথমিক লক্ষ্য কেন্দ্র (focus) হল সফল নেতৃত্ব, পার্টি নয়। পার্টি যদি হয় ক্ষমতার ইমারত, তাহলে নেতৃত্ব হল সেই ইমারতের স্তম্ভ, এবং নীতি হল তার ভিত। এই ভিতের উপর এই ইমারতকে বলিষ্ঠভাবে এবং মজবুতভাবে দাঁড় করাতে হলে চাই মজবুত স্তম্ভ—তথা সফল নেতৃত্ব। সম্ভবত এই **focus**-ই এই বইটির স্বকীয়তা।

www.pathagar.com

অধ্যায় ২

ক্ষমতা, ক্ষমতার উৎস এবং প্রকারভেদ

www.pathagar.com

"ক্ষমতা প্রেমের মত। প্রেমের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন, কিন্তু তার অস্তিত্ব নিরুপণ করা খুব সহজ। ক্ষমতার চরিত্রও কতকটা এরূপ; তার সুনির্ধারিত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ হলেও, তার উপস্থিতি আঁচ করা ভারি সহজ।"* তবুও ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমরা ক্ষমতার একটি সংজ্ঞা বেছে নেব, যা সমাজবিজ্ঞানী এবং গবেষকদের প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে না; তবে তাদেরই নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ ক'রে এমন একটি সংজ্ঞা বেছে নেয়া হবে যার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্যের অবকাশ নেই বললেও চলে।

আলোচ্য বিষয় যখন ক্ষমতা, তখন, সম্ভবত ইতোমধ্যেই অনুমান করা গেছে, তার সংজ্ঞার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তার প্রকারভেদের আলোচনা। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে যার সুনির্ধারিত সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব নয়, তার প্রকারভেদ চিহ্নিত করাও সঙ্গত কারণেই জটিল এবং বিতর্কিত হতে বাধ্য। তাছাড়া, একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার মুটামুটি কয়েক ধরনের ব্যবহারিক শ্রেণীবিভাগ করা যায়। তাও এরূপ শ্রেণীবিভাগ ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য, উৎস, প্রয়োগ—ইত্যাদির আলোকে করা হয়ে থাকে। ফলে, একদিকে ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ বিষয়ক আলোচনা যেমন ক্ষেত্রবিশেষে পুনরাবৃত্তির প্যাঁচে জড়িয়ে যেতে বাধ্য, তেমনি তা আবার দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের সাথে বদলে যেতেও পারে।

কিন্তু এসব তাত্ত্বিক অস্পষ্টতার ঝামেলা এড়াবার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল ক্ষমতার বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে বাস্তবসম্মত অনুসন্ধান চালানো, অর্থাৎ কী কী উপায়ে ক্ষমতার সৃষ্টি হয় সে বিষয়ক আলোচনাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া। মূলত নেতার আগ্রহ ক্ষমতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকে বেশি হবার কথা নয়; বরং তার আসল আগ্রহের বিষয় হল কিভাবে ক্ষমতার সৃষ্টি হয়, কিভাবে তা অর্জন করা যায়, এবং কিভাবে তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে ধ'রে রাখার সাথে সাথে তা বৃদ্ধি করা যায়। এই অধ্যায়ে, এ কারণে, আমরা ক্ষমতার উৎস এবং সংরক্ষণের উপায়ের আলোচনার উপর বেশি গুরুত্ব দেব। একথা যদিও সত্য যে এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচিত কৌশলগুলো মূলত ক্ষমতা অর্জন এবং তা ধ'রে রাখা এবং তা বৃদ্ধি করার আলোচনায় ব্যাপৃত, তবুও এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, সে সব কৌশলের মৌলিক দিকগুলি আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়েই।

* Martin R. (1977), *The Sociology of Power*, Routledge & Kegan Paul, London.

www.pathagar.com

ক্ষমতা

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায় : ক্ষমতা হল কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যাপৃত করার দক্ষতা। আরো ব্যাপক অর্থে, ক্ষমতা হল কোনো কাজ করার বা না-করার ব্যাপারে অপরের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা। কিন্তু অপরের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করার যোগ্যতাকে সরাসরি ক্ষমতা (power) না ব'লে বলা হয় **প্রভাব** (influence)। সকল ক্ষমতার মূল ভিত্তি হল এই প্রভাব। সুতরাং আমরা প্রথমে প্রভাব-এর প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করব।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা সব সময়ই কারো না কারো দ্বারা প্রভাবিত হই, কিংবা কাউকে না কাউকে প্রভাবিত করি। আপনার বন্ধু বাজারে যাচ্ছে দেখে আপনি তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে তাকে আপনার জন্য কিছু জিনিস কিনে আনতে বললেন। কাজটি তেমন কঠিন কিছু না হলেও তার জন্য আপনার বন্ধুকে কিছুটা ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল বৈকি। তবুও সে আপনার জন্য তা করেছিল। এখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আপনার বন্ধুর আচরণকে (অর্থাৎ কাজ—behaviour) আপনি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, প্রেম, স্নেহ ইত্যাদির বন্ধনে আবদ্ধ লোকেরা একে অপরের উপর এরূপ প্রভাব খাটাতে পারে। আবার, অচেনা অজানা পরিস্থিতিতে আপনি কোনো একজন লোককে আপনাকে ছোট একটি উপকার করতে বললেন। আপনি তাকে অনুরোধ করার বদলে ঔদ্ধত্যের সাথে আদেশ করেছিলেন। ফলে লোকটি আপনাকে উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেল। এই যদি হয় বাস্তবতা, তাহলে বলা যায় যে, লোকটিকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা আপনার ছিল না। কিন্তু, একটু পরে, আরেকটি লোককে আপনি অত্যন্ত মার্জিতভাবে এবং চিত্তাকর্ষক ভাষায় আপনার জন্য উক্ত উপকারটুকু করার জন্য অনুরোধ করলেন। সে কিছুটা কষ্ট স্বীকার ক'রেও এবং তার মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রেও আপনার জন্য কাজটি ক'রে দিল। এক্ষেত্রে আপনি কিন্তু লোকটির উপর প্রভাব খাটাতে পেরেছেন। **এই প্রভাবই হল যাবতীয় ক্ষমতার মূল ভিত্তি।**

আবার ধরা যাক, আপনার উপর কেউ বন্দুক উঁচিয়ে আপনাকে কোনো কাজ করতে বলল। আপনি, উপায়ন্তর না দেখে, এবং তাকে অমান্য করার পরিণতিকে ভয় ক'রে, তার কথা মতো কাজটি করলেন। এক্ষেত্রেও আপনি উক্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সত্য যে, এক্ষেত্রে আপনি স্বেচ্ছায় কাজটি করেননি, কিন্তু পরিস্থিতির প্রয়োজনে নিজের ইচ্ছার উপর নিজের জোর খাটাতে হয়েছে। এও এক ধরনের প্রভাব, যাকে আমরা সাধারণ অর্থে **ক্ষমতা** (coercive power) বলে থাকি।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে উভয় ধরনের প্রভাবই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে এ প্রসঙ্গে **প্রভাব, ক্ষমতা,** এবং **জোর বা শক্তির** মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্য জানা আবশ্যক। একথা

www.pathagar.com

ঠিক যে, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এই শব্দগুলিকে অনেক সময় একই অর্থে অনেকে ব্যবহার করেন, যেমন আমরা ক'রে থাকি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথোপকথনে। কিন্তু, চুলচেরা বিচারে না হলেও, এই শব্দগুলির মধ্যকার ভাবার্থের পার্থক্য কিছুটা জানার প্রয়োজন আছে বৈকি।

প্রভাব

আমরা আগেই জেনেছি, প্রভাব হল অপরের মধ্যে কোনো ইচ্ছা জাগিয়ে তোলার সামর্থ্য। আমরা এতক্ষণ যে-উদাহরণগুলি দেখেছি, তা থেকে প্রভাবের চরিত্র কিছুটা বুঝা গেছে। বাংলায় আমরা সচরাচর **ক্ষমতা** বলতে যত ধরনের শক্তিকে বুঝি, সেগুলিকে—অন্তত যতদূর পর্যন্ত তার সাথে নেতৃত্বের প্রশ্ন জড়িত—সার্বিকভাবে **প্রভাব** ব'লে অভিহিত করা যায়। আসলে সব মানবীয় (যান্ত্রিক নয়) ক্ষমতার উৎসই প্রভাব। এই ব্যাপক অর্থে প্রভাবকে বুঝাতে ইংরেজিতে influence শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। ক্ষমতা (power), প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা (authority)—এসব হল influence-এর বিভিন্ন রূপ। এ কারণে, ক্ষমতার বিভিন্ন উৎস সম্বন্ধে জানতে হলে influence-এর উৎস সম্বন্ধে জানা দরকার; অর্থাৎ, মানুষের ইচ্ছাকে কতভাবে প্রভাবিত করা যায় তা জানা দরকার।

অস্পষ্টতা, অনির্দিষ্ট বিতর্ক, এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেণষণগত ঝুই-ঝামেলা এড়াবার জন্য আমরা এখানে একই শব্দ "ক্ষমতা" দ্বারা বিভিন্ন ধরনের প্রভাবকে নির্দেশ করলেও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তার পাশাপাশি ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করব।

মানুষের ইচ্ছাকে প্রভাবিত ক'রে তাকে দিয়ে নিজের বা সামগ্রিক অর্থে সবার উদ্দেশ্য হাসিল করার লক্ষ্যে কাজ করানো যায়। কিন্তু মানুষ কোনো কাজ করে প্রধানত দু'টি কারণে :

স্বেচ্ছায়, আগ্রহের সাথে, এবং
বাধ্য হয়ে, অন্য কোনো বিকল্প না পেয়ে।

আপনি যদি এই দু'টি উপায়ের যে-কোনো উপায়ে বা একই সাথে উভয় উপায়ে কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে পারেন, তাহলে বলা যায় যে, অন্তত ঐ লোকটির উপর আপনার প্রভাব আছে। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য করার মত : অনেকে মনে করে যে দ্বিতীয় উপায়ে কাউকে কোনো কিছু করতে পারাই হল ক্ষমতা। এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়; বরং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ক্ষমতার (বা প্রভাবের) এই উপায়টি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাছাড়া কোনো কাজ করতে মানুষ কেন বাধ্য হয়—তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃত ক্ষমতার উৎস হল মানুষকে "স্বেচ্ছায় বাধ্য" করার দক্ষতা। অবশ্য এ ব্যাপারে আমরা একটু পরেই বিস্তারিত আলোচনা করব।

www.pathagar.com

এই পর্যায়ে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, **প্রভাব** হল কারো মধ্যে কোনো কাজ করার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলার দক্ষতা। যেমন, কাউকে কোনো কাজের সুফল দেখিয়ে তাকে তা করতে উৎসাহী করার দক্ষতা হল প্রভাব। আবার তার মধ্যে ভয় সৃষ্টি করে তাকে দিয়ে কোনো কাজ করানোর "ইচ্ছা" (আরোপিত ইচ্ছা) জাগিয়ে তোলার দক্ষতাও প্রভাব। কিন্তু প্রভাবের কার্যকারিতা তার মধ্যে শুধু এই "ইচ্ছা" জাগিয়ে তোলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার মধ্যে ইচ্ছা জাগিয়ে তোলার পর সে যদি কাজটি করে, তাহলে আপনার প্রভাব **ক্ষমতায়** পরিণত হল। অন্য কথায়, কারো মধ্যে কোনো কাজের ইচ্ছা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েও আপনি যদি তার দ্বারা কাজটি **করাতে** না পারেন, তাহলে আপনি তার উপর প্রভাবশালী হলেও **ক্ষমতাবান** নন। **ক্ষমতা** হল **কাজ** উৎপাদন করার দক্ষতা; শুধু (মানুষের মধ্যে) ইচ্ছার সৃষ্টি করলেই ক্ষমতাবান হওয়া যায় না। যেমন, পূর্ববর্তী একটি উদাহরণ অনুসারে, আপনার বন্ধুর আপনাকে সাহায্য করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো কারণে সে বাজার থেকে আপনার জন্য জিনিসটি বা জিনিসগুলি কিনে না আনে, তাহলে আপনি তার উপর ক্ষমতাবান নন। কিন্তু, তুলনা ক'রে দেখুন, এক্ষেত্রে জিনিসগুলি কেনার জন্য আপনি যদি আপনার চাকরকে বাজারে পাঠান, তাহলে সে কোনোক্রমেই আপনার কথা অমান্য করতে পারবে না। সে তা কিনে আনতে বাধ্য, যেহেতু সে আপনার বেতনভুক্ত কর্মচারী। এক্ষেত্রে আপনি আপনার চাকরের উপর ক্ষমতাবান। কিন্তু এখানেও কথা রয়ে যায়। আপনার চাকর যদি আপনাকে অমান্য করে, তাহলে, নিঃসন্দেহে, আপনি তার উপর ক্ষমতাবান নন।

যাহোক, এ পর্যন্ত এটুকু স্পষ্ট করা গেল যে, ক্ষমতা যদিও কাজের সফলতার দ্বারা বিচার্য, তবুও কাজের সফলতা নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করার সফলতার উপর। অর্থাৎ, অন্য কথায়, প্রভাবের সফলতাই ক্ষমতা।

প্রমাণিত হয়ে গেল যে ক্ষমতার ভিত্তি হল প্রভাব। কিন্তু এই প্রভাবকে কত উপায়ে সৃষ্টি ক'রে তার মাধ্যমে বাঞ্ছিত কাজ উৎপাদন ক'রে ক্ষমতায় রূপান্তরিত করা যায় তা জানা নেতার জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ। এই উপায়গুলিকে আমরা এখানে "ক্ষমতার উৎস" ব'লে অভিহিত করব।

ক্ষমতার বিভিন্ন উৎস

একটু অশোধিত ভাষায় এবং সাদামাটাভাবে বলা যায়, ক্ষমতা হল নিজের ইচ্ছা অনুসারে অপরকে দিয়ে কাজ করানোর যোগ্যতা। এই যোগ্যতা অর্জন করা যায় বিভিন্ন উপায়ে, যেগুলি নিচে আলোচিত হবে। ব্যাপক অর্থে উপায়গুলি হল নিম্নরূপ :

- কাউকে আপনার উপর নির্ভরশীল ক'রে তোলা;
- কাউকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করা;

www.pathagar.com

- কাউকে তার নিজের উপর নির্ভরশীল ক'রে তোলা; এবং

- এবং একাধিক ব্যক্তিকে একে অপরের উপর নির্ভরশীল ক'রে তোলা।

কাউকে আপনি আপনার উপর নির্ভরশীল ক'রে তুলতে পারেন প্রধানত একটি উপায়ে : তার দ্বারা করণীয় অন্যান্য বিকল্পকে তার পক্ষে অসাধ্য ক'রে তুলে।

বিষয়টিকে প্রথমত কঠিন মনে হলেও তা তেমন দুর্বোধ্য কোনো ব্যাপার নয়। উদাহরণের মাধ্যমে আমরা এই মূল কৌশলটিকে ব্যাখ্যা করব।

ভয়

মানুষকে ভয় দিয়ে তাকে দিয়ে অনেক সময় ইচ্ছে মতো কাজ করানো যায়। সুতরাং ভয় হল ক্ষমতার একটি উৎস। ভয় হতে পারে শারিরীক নির্যাতনের, আর্থিক ক্ষতির, বা, চরমে গিয়ে, মৃত্যুর। আপনার সন্তান অনেক সময় আপনি তাকে শারিরীকভাবে নির্যাতন করবেন এই ভয়ে আপনার বাধ্য হয়ে থাকবে, কুকর্ম করতে চাইবে না। আপনার কর্মচারী আপনার আদেশ পালন করবে এই ভয়ে যে, সে যদি আপনাকে মান্য না করে, তাহলে তার চাকরি যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ডাকাত-সন্ত্রাসীদেরকে আমরা অনেকে ভয় পাই প্রাণ রক্ষার জন্য। অপরাধপ্রবণ অনেক লোক মারাত্মক ধরনের অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে প্রাণদণ্ডের ভয়ে। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের অধিকাংশ হরতাল ধর্মঘট পালিত হয় শারিরীক নির্যাতনের, মানহানির, সম্পদের অনিষ্টের, বা প্রাণের ভয়ে।

অনেকের মতে মৃত্যুর ভয়ই সকল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু সব ক্ষেত্রে কথাটি সত্য নয়। ভয়ে মানুষ কোনো কিছু করতে বাধ্য হয় কেবল তখনই যখন তার সামনে উক্ত ভয়কে এড়ানোর অন্য কোনো **বিকল্প থাকে না**। যদি কেউ মনে করে যে তার সামনে মৃত্যুরও বিকল্প আছে, অর্থাৎ কোনো কাজ করার বা না-করার কারণে তার মৃত্যু হলে সে পরলোকে স্বর্গবাসী হবে, তাহলে মৃত্যুর ভয়ে তাকে ভীত করা সম্ভব নয়। একই ভাবে, আপনার কর্মচারীও কোনো একটি চরম মুহূর্তে আপনাকে ভয় পাবে না যদি সে মনে করে যে অন্যত্র তার চাকরি পাবার আরো ভালো সুযোগ (বিকল্প) আছে। সুতরাং ভয়কে ততক্ষণই ক্ষমতার উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায় যতক্ষণ যাকে ভয় দেয়া হবে তার সামনে ভীত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো ***বিকল্প*** থাকবে না।

ভয় ক্ষমতার উৎস বটে, তবে নেতৃত্বের সার্বক্ষণিক সফল হাতিয়ার নয়। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা (authority) যদি আপনার না থাকে, তাহলে ভয় প্রদর্শন আপনাকে ক্ষণিকের ক্ষমতা দিবে, নেতৃত্বের প্রভাব দিতে পারবে না। মানুষ যখন ভয়ের কারণে কাউকে মান্য করে, তখন সে স্বেচ্ছায় তা করে না। ফলে "ভয়ের নেতৃত্ব" দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

www.pathagar.com

তবে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ভয়ের গঠনমূলক ভূমিকা অবশ্যই আছে। যদি কেউ মনে করে যে আপনাকে তার ভয় পাওয়া *উচিত*, তাহলে সেক্ষেত্রে ভয় ক্ষমতার একটি বৈধ উপায়। যেমন, ধরা যাক, আপনি কোনো একটি গ্রুপের নেতা, যা—আপাতত ধরা যাক—কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ নয়। গ্রুপের সব সদস্য মিলেই বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনারা গ্রুপটি গঠন করেছেন। বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বসম্মতিক্রমে একটি গ্রুপ গঠিত হওয়া মানেই প্রত্যেকের জন্য পালনীয় কিছু নিয়ম-নীতি থাকা। এখন, এই গ্রুপের সদস্য থাকতে হলে, প্রত্যেককে নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে। যেহেতু আপনি গ্রুপের সকল সদস্যের নেতা, এবং যেহেতু সবাই (আপনিসহ) নিয়মগুলি মেনে চলছে কি না তা তদারকি করার দায়িত্ব আপনার, সেহেতু গ্রুপের সদস্য থাকতে চাইলে সবাই একথা মেনে নেবে যে আপনাকে তাদের ভয় করা উচিত—অন্তত গ্রুপের কোনোরূপ নিয়মাবলী ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, এসব ক্ষেত্রে "ভয়ের নেতৃত্ব" অবলম্বন করাও *উচিত*—গ্রুপের গোটা সদস্যমণ্ডলীর স্বার্থেই।

অতএব, আবারও বলা যায়, সফল নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ভয়ের ভূমিকা ততটুকু, যতটুকুতে কেউ মনে করে যে নেতা হিসেবে আপনাকে তাদের ভয় করা *উচিত*।

আপনি যাদের নেতা, তাদের মনে আপনি কখন ভয় সঞ্চার করতে পারবেন, এ হল সে-বিষয়ক আলোচনা। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে নেতাই অনুসারীদের ভয়ের কারণ। কিন্তু এর অন্য একটি দিকও আছে, যার গুরুত্ব পলিটিক্সের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আরো বেশি। সেক্ষেত্রে আপনাকেই সবাই ভয় পাবে (অর্থাৎ মান্য করবে—এমনকি বাধ্য হয়েও), অথচ ভয়ের **কারণটি** আপনি নন; ভয়ের কারণ হল অন্য কোনো ব্যক্তি বা অবস্থা বা প্রতিষ্ঠান। যেমন, উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, আপনার অঞ্চলে সন্ত্রাসীদের বা ডাকাতের প্রকোপ খুব বেশি। এরাই আপনার অঞ্চলের জনগণের ভয়ের প্রধান কারণ—প্রাণের ভয়, সম্ভ্রমের ভয়, সর্বস্ব হারাবার ভয় ইত্যাদি। এই ভয় থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে জনগণ আপনাকে নেতা ক'রে একটি প্রতিরোধমূলক পরিষদ গঠন করেছে, বা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, আপনিই নিজের উদ্যোগে আর সকলের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমর্থন নিয়ে একটি পরিষদ গঠন করেছেন। এই প্রতিরোধী পরিষদের সফলতা নির্ভর করছে আপনার নেতৃত্বের সফলতার উপর—এ কথা পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা ভালোভাবেই জানে। ফলে, আপনাকে শক্তিশালী করার জন্য, বা অন্য কথায়, নিজেদেরকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য, তারা সর্বসম্মতিক্রমে প্রণীত নীতিমালার মধ্যে থেকে আপনার বাধ্যতা স্বীকার করবে। তখন, উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে, তাদের জন্য আপনার বাধ্যতা স্বীকার করা বা আপনাকে ভয় করা ছাড়া কোনো পথ থাকবে না। এক্ষেত্রে জনতার ভয়ের (অর্থাৎ বাধ্যতার) সুফল ভোগ করছেন আপনি, অথচ ভয়ের কারণ আপনি নিজে নন। এটাই খাঁটি পলিটিক্স।

আগেই বলা হয়েছে, এই বাহ্যিক ভয়ের উৎস হতে পারে কোনো পরিস্থিতি, যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অর্থনৈতিক অবক্ষয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক-নৈতিক অরাজকতা ইত্যাদি। এ ধরনের যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারলে, উক্ত দুর্যোগের শিকার যে-সব

www.pathagar.com

জনগণ, তাদের সমর্থন পাওয়া যায়। তখন মানুষ ঐ সব দুর্যোগকে ভয় পায় ব'লে, তা থেকে রেহাই পাবার জন্য নেতার হাতকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে মানুষ নেতাকেও ভয় পায় (অর্থাৎ তার আনুগত্য স্বীকার করে)।

কোনো কিছু *হারাবার ভয়* যেমন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে, তেমনি, কোনোকিছু *না-পাবার ভয়ও* তাদেরকে জোট গঠনে প্রবৃত্ত করে। মানুষের চরিত্র রহস্যজনক। কেউ কোনো কাজ করলে সে কিছু পাবে—এই আশায় মানুষ ঐ কাজ করতে চায় ব'লে আমরা মনে করি। কিন্তু আরেকটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারণটি উল্টো : অর্থাৎ কেউ এ কারণে কাজ করে না যে, তা করলে সে কিছু পাবে, বরং, ধাঁধাঁর মত হলেও সত্য যে, সে ঐ কাজটি করতে চাইবে এজন্য যে, সে তা না করলে কাঙ্খিত জিনিসটি *পাবে না*। অর্থাৎ *পাওয়ার ইচ্ছা* মানুষকে যতখানি তাড়িত করে, *না-পাবার ভয়* তাকে তার চেয়ে বেশি উদগ্রীব ক'রে তোলে। এ হল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি—একে স্বার্থপরতা ব'লে উপরোক্ত তত্ত্বটিকে খাটো ক'রে দেখার কোনো শক্তিশালী যুক্তি আছে ব'লে মনে হয় না। অন্য কথায়, পাবার সম্ভাবনায় মানুষ যতটা আশ্বস্ত হয়, না-পাবার আশঙ্কায় সে তার চেয়ে বেশি পীড়িত হয়। আমরা মানুষকে কোনো প্রতিদানের বিনিময়ে কোনো কাজ করাতে চাইলে, তার মধ্যে, এই তত্ত্ব অনুসারে, উক্ত প্রতিদান **পাবার ইচ্ছার** চেয়ে তা **হারাবার ভয়ই** তাকে উক্ত কাজের প্রতি বেশি আগ্রহী ক'রে তোলে। সুতরাং "ভয়ই" মানুষকে কাজে প্রবৃত্ত করে, "আশা" নয়। "ধন্য আশা কুহকিনী"র কবি "আশাকে" এক-চোখা দৃষ্টিতে দেখেছেন।

কিন্তু, নিঃসন্দেহে, এই ভয় আর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া ভয় এক কথা নয় আদৌ। **যে-ভয় মানুষ নিজের মধ্যে নিজেই সৃষ্টি করে, তাকে অবলম্বন করেই সফল নেতৃত্ব দেয়া যায়।** সুতরাং "এ কাজ করলে আপনি এই জিনিস পাবেন" এই আহ্বানের চেয়ে "এ কাজ না করা হলে আপনি এই জিনিসটি পাবেন না" এই আহ্বান, আমার মতে, আরো বেশি শক্তিশালী হবে।

প্রতিটি মানুষ বেঁচে থাকে ভবিষ্যতের মধ্যে। এ কারণেই তার বর্তমানের যত কাজের আয়োজন। ভবিষ্যতে সে কী পাবে বা হবে তা নিয়েই তার যত মাথা-ব্যথা। কিন্তু, মানুষ নিজেই সচেতনভাবে জানে না, ভবিষ্যতের পাবার আশা তাকে শুধু কল্পনায় আনন্দিত করে; যা তাকে তা পাবার পরিকল্পনায় কাজে প্রবৃত্ত করে, তা হল ভবিষ্যতে তা **না-পাবার** ভয়। মানুষের সব সক্রিয় কর্মকাণ্ডের তাড়না হল এই ভয়, আশা নয়। তবে ভুল বুঝলে চলবে না : আমরা যে-ভয়ের কথা বলছি তা ব্যক্তি নিজেই নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে। সফল নেতৃত্ব দিতে হলে নিজে ভয়ংকর বস্তুতে পরিণত হওয়া নয়, মানুষের নিজের সৃষ্ট এই ভয়কে ম্যানেজ করতে পারা চাই। প্রসঙ্গত বলা যায়, অর্থনীতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ "opportunity cost" বা "সুযোগ ব্যয়ের" ধারণা মূলত মানুষের এই "না-পাবার" ভয়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত, যদিও অর্থনীতিবিদগণ খুব কমই তা উপলব্ধি ক'রে থাকেন।

কোনোরূপ confusion এড়াবার জন্য আবারও বলি : "হারাবার ভয়" আর "না-পাবার" ভয় এক কথা নয়। "হারাবার ভয়" হল যা আছে তা থেকে বঞ্চিত হবার ভয়;

www.pathagar.com

অপরপক্ষে "না-পাবার" ভয় হল যা নেই, কিন্তু যা কাম্য এবং যা বিশেষ কোনো কাজের মাধ্যমে পাওয়াও সম্ভব, তা থেকে বঞ্চিত হবার ভয়।

অনেককে হতাশ ক'রে দিয়ে একথা বলতে হচ্ছে (অবশ্য সত্য কথা অনেককেই হতাশ করে দেয়) যে, নেতা যখন নিজেই ভয়ের উৎস, তখন অচিরেই তার নেতৃত্বের মৃত্যু ঘটবে। এরূপ নেতৃত্ব সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছু নয়। আপনি তখনই একজন সফল নেতা, যখন আপনার অনুসারীরা আপনাকে ইচ্ছে ক'রেই—এবং আগ্রহের সাথেই—ভয় পায়। কিছু কিছু ব্যক্তি বা অবস্থাকে মানুষ ভয় পেতে চায় না ব'লেই কাউকে ভয় পাবার মাধ্যমে তারা তার হাতকে—এবং ফলত নিজেদেরকেই—শক্তিশালী করার প্রয়াস পায়। এ কথা সকল পর্যায়ের নেতারই মনে রাখা উচিত। তাছাড়া মানব মনে বাইরে থেকে চাপানো ভয়ের একটি সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রম করার পর মানুষ আর উক্ত ভয়ের বস্তুকে বা ব্যক্তিকে ভয় পায় না। বাইরের চাপানো ভয়, বিপরীতক্রমে, মানুষকে সাহসী ক'রে তোলে। অন্য কথায়, আগেই যেমন বলা হয়েছে, মানুষ ততক্ষণই কাউকে বা কোনো অবস্থাকে ভয় পায়, যতক্ষণ তার সামনে অন্য কোনো বিকল্প থাকে না। অনর্থক ভয় সৃষ্টি করলে মানুষ তা থেকে রেহাই পাবার জন্য বিকল্প খুঁজে বের করবেই।

মানুষের এসব ভয়কে সফলভাবে ম্যানেজ করার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে আপনার প্রতি নির্ভরশীল ক'রে তুলতে পারেন। কেননা, এসব ভয় কাটিয়ে উঠতে হলে আপনাকেই তাদের দরকার।

উদ্দীপনা

ভয়ের মত উদ্দীপনা বা প্রেরণাও ক্ষমতার বা প্রভাবের একটি উৎস। এই উদ্দীপনার উৎস হল কাজের বিনিময়ে মানুষের কিছু পাবার আশা (পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা অনুসারে, না-পাবার ভয় সহ)। কোনো প্রতিষ্ঠানে মানুষ নেতার (অর্থাৎ ম্যানেজারের) নির্দেশ অনুসারে কাজ করে কেন? কারণ তারা জানে যে, কাজের বিনিময়ে তারা পাবে কাজের পুরস্কার (reward—অর্থাৎ বেতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিধাদি)। এই পুরস্কার বা reward দ্বারা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়—

কাজের জন্য পুরস্কার দিয়ে,
পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে,
পুরস্কার না দিয়ে, এবং
পুরস্কার না দেয়ার ভয় দেখিয়ে।

পুরস্কার দেয়ার বা না-দেয়ার নেতৃত্ব সার্থকভাবে সম্ভব কেবল প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে। সে প্রতিষ্ঠান হতে পারে কোনো রাজনৈতিক দল, ক্লাব, ট্রেড ইউনিয়ন, সমিতি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। কাজের আর্থিক বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব

www.pathagar.com

যার হাতে থাকে, তার হাতে, সঙ্গত কারণেই, ক্ষমতাও অর্পিত হয়। এই ক্ষমতাকে বিচক্ষণভাবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে নেতৃত্বের ভিত্তি আরো মজবুত করা এবং তার দক্ষতা আরো বাড়ানো যায়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পুরস্কার বলতে এখানে যা বুঝানো হচ্ছে তা শুধু আর্থিক পারিশ্রমিক বা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত পুরস্কারকেই বুঝায় না। পদোন্নতি, বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, প্রশংসা, অধিকার বা ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদিও এর আওতায় পড়ে। মোট কথা, দাতা সব সময়ই একটি বিশেষ ক্ষমতা ভোগ ক'রে থাকেন। কারণ কী? কারণ হল গ্রহীতা তার উপর সরাসরি **নির্ভরশীল। আপনার উপর কেউ কোনো কারণে নির্ভরশীল হলে আপনি কোনো না কোনো দিক থেকে তার উপর ক্ষমতাবান। নির্ভরশীলতা ক্ষমতার সৃষ্টি করে।**

জ্ঞান

জ্ঞানও ক্ষমতার একটি চমৎকার উৎস। আপনি যা জানেন, তা যদি অন্য কারো কোনো কাজে লাগে, এবং সে যদি তার প্রয়োজন মেটাবার জন্য আপনার উক্ত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে আপনি তার উপর ক্ষমতাবান। বিভিন্ন ব্যবসায়িক এবং অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এর চমৎকার উদাহরণ দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোম্পানির Information Department বা তথ্যকেন্দ্রের তথা MIS ডিপার্টমেন্টের কথা উল্লেখ করা যায়। দলিল-পত্রে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের মত এই ডিপার্টমেন্টের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং মর্যাদা একই হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে (informally) এই ডিপার্টমেন্ট অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের তুলনায় বেশি প্রভাবশালী হয়ে থাকে। কোম্পানির যাবতীয় তথ্যাদি প্রথমে আসে এই ডিপার্টমেন্টে, এবং এখান থেকেই সংঘবদ্ধ ক'রে তথ্যাদি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়ে থাকে। ফলে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জন্য, অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট, এবং এমনকি উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও, এই ডিপার্টমেন্টের উপর **নির্ভরশীল** থাকে। তাদের এই নির্ভরশীলতা তথ্যকেন্দ্রকে অতিরিক্ত অপ্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার আসনে উন্নীত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্যকেন্দ্রের কর্মকর্তারা তাদের এই প্রভাবকে প্রাতিষ্ঠানিক পলিটিক্সের কাজে ব্যবহার করেন।

গ্রামে-গঞ্জেও এরূপ প্রভাবের অস্তিত্ব চমৎকারভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক গ্রামে বা মহল্লায় কিছু লোক থাকে যাদের কাছে সরকারী উর্ধ্বতন পর্যায়ের আদেশ এবং তথ্যাবলী আগে এসে পৌঁছায়। এই তথ্যাবলীর উপর যেসব লোক নির্ভরশীল, তারা সঙ্গত কারণেই উক্ত ব্যক্তির কাছে এসে ধর্না দেয়।

ডাক্তার, উকিল, প্রকৌশলী ইত্যাদি বিশেষজ্ঞরাও, একই কারণে, সমাজে বিশেষ প্রভাবের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাদের এই প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চরিত্রের না হলেও এ প্রভাব খাটিয়ে তারা বিভিন্ন উচ্চতর সামাজিক সুবিধা ভোগ ক'রে থাকেন।

রাজনীতির অঙ্গনেও এই প্রভাব অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। সমাজের প্রবীণ রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক—প্রমুখ ব্যক্তিদের উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এঁদের বস্তুনিষ্ঠ মতামতকে উপেক্ষা ক'রে গোয়ার্তুমিপূর্ণ রাজনীতির চাল চেলে অনেকেই সমূহ বিপদে পড়ে যান। এমনটি এদেশে হয়েছে, হচ্ছেও। এই সুবাদে এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বিশেষ প্রভাব ভোগ ক'রে থাকেন। **জ্ঞানই শক্তি।**

কাজ

সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করলে ক্ষমতা—এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতাও—অর্জন করা যায়। পার্টি পর্যায়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক ক্রিয়াকাণ্ড যথোপযুক্তভাবে পরিচালনা করলে জনগণের নজরে পড়া যায় এবং তাদের আস্থাভাজন হওয়া যায়। কাজ মানুষকে মনোবল দেয়, অভিজ্ঞতা দেয়, নোতুন নোতুন চিন্তা যোগায়। শুধু তাই নয়, সামাজিক দিক থেকে গঠনমূলক কাজ সমাজে সংশ্লিষ্ট কর্মীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়, সমাজকে তার ব্যাপারে সচেতন ক'রে তোলে। অন্যদিকে, সমাজের আর দশজনকেও সাংগঠনিক, বিভিন্ন সামাজিক, এবং প্রতীকী আনুষ্ঠানিক কাজে প্রবৃত্ত করতে পারলে তাদের মধ্যে **উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঐক্য** গড়ে ওঠে। কাজ মানুষকে ভাবতে শেখায়, সামাজিক দাবিতে তার অংশগ্রহণের সক্রিয়তার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সঠিক সময়ে সঠিক কর্মসূচি মানুষের চিন্তাকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যের প্রতি পরিচালিত করে। ফলে সামাজিক চিন্তার এবং সচেতনতার **ঐক্য** গ'ড়ে ওঠে। কাজ মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন মেটাবার মধ্য দিয়ে সমাজের **ক্ষমতার শূন্যতা** [অধ্যায়-৩ এর কৌশল-১ দেখুন] পূরণ করার মাধ্যমে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় অন্যান্য প্রতিযোগিদের অবস্থান দুর্বল ক'রে দেয়। এ কাজ হতে পারে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করা, সমাজের কোনো গ্রুপের দাবি-দাওয়া পূরণের ক্ষেত্রে তাদেরকে সমর্থন এবং সহযোগিতা দেয়া, অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, কিংবা, এমনকি, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করা। **কাজই শক্তি**। কারো পক্ষে একনিষ্ঠভাবে কাজ করলে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাকে আপনি আপনার উপর **নির্ভরশীল** ক'রে তুলতে পারেন। ***There is power in being helpful to others***—অর্থাৎ, কারো নিকট সহযোগিতাপূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে তাকে নিজের উপর নির্ভরশীল ক'রে তোলা যায়, যার ফলে তার উপর ক্ষমতাবান হওয়া যায়।

কাজের এই শক্তি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু ক'রে যে-কোনো ব্যবসায়িক বা অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য। আপনি যদি আপনার বসের (boss) কাজ নিজ হাতে ক'রে দেন, এবং এভাবে তাকে আপনার প্রতি **নির্ভরশীল** ক'রে তুলতে পারেন, তাহলে আপনি কোনো না কোনো ক্ষেত্রে তার ক্ষমতার অংশীদার হতে পারবেন—অর্থাৎ তার ক্ষমতাকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

কিন্তু একটি কথা মনে রাখা দরকার : যে-ব্যক্তি মাটি খোঁড়ে সেও কাজ করে, আবার যে-ব্যক্তি সিঁড়ি তৈরি করে, সেও কাজ করে। তবে প্রথম জন নিচের দিকে

www.pathagar.com

নামতে থাকে, আর দ্বিতীয় জন উঠতে থাকে উপরের দিকে। এ কারণে, কাজ এমনভাবে করা উচিত যেন চিন্তা করছি, এবং চিন্তাও এমনভাবে করা উচিত যেন কাজ করছি। কাজ এবং চিন্তা একে অপরকে ধারণ করে।

ক্ষমতার উপর ক্ষমতা
(Power over power)

মানুষকে **নির্ভরশীল** ক'রে তোলার মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করার এটিও আরেকটি কার্যকর এবং চমৎকার দিক। বিচক্ষণতা এবং যোগ্যতার বলে ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে বা গ্রুপকে বা প্রতিষ্ঠানকেও নির্ভরশীল ক'রে তোলা যায়। কেউই সব দিক থেকে ক্ষমতাবান নয়। প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো সীমাবদ্ধতা আছে। কেউ সম্পদের অধিকারী কিন্তু বিচক্ষণ নয়; কেউ এক বিরাট জনগোষ্ঠীর নেতা কিন্তু তার চিন্তার তাত্ত্বিক গভীরতা নেই; কেউ বা কোনো প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে আসীন কিন্তু কারিগরী জ্ঞানের জগতে তার প্রবেশাধিকার সীমিত, অথচ তা তার জন্য আবশ্যক, কিংবা তার শক্তিকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়ার জন্য বিরোধী শক্তি বা প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতা খুব তৎপর; কারো হয়তো জ্ঞান বা সামাজিক সুনাম আছে কিন্তু সাংগঠনিক ভূবনে কোনো হাত নেই—এরূপ ইত্যাকার সীমাবদ্ধতা মানুষের থাকে। কোনো না কোনো দিক থেকে এরা প্রত্যেকেই ক্ষমতাবান, কিন্তু অন্য কোনো দিকে তারা দুর্বল।

এরূপ **আংশিক ক্ষমতাসম্পন্ন** ব্যক্তি বা দলের যে-ক্ষমতার অভাব আছে, তা তাকে সরবরাহ করতে পারলে অনেকাংশে উক্ত দলের বা ব্যক্তির ক্ষমতা বা প্রভাবকে নিজের কাজে ব্যবহার করা যায়। শুধু তাই নয়, বিচক্ষণভাবে এরূপ সম্পর্ক গ'ড়ে তুলতে পারলে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করাও যায়।

অনেক সময় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোটকে বা অন্যান্য ক্ষমতার উৎসকে আয়ত্তে এনেও নিজের ক্ষমতার পরিধিকে সম্প্রসারিত করা যায়।

সম্পর্ক

প্রভাবশালী বা ক্ষমতাবান এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজস্ব পরিমণ্ডলে বেশ প্রভাব এবং মর্যাদা অর্জন করা যায়। পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখা গেছে, কি গ্রামে, কি শহরে, সব সমাজেই এমন কিছু লোক আছে, যাদের সাথে প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সুসম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তারা খুব জোরালোভাবে প্রচার করে যে, তাদের সাথে অমুক অমুক মন্ত্রীর বা সচিবের বা নেতার (ইত্যাদি ইত্যাদি) পারিবারিক সূত্রে সম্পর্ক আছে। মাঝে মধ্যে তারা তাদের কথার সত্যতাও কিছু কিছু কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়াস পায়। জনগণ তাদেরকে ঢালাওভাবে বিশ্বাস না করলেও, বিস্ময়করভাবে, তারা এরূপ আধা-সত্য প্রচারকে পুঁজি ক'রে বেশ প্রভাব অর্জন করে থাকে, যদিও সে-প্রভাব ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ।

www.pathagar.com

আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কোনো প্রভাবশালী (বিশেষত আমলা, মধ্যম শ্রেণীর নেতা ইত্যাদি) ব্যক্তির সাথে কোনো জনগণের দূরত্ব যত বেশি, জনগণের কাছে তার প্রভাবের ধারণা তত বড়। মানুষের এই ভাবনার উৎস অজ্ঞতা, সন্দেহ নেই; তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনেক সময় এই দূরত্ব এবং বানোয়াট গল্প কিছু কিছু লোককে সত্য সত্যই কিছুটা প্রভাবশালী বানিয়ে দেয়। এ থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয়; তা হল এই যে, **সব ক্ষমতা এবং প্রভাব অনেকাংশে মনস্তাত্ত্বিক**।

যাহোক, যারা তাদের এরূপ দূরবর্তী প্রভাবের সত্য বা অসত্য উৎসের প্রচার করে, তারা উক্ত ক্ষমতার সূত্র ধ'রে কিছু কিছু লোককে বিভিন্ন কাজ ক'রে দেবার **অঙ্গীকার** ক'রে তাদেরকে **নির্ভরশীল** ক'রে তোলে। তাদের উপর অন্যদের এই নির্ভরশীলতাই তাদেরকে সমাজের বিশেষ পরিমণ্ডলে প্রভাবশালী ক'রে তোলে।

নিয়ন্ত্রণ

অপরকে নিজের উপর **নির্ভরশীল** ক'রে তোলার, এবং এভাবে তাদের উপর ক্ষমতাবান হওয়ার, আরেকটি উপায় হল **নিয়ন্ত্রণ** প্রতিষ্ঠা করা। এই নিয়ন্ত্রণ হতে পারে—

- তাদের আচরণের উপর,
- তাদের স্বার্থের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত অর্থের বা সম্পদের (resource) উপর,
- যে-সব তথ্যের উপর তাদের কর্মকাণ্ড নির্ভরশীল তার উপর,
- তারা যে-স্থানে অবস্থান করছে তার উপর, এবং, সর্বোপরি,
- তারা যে-কাজ করে তার ফলের বা পুরস্কারের উপর।

বলা বাহুল্য, এই নিয়ন্ত্রণ জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠা করলে তা অচিরেই হারাতে হবে। আসলে, এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বৈধ এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ উপায় হল **তাদেরই স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করা**। জনগণ যখন আপনাকে দায়িত্ব দিবে, তখন তা পালন করার জন্য আপনাকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতাও দিবে। সদুদ্দেশ্য থাকলে বিচক্ষণভাবে দায়িত্ব এবং ক্ষমতা উভয়ই কৌশলে আদায় ক'রে নেয়া যায়; জনগণের পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা দেয়ার অপেক্ষায় বসে থাকার দরকার পড়ে না।

www.pathagar.com

মানুষ নিজে সুখে এবং নিরাপদে থাকার জন্য নিজেই নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সমাজ গঠন ক'রে লোকেরা পরস্পরকে বলতে চায়, "এসো, আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করি।" কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝতে পারে যে তারা নিজেরাই তাদের ক্ষতির কারণ। "সুতরাং", তারা ভাবে, "আমরা যদি নিজেদেরকে সুখী ক'রে তুলতে চাই, তাহলে আমাদেরকে প্রথমে যা করতে হবে তা হল, **নিজেরাই নিজেদেরকে শাসন করা।**" কিন্তু অতি সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট : সবাই হাকিম হলে হুকুম কলুষিত হয়ে যায়। ফলে তারা সবাই মিলে একজন নেতাকে নির্বাচন ক'রে তাকে বলে, "ভাই নেতা, **আমাদেরকে নিজেদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তুমি আমাদেরকে শাসন কর।**" চমৎকার বুদ্ধি মানুষের! সাধেই কি মানুষকে রাজনৈতিক জীব ব'লে আখ্যায়িত করা হয়েছে? **মানুষ স্বেচ্ছায়ই শাসিত হতে চায়।** মানুষের এই সদিচ্ছাই মানুষকে সভ্য ক'রে তুলেছে।

সুতরাং দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে কখনোই নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত নয়। তাতে নেতৃত্ব টিকবে না। এবং এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষকে আপনার উপর নির্ভরশীল ক'রে তোলার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হল **লিখিত নিয়মাবলীর** উপর নির্ভর ক'রে সবাইকে নিয়ে একটি সংগঠন দাঁড় করানো—হোক তা রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক। এ বিষয়ে পরবর্তী কোনো একটি অধ্যায়ে আরো আলোচনা করা হবে, যেখানে আমরা এই উৎসটির চরম সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করব ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের (Institutionalization of power) মধ্য দিয়ে।

ক্ষমতার আরেকটি ব্যাপক এবং শক্তিশালী উৎস হল অন্যদেরকে নিজের প্রতি মানসিকভাবে আকৃষ্ট করার দক্ষতা, যাকে সচরাচর ক্যারিজ্‌ম্যাটিক পাওয়ার বা ম্যাগনেটিক পাওয়ার বলা হয়।

অন্য কথায়, নিজের সততা, বদান্যতা, জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য আপোষহীন সংগ্রামের অভিপ্রায়, চারিত্রিক মোহনীয়তা, বাহ্যিক আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করা। উপরের কথাগুলি থেকেই বুঝা যাচ্ছে কিভাবে জনগণকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে তুলতে হয়। সুতরাং এ ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রোয়জন ব'লে মনে করি। তবে এ প্রসঙ্গে এই মূলনীতিটি মনে রাখা দরকার :

জনগণ নেতাকে যখন যেভাবে দেখতে চায়, নেতার উচিত তাদের কাছে তখন সেভাবে তাদের কাছে উপস্থিত হওয়া।

তবে এখানে ক্যারিজ্‌ম্যাটিক ক্ষমতার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

রহস্য

মানুষের একটি রহস্যময় বৈশিষ্ট্য এই যে, যাকে সে রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী ব'লে মনে করে, তাকে সে আগ্রহের সাথে শ্রদ্ধা করে, ভয় পায়, এবং ভালোবাসে। যে ক্ষমতার অস্তিত্ব মানুষ অনুভব করে বা বিশ্বাস করে, কিন্তু যার অস্তিত্ব মানুষের বিশ্বাস ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, এবং যে-ক্ষমতার ধ্বংস সম্ভব নয় (ব'লে মানুষ মনে করে), তাকে রহস্যময় ক্ষমতা বলা হয়ে থাকে। ধর্মীয় গুরুদের ক্ষমতা, ভক্তদের বিশ্বাস অনুসারে, রহস্যময় ক্ষমতা।

মানষের জ্ঞানের একটি বিরাট সীমাবদ্ধতা আছে। তা হল : খুব কম লোকই জানে তারা কী জানে, এবং অধিকাংশ লোকই জানে না তারা কী জানে না। জ্ঞানের এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই রহস্যের অস্তিত্ব।

বিস্ময়ের ব্যাপার হল, মানুষ যাকে রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী ব'লে মনে করে, তাকে সে নিজের আগ্রহ দ্বারা তাড়িত হয়েই ভক্তি করে—এ কারণে নয় যে তাকে তারা অত্যন্ত 'ভালোবাসে', বরং এ কারণে যে তাকে তারা ভয় করে। এ ভয় এমন ভয় যা এড়াবার কোনো বিকল্প নেই। ফলে তারা বাধ্য হয়েই ভয়ের বোধকে নিজেদের মনের মধ্যে ভক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে ফেলে। ভক্তি, নিঃসন্দেহে, ভালোবাসার চেয়ে আঠালো এবং কঠিন এবং প্রেরণাদায়ক। তবে একথা পুরোপুরি সত্য নয় যে, ভক্তির মধ্যে শুধু ভয় আছে, ভালোবাসা নেই। উভয়ই আছে। তবে ভয়ের পরিমাণ বেশি। এবং, সম্ভবত, এই ভয়ই ভালোবাসার উৎস।

তবে একথাও পুরোপুরি ঠিক নয় যে, মানুষ কেবল ধর্মীয় নেতাদেরকেই রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী ব'লে মনে করে। আস্তিক মানুষ যে-কোনো সৎ (তার দৃষ্টিতে) এবং উচ্চ মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোককে, পুরোপুরি না হলেও, আংশিকভাবে রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী ব'লে মনে করতে পারে। এমন অনেক লোকও আছে যারা পার্থিব জীবনে সফল এবং অগাধ জ্ঞানের অধিকারী লোককেও ঐশ্বরিক আশীর্বাদপুষ্ট ব'লে মনে করে। এবং অধিকাংশ লোকই অনেক লোককে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে ঐশ্বরিক আশীর্বাদপুষ্ট ব'লে মনে করে।

কিন্তু একটি কথা মনে রাখা দরকার। মানুষের কাছে রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী ব'লে ভান করার কোনো দরকার নেই। তাতে উল্টো ফল হবার সম্ভাবনাই বেশি। আপনার রহস্যময় ক্ষমতা আছে কি-না সে বিচার আপনার অনুসারীদের উপর ছেড়ে দেয়াই ভাল।

দূরত্ব

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গঠন করার মাধ্যমে মোহনীয় ক্ষমতা (charismatic power) অর্জন করার আরেকটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ—এবং অত্যাবশ্যক—কৌশল হল জনগণ এবং নিজের মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা। কথাটিকে আত্মবিরোধী মনে হচ্ছে? তা মনে হলেও প্রমাণিত সত্য এই যে—

নৈকট্য লাভ করতে হলে পরিমিতি দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

www.pathagar.com

তবে তার মানে এই নয় যে, জনগণের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে হবে। তার মানে এই নয় যে, জনগণকে নিচু এবং নিজেকে উঁচু ভাবতে হবে। তার মানে এই নয় যে, জনগণকে কখনো সান্নিধ্য দেয়া যাবে না। যা করতে হবে তা হল ঠিক এ সবের বিপরীত।

Familiarity breeds contempt—অতি পরিচয় মানুষের পারস্পরিক মর্যাদাকে ধ্বংস করে। মানুষ যাকে অত্যন্ত সহজে কাছে পায়, তাকে সে যথাযথ মূল্য দেয় না। নেতা হতে হলে জনগণের মনে নিজেকে দুষ্প্রাপ্য অথচ অত্যাবশ্যক বস্তুতে পরিণত করতে হবে। নিজের সম্বন্ধে জনগণের মনে কিছুটা রহস্যবোধ জাগিয়ে তোলা চাই।

তাহলে কী করতে হবে?

নিজেকে দূরে রাখতে হবে, তবে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না।
জনগণকে ছুঁয়ে থাকতে হবে, কিন্তু তাদের নাগালের মধ্যে থাকা যাবে না।

নিজেকে জনগণের বন্ধু ব'লে প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কিন্তু তাদেরকে এও বুঝতে দিতে হবে যে, আপনি তাদের কাজের বন্ধু, যার ফলে কাজের ব্যস্ততা আপনাকে মাঝে মাঝে দুষ্প্রাপ্য ক'রে তোলে, যদিও আপনি সর্বদা তাদের সান্নিধ্যে থাকার জন্য উদ্‌গ্রীব।

জনগণের জন্য নিজের দরোজা সর্বদা খোলা রাখতে হবে (open door policy), তবে দেখাতে হবে যে, অত্যধিক গণসংশ্লিষ্ট কাজের চাপে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আপনি যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ দিতে পারেন না।

জনতার সংশ্রবে আসার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক পথ অবলম্বন করতে হবে। যেমন, সভা, সেমিনার, অফিসিয়াল ভিজিট, পরিকল্পিত পরিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে জনতার সংস্পর্শে আসতে হবে। তবে যতটুকু সময় তাদের সংস্পর্শে থাকবেন, ততক্ষণ দম্ভহীনভাবে আন্তরিকভাবে তাদের সাথে মিশে যেতে হবে, যেন তারা বুঝতে না পারে যে আপনি তাদের থেকে পরিমিত দূরত্ব বজায় রাখতে চান।

কেউ আপনার অফিসে আপনার সাথে দেখা করতে চাইলে তাকে যেন প্রথমে আপনার সহকারীর কাছ থেকে সাক্ষাতের আগাম তারিখ ও সময় (appointment) ঠিক ক'রে নিতে হয় এই নিয়মটি গ'ড়ে তুলুন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব অনুসারে সময় নির্ধারণ করুন। তবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া কাউকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। অতঃপর , সাক্ষাতের সময় অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এবং আগ্রহী হয়ে বক্তার কথা (অভিযোগ, প্রস্তাব ইত্যাদি) শুনতে হবে। তবে তারই মধ্যে "অন্যান্য" প্রয়োজনেও যে আপনার ব্যস্ততা আছে, তা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমন, কোনো ব্যক্তির সাথে আলাপ চলাকালে,

www.pathagar.com

আপনার সহকারী এসে আপনাকে হয়তো বলল যে, আপনার সাথে দেখা করার জন্য আরো এক বা একাধিক ব্যক্তি অপেক্ষা ক'রে আছেন, কিংবা একটু পরেই কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় বা আলোচনায় আপনাকে যোগ দিতে হবে, কিংবা আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন কল অপেক্ষা ক'রে আছে, কিংবা . . .। অর্থাৎ সাক্ষাৎপ্রার্থীকে বুঝতে দিতে হবে যে আপনি আপনার অত্যন্ত মূল্যবান সময় নষ্ট করেও তাকে আন্তরিকভাবে সাক্ষাৎ দিয়েছেন, যদিও সে-সাক্ষাৎ অনিবার্য কারণে সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

ব্যস্ততা দেখাতে হবে, তবে, কোনোক্রমেই, বিরক্তি প্রকাশ করা চলবে না।

অত্যন্ত মনোযোগী শ্রোতা হতে হবে, তবে গালগপ্পের অবকাশ দেয়া চলবে না।

কোনো সভায় উপস্থিত হতে হবে অন্যান্যদের চেয়ে পরে, তবে নিজের ভূমিকার বা বক্তৃতার ঠিক আগমুহূর্তে। একইভাবে, নিজের ভূমিকা সেরে অন্যান্য ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে সভা ত্যাগ করতে হবে সবার আগে।

নিজেকে জনগণের মধ্যে উপস্থিত রাখতে হবে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সেখানে নিজের গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা থাকে। অযথা বাক্যালাপের বা কালক্ষেপণের প্রশ্রয় দেয়া উচিত হবে না।

নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ক'রে তোলার সবচেয়ে বড় উপায় হল জনগণের সাথে নিজের কার্যকর এবং ফলপ্রসূ সম্পর্ককে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা, এবং জনগণকে তা স্পষ্টভাবে বোঝার সুযোগ ক'রে দেয়া, এবং একই সাথে এটাও তাদেরকে উপলব্ধি করতে দেয়া যে, আপনার জন্য এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজের সংখ্যা অনেক।

জনগণের জন্য সর্বদা দরোজা খোলা রাখতে হবে বটে, তবে দরোজার সংখ্যা একাধিক হওয়া চাই। অর্থাৎ আপনার কাছে পৌঁছাতে হলে কাউকে যেন একাধিক ধাপ অতিক্রম করার প্রয়োজন হয়। একাধিক ব্যক্তির মধ্য দিয়ে এবং একাধিক ধাপের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে করতে সাক্ষাৎপ্রার্থীর মনে আপনার সম্বন্ধে একটি রহস্যময় মনোভাব তৈরি হবে। সে বুঝতে এবং অনুভব করতে থাকবে আপনি আসলে কত ব্যস্ত এবং কত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতার অস্তিত্ব মনস্তাত্ত্বিক—এ কথা ভুললে চলবে না। জনগণ আপনাকে নেতা *ভাবে* ব'লেই আপনি তাদের নেতা। নিজের সম্বন্ধে অপরের মনে সঠিক ভাবনাটি জাগিয়ে তুলতে পারা চাই। রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সকল প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

যে-কোনো ধরনের নেতৃত্বেরই একটি রাজনৈতিক চরিত্র থাকে। ক্ষমতার কুশলী ব্যবহারই নেতৃত্ব। নেতৃত্বের গতিশীল দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই রাজনীতি। ফলে, আবশ্যিকভাবে, ব্যবসায়িক বা জনকল্যাণমূলক "অরাজনৈতিক" প্রতিষ্ঠানের ভেতরকার

www.pathagar.com

আবহাওয়ায়ও অনেকাংশে রাজনৈতিক। মোট কথা, যেখানেই মানবীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত ক্ষমতাকে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের কাজে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ যেখানেই জোটবদ্ধ মানুষেরা ক্ষমতার সৃষ্টি এবং ব্যবহার ক'রে থাকে, সেখানেই রাজনীতির অস্তিত্ব থাকে। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু (অর্থাৎ নেতা) তার প্রয়োগক্ষেত্র (যেমন জনগণ) থেকে "নিরাপদ" এবং মর্যাদাপূর্ণ দূরত্বে না থাকলে ক্ষমতা তার তীব্রতা, কার্যকারিতা, এবং তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে।

যখন-তখন যেখানে-সেখানে যার-তার সামনে পানাহার না করা ভাল। অতি-ব্যক্তিগত কাজ এবং অভ্যাসগুলিকে জনগণের গোচরে আনার দরকার নেই। বক্তৃতায় বা আলোচনায় রসিকতা ভালো, তবে তা হওয়া উচিত আনুষ্ঠানিক (formal) ধাঁচের এবং সময়োপযোগী বা বিষয়োপযোগী।

সাধ্য মতো অফিস সাজাতে হবে। নিজের বসার অফিস-রুমটি এবং টেবিলের আকৃতি তুলনামূলকভাবে বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়। **মানুষ অনেক কিছুই দেখে বিচার করে।** বাহ্যিক সাজ-সজ্জায় ভেতরকার গুরুত্বকে যতদূর সম্ভব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। **দৃশ্য মানুষের মধ্যে ভাবনা জাগিয়ে তোলে।** সুতরাং, **যে দেখতে চায়, তার জন্য দেখার জিনিস রাখা চাই। যে শুনতে চায়, তাকে শোনাবার জন্য গ্রহণযোগ্য এবং পছন্দসই সংবাদ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা চাই।** যে অনুভূতি চায়, তাকে সান্নিধ্য দেয়া চাই।

তবে মনে রাখা উচিত, মানুষ চায় অনেক, কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পেলে সে পাওয়ার গুরুত্ব বুঝতে পারে না। মানুষকে ততটুকু দিতে হবে, যতটুকু পেলে সে খুশি হবে, কিন্তু যতটুকু পেলে তার চাওয়ার তীব্রতা বিন্দুমাত্র কমবে না।

যাহোক, দূরত্বের এই আবশ্যকীয় লুকোচুরি উর্ধ্বতন নেতা বা কর্মকর্তাদের সাথে খেলা আদৌ উচিত নয়। কিন্তু তারাও কিন্তু স্বয়ং আপনার সাথেও এই খেলা খেলবেন। সেক্ষেত্রে তাদের দূরত্বকে সম্মান করতে হবে। তার পরও অবশ্য বলতে হয়, প্রয়োজনীয় দূরত্ব যে-কোনো ব্যক্তির সাথেই রেখে চলতে হয়। **দূরত্ব মানুষের ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করে।** কাহলিন জিব্রানের ভাষায় তাই বলতে হয় :

কিন্তু ব্যবধান থাক তোমাদের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে . . .

. . . . . .

আর অবস্থান কর পাশাপাশি, তবে ঘেঁষাঘেষি ক'রে নয় :
যেমন নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে থাকে গির্জার থামগুলি;
এবং যেমন বেড়ে ওঠে না ওক আর সাইপ্রেস বৃক্ষ
পরস্পরের ছায়ার মধ্যে।

— *দ্য প্রফেট*

www.pathagar.com

দৃশ্যমান ক্ষমতা
(Visible power)

ক্ষমতা দেখা যায় (power is visible.)। ক্ষমতার এই মনস্তাত্ত্বিক উৎসকে বিচক্ষণতার সাথে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রকৃত ক্ষমতা আরো বাড়ানো যায়। আগেই বলা হয়েছে, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরার ধরণ, কথোপকথনের সময় নেতাসুলভ অঙ্গভঙ্গি, করমর্দনের ধরন, আবেগের সময় শারিরীক অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ, চলাফেরার সময় সঙ্গী বা দেহরক্ষী রাখা ইত্যাদি মানুষের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। বিপদে-আপদে জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রদর্শনীমূলক প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন, প্রয়োজন অনুসারে বৈধ- এবং মার্যিতভাবে লোকবল প্রদর্শন ইত্যাদিও ক্ষমতাকে "দেখার বস্তুতে" পরিণত করে। **ক্ষমতা দেখানো চাই—কাজের মাধ্যমে, কথার মাধ্যমে।**

ক্ষমতাকে দৃশ্যমান ক'রে তোলার আরেকটি উপায় হল ব্যক্তিগতভাবে এবং দলীয়ভাবে সফলতার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা। দেখানো চাই যে, জনগণকে পেয়ে—তাদের সংখ্যা কম হোক আর বেশিই হোক—আপনি তৃপ্ত। সব ক্ষেত্রে কেউ সফল না-ও হতে পারে, তবুও সফলতার ভান করতে হবে। মানুষের ভাষা, আচরণ, এবং বাস্তবতার প্রতি প্রতিক্রিয়া হলো তার ব্যক্তিত্বের পোশাক। নিজেকে দুর্বল ভাবা চলবে না। এমনকি পরাজয়েও (যেমন নির্বাচনে পরাজয়) মানসিকভাবে অনড় এবং উদার থাকতে হবে। নিজে পরাজিত হয়েও জয়ীকে আন্তরিক সংবর্ধনা দিতে হবে। সরলতা সততা এবং উদারতার প্রতি মানুষ এখনও দুর্বল। **গণতান্ত্রিক নৈতিক জয়ই** প্রথম কথা। মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা পেলে সবই পাওয়া যায়।

পরিশেষে একটি কথা না বললে ক্ষমতার এই উৎসের গুরুত্বকে খাটো ক'রে দেখা হয়ে যাবে। ভয়ের গুরুত্ব ক্ষমতার **উৎস** হিসেবে যতখানি, তার গুরুত্ব তার চেয়ে বেশি ক্ষমতার **রক্ষক** হিসেবে। ভয় মূলত ক্ষমতার পাহারাদার। ক্ষমতার প্রধান গণতান্ত্রিক উৎস হল এই ক্যারিজ্‌ম্যাটিক আকর্ষণ। প্রসঙ্গত, এখানে আপনার ছেলের সেই উদাহরণটিকে আবারও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। প্রশ্ন ছিল : আপনি আপনার ছেলের উপর ক্ষমতাবান, কারণ, এক দিকে আপনি যেমন তার ভয়ের কারণ, অন্য দিকে তেমনি তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছু **নিয়ন্ত্রণ** করার ক্ষমতা আপনার হাতে। কিন্তু, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আপনি আপনার ছেলের (বা মেয়ের) উপর যতটুকু ক্ষমতাবান, আপনার ছেলে (বা মেয়ে) আপনার উপর তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। যেমন, তার কোনো আবদার আপনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হলেও, এবং অনেক কষ্ট ক'রেও, পূরণ না ক'রে কি পারবেন? শুধু কি তাই? সে কষ্ট আপনাকে বরং আনন্দই দেবে। সন্তানের জন্য মানুষ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এর উৎস রক্তের সম্পর্ক হলেও, নিঃসন্দেহে, তার লক্ষণ হল ক্যারিজম্যাটিক। তিনিই প্রকৃত সার্থক নেতা, যার জন্য জনগণ হাসিমুখে কষ্ট স্বীকার ক'রে নেয়। তিনিই প্রকৃত নেতা, যিনি জনগণের জন্য হাসি-মুখে জুলুমকে বরণ ক'রে নেন।

www.pathagar.com

ক্ষমতার তৃতীয় প্রধান উৎস হল জনগণকে জনগণের উপর নির্ভরশীল ক'রে তোলা।

মূলত এতক্ষণ যে-সব কৌশল আলোচিত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশের সাথে এই ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবুও এই ধারণাটিকে আলাদাভাবে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

এই প্রক্রিয়ার মূলনীতিগুলি হল :

এমন একটি মুহূর্তের অপেক্ষা করা যার মোকাবেলা করতে হলে জনগণের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন। জনগণকে এই মুহূর্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে দেয়া চাই।

তারপর তাদেরকে বুঝানো চাই যে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সে সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে বা সে উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে।

তারপর বলিষ্ঠ এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বের দক্ষতা দিয়ে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর মাধ্যমে, যার একটি গঠনতন্ত্র থাকবে, এবং যাতে প্রত্যেকের জন্য দায়িত্ব ভাগ ক'রে দেয়া থাকবে, প্রত্যেকের জন্য থাকবে নির্দিষ্ট ক্ষমতা, ইত্যাদি। চাই একটি **লিখিত** দলিল। এক্ষেত্রে নেতার সাংগঠনিক দক্ষতার উপরই যাবতীয় সফলতা নির্ভর করে। সংগঠনটিকে সাজাতে হবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে। নেতা-কর্মীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হল : সামনে রাখতে হবে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী লক্ষ্য কিংবা কোনো অপশক্তির বিরোধিতার উদ্দেশ্য। এসব ব্যাপারে এই বইতে বিভিন্ন স্থানে আরো আলোচনা করা হবে। তবে সাংগঠনিক পদ্ধতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিলতা নিয়ে এ বইতে তেমন আলোচনা করা হবে না।

একটু পুনরাবৃত্তি করা যায় : **একটি সিস্টেম (system) বা সংগঠন (organization) সব সময়ই একটি ক্ষমতার জন্ম দেয়। সুতরাং একাধিক ব্যক্তির একটি আনুষ্ঠানিক জোট হল ক্ষমতার একটি উৎস।** শুধু তাই নয়, সংগঠন বা সিস্টেম ক্ষমতার ধারকও বটে। প্রকৃতপক্ষে, একটি সংগঠন দাঁড় করানোর মাধ্যমেই 'প্রভাবকে' 'ক্ষমতায়' রূপান্তরিত করা হয়। যাদেরকে নিয়ে এই সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান, তারা সংগঠন থেকে উদ্ভূত ক্ষমতা দেখে এক ধরনের সার্থকতার বোধ অনুভব করবেন। এবং তারা একথাও বুঝতে পারবেন যে, তারা যদি তাদের ঐক্য ধ'রে না রাখতে পারেন, তাহলে সংগঠনটি ভেঙ্গে পড়বে। বিলুপ্ত হবে ক্ষমতা। এ কারণে ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই তারা একে অপরকে ধ'রে রাখার জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল থাকবেন। সত্য কথা বলতে কি, এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টির দায়িত্ব স্বয়ং নেতার। বিচক্ষণ সাংগঠনিক দক্ষতা ছাড়া ক্ষমতার মত দুর্ধর্ষ দৈত্যকে বাগ মানিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩

প্রভাবশালী হবার উপায়

www.pathagar.com

নেতা হতে গেলে প্রভাবশালী হতে হয়। প্রভাব থেকেই আসে ক্ষমতা। সুতরাং প্রথমে ভালোভাবে জানতে হবে প্রভাব আসে কী কী থেকে। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রভাবের বিভিন্ন উৎস সম্বন্ধে জেনেছি। ঐ উৎসগুলোকে বলা যায় কারণ। প্রভাব হল সেগুলোর সম্মিলিত ফল। এই কারণ থেকে ফলে পৌঁছতে গেলে কী দরকার? কাজ। সুযোগ্য বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা, ও অধ্যবসায় দ্বারা প্রভাবের উৎসগুলো থেকে প্রভাব অর্জন ক'রে নিতে হয়। এই কাজগুলো মূলত কিছু কলাকৌশল যা সুচিন্তিতভাবে সময়মত প্রয়োগ করতে হয়। বহু আগে থেকে এবং সমসাময়িক কালে বিভিন্ন দেশে এবং সমাজে অনেক নেতাই প্রাথমিক পর্যায়ে এরূপ কৌশল প্রয়োগ করতেন এবং করছেনও। কেউ কেউ আবার নেতা হবার জন্য সজ্ঞানে এরূপ কৌশল প্রয়োগ না করলেও মাহাত্মের কারণে বা অন্য কোনো কারণে মানুষের মঙ্গল করতে গিয়ে এরূপ কিছু কিছু কৌশলগত আচরণ করেছেন এবং তার ফল হয়েছে একই—প্রভাব অর্জন। আমরা এই অধ্যায়ে বর্তমান যুগে প্রয়োগযোগ্য সবচেয়ে কার্যকর কিছু কৌশলের সাথে পরিচিত হব।

একটি কথা : নেতৃত্ব মানেই টেকনিক বা কৌশল, কারণ নেতৃত্ব একটি আর্ট। কিন্তু কৌশল এমনই জিনিস যার সাথে উচিত-অনুচিত বোধ জড়িত। তীব্র নীতিবাগীশগণ সব ধরনের কৌশলকেই ক্ষতিকর ব'লে ঘোষণা করেন। আবার আধুনিক যুগে কৌশলকে বরং সম্মানের চোখেই দেখা হয়। তবে কৌশলকে ভালো (ethical) এবং মন্দ (unethical) হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সুতরাং কৌশলের সাথে আইনগত সমস্যা জড়িত থাকতে পারে।

আবার প্রয়োজন আইনেরও উর্ধ্বে। হত্যা, দমন, যুদ্ধ, রক্তপাত এ সবই তো পুরোপুরি আইনসঙ্গত, যদি কাজগুলো সরকার ক'রে থাকেন। বিপরীত পক্ষে, স্বৈরাচারী সরকারকে (সত্যিকারের স্বৈরাচারী এবং দেশের জনগণের শত্রু) বা বহিরাগত ঔপনিবেশিক সরকারকে উৎখাত করার জন্য জনগণই আইন হাতে তুলে নেয়। সুতরাং কোনটা আইনসঙ্গত কোনটা বেআইনি তা প্রধানত সময় এবং প্রয়োজনই নির্ধারণ করে।

তবুও একটি সরকার-ব্যবস্থার অধীনে তার পক্ষে, বিপক্ষে, বা স্বতন্ত্রভাবে আপনাকে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। সুতরাং আপনার কৌশলকে হতে হবে বৈধ বা আইনসঙ্গত। কোনো আইনের বই অবশ্য আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে না, কারণ কী কী কৌশলে নেতৃত্ব দান করতে হবে তা আইনের বইতে লেখা থাকার কথা নয়। তবে কী কী কাজ *করা যাবে না* সে ব্যাপারে আইন আপনাকে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে। সেগুলোকে মেনে চলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

অবশ্য, দুঃখের বিষয়, আইনগত স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আমাদের দেশে (এশিয়ার এবং পৃথিবীর অনেক দেশেই) "বেআইনি" নেতৃত্বের কলাকৌশলেরও অনুশীলন চলছে। এ ব্যাপারে আমি কিছু নেতার কাছে জানতে চেয়েছি (ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ব'লে সঠিক উত্তরটিও পেয়েছি) তারা আইন ভঙ্গ করেন কেন। উত্তরে তারা বলেছেন, "সব আইন তো ভঙ্গ করি না (অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলোই তারা ভঙ্গ ক'রে থাকেন), তবে যে-সব আইন দেশের জন্য ক্ষতিকর সেগুলো আমরা মানি না। অবৈধ সরকারের আইন

www.pathagar.com

মানতে জনগণ বাধ্য নয়।" একথা ঠিক যে একটি সরকারকে অবৈধ কখন বলা যাবে তার জন্যও আইন আছে, আবার একথাও ঠিক যে অবৈধ সরকারের আইন খুশি মনে মেনে নেবার কোনো কারণই নেই। তবে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে : অবৈধ সরকারের স্বার্থ রক্ষার্থ প্রণীত অবৈধ আইন না মানলেও আমাদেরকে *জনগণের আইন* মানতেই হবে। তা যদি আমরা না মানি তাহলে আমরা নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই আটকে যাব—আজ হোক আর কাল।

যাহোক, এই অধ্যায়ে—এবং এই বইতে—বৈধ অবৈধ সব ধরনের কৌশলই উপস্থাপন করা হবে। অবৈধ কৌশলগুলো উপস্থাপন করা হবে বাস্তবতাকে তুলে ধরার জন্য, সেসব কৌশলের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য, এবং "আপাতমধুর" মনে হলেও সেগুলো যে অনেক ক্ষেত্রেই দূর ভবিষ্যতে ধ্বংসই ডেকে আনে, তা দেখাবার জন্য।

প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যায় যে সত্যিকার অর্থে প্রভাবশালী হতে গেলে কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। মূলত প্রভাবশালী হতে গেলে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হতে হয়; আবার জনপ্রিয় হতে হলে পরিচিতি লাভ করতে হয়; পরিচিতি লাভ করতে গেলে আবার জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয় বা নজরে পড়তে হয়। সুতরাং ধাপগুলো এরূপ :

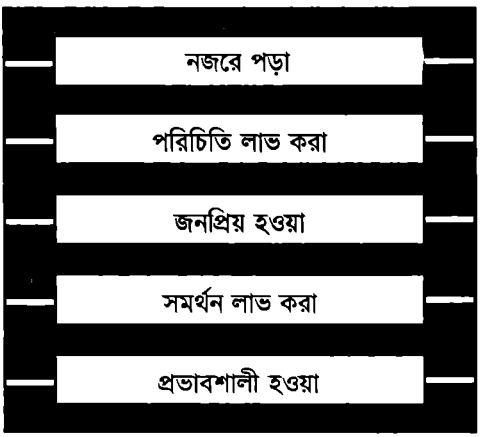

এই গোটা প্রক্রিয়াটি অবশ্যই ধাপে ধাপে ঘটে, যদিও সময়ের দাবিতে এবং অন্যান্য কারণে একেক নেতার ক্ষেত্রে ধাপগুলো অতিক্রম করার সময় একেক রকম।

অবশ্য জনপ্রিয়তা বলতে যা বুঝায় তা অর্জন না ক'রেও যে কেউ প্রভাবশালী হননি তা নয়। সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রেও যে প্রভাব অর্জন করা যায় তার নজির আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, জাতীয় পর্যায়ে, এবং স্থানীয় পর্যায়েও রয়েছে। তবে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রে প্রভাব অর্জন করেন তাদেরকে হয় পরবর্তীতে কোনো না কোনো ভাবে জনসমর্থন আদায় ক'রে নিয়ে প্রভাবকে বৈধ ক্ষমতায় রূপান্তরিত করতে হয়, না হয় শুধু সন্ত্রাসী

www.pathagar.com

কাজ চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে কিছুকালের জন্য উক্ত সন্ত্রাসীর মাধ্যমেই প্রভাব-অর্জন করে যেতে হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যও সন্ত্রাস (এবং তার দ্বারা নিজের আখের গোছানো এবং ক্ষমতার তৃষ্ণা মেটানো) এবং উপায়ও সন্ত্রাস। সুতরাং তা নেতৃত্ব নয়। সমর্থক না থাকলে নেতা হওয়া যায় না, এবং আমাদের মূল লক্ষ্য নেতৃত্ব বিষয়ক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা। অবশ্য আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে আমরা উভয় দিকই খুঁটে-বেছে দেখার চেষ্টা করব।

আবার উপরোক্ত প্রভাব অর্জনের ধাপগুলোর প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। একটি বিশেষ মুহূর্তে একজন নেতা কোন ধাপে অবস্থান করছেন তা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে বলা যায় না। ধাপগুলো মূলত তাত্ত্বিক (conceptual) বিচার বিশ্লেষণের সুবিধার্থেই চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এদের ব্যবহারিক মূল্য যে নেই এমনটি মোটেও নয়। নেতৃত্ব এবং প্রভাব মূলত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। আপনি কার মন কতখানি দখল করেছেন তা মাপজোক ক'রে বলতে পারবেন না। তবে সমর্থকের সংখ্যা, বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাদের যোগদান, আপনার প্রতি তাদের সার্বিক নৈতিক মনোভাব—ইত্যাদি দ্বারা তা আপনি মুটামুটি সন্তোষজনকভাবে অনুমান করতে পারেন। তাছাড়া এরূপ অনুমান সম্ভব না হলেও আপনাকে প্রভাব অর্জনের জন্য ঠিক ধাপে ধাপেই এগুতে হবে। কারণ সমর্থক (supporter, follower)-রা আপনার প্রতি ধাপে ধাপেই অগ্রসর হবে—এটাই বাস্তবতা। সুতরাং আপনি বিশেষ একটি মুহূর্তে কোন ধাপে আছেন তা স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারলেও আপনাকে নিজের অগ্রগতির নিশ্চয়তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য হিসাব ক'রে ক'রে পর্যায়ক্রমে এগুতে হবে।

আরেকটি জিনিস, একই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে আপনার অবস্থান বিভিন্ন হতে পারে। হয়তো একটি ক্ষেত্রে বা অঞ্চলে বা গ্রুপের কাছে আপনি এই মহূর্তে শেষ ধাপে অবস্থান করছেন, অথচ অন্য একটি ক্ষেত্রে বা অঞ্চলে বা গ্রুপের কাছে আপনি অবস্থান করছেন দ্বিতীয় ধাপে। এমনটিই হয়। এ কারণে সব ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমই সব সময়েই পরিচালনা ক'রে যেতে হয়। নেতৃত্ব একটি গতিশীল (dynamic) প্রক্রিয়া যে।

www.pathagar.com

নজরে পড়ার বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার কৌশল

নেতৃত্বের এবং প্রভাব অর্জনের প্রথম সূত্র হল : **Be visible** বা নজরে পড়। মূলত এই কৌশলটি নেতৃত্বের ভূবনে যারা প্রথম পদার্পণ করবেন তাদের জন্যই। তবে পরিচিত নেতাদের জন্যও এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেক সময় জনগণের কাছে নোতুন ক'রেও পরিচিত হবার প্রয়োজন হয়, নয় কি? উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যাপক ব্যর্থতার পর বা কেলেঙ্কারির পর নেতৃত্বের তোড়জোড় নোতুন আঙ্গিকেই শুরু করতে হয়। অবশ্য নোতুনদের ক্ষেত্রে যেখানে ঠিক **চেহারায়** এবং **নামে** পরিচিত হওয়াই প্রথম কথা, সেখানে পুরনোদের জন্য দরকার নোতুন **কাজে**, বিশ্বাসে, উদ্যমে, এবং নীতিতে পরিচিত হওয়া। এই দুই পরিচয়ের চরিত্র ভিন্ন, সন্দেহ নেই, তবে উপায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন।

এখন যে কৌশলগুলো উপস্থাপন করা হবে সেগুলোর অধিকাংশকেই রাজনীতিতে, অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, গোষ্ঠীগত প্রভাব বলয়ে—বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। কিছু কৌশলের প্রয়োগ দেখা গেছে কেবল শক্তিশালী মেধার উচ্চ শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের দ্বারা। কিছু কৌশল বিভিন্ন সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক গবেষকদের দ্বারা প্রস্তাবিত—কেবল মুষ্টিমেয় কিছু বিচক্ষণ নেতাদেরকেই সেগুলো প্রয়োগ করতে দেখা যায়। তাহলে এবার কৌশলগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া যাক।

www.pathagar.com

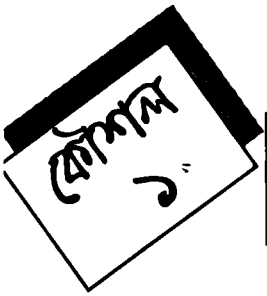

শূন্যতা পূরণ
(Fill in a vacuum)

এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর এবং বহুল ব্যবহৃত কৌশল। বলা যায় এই কৌশলটি কখনই বৃথা যায় না। কৌশলটি রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে, সমিতিতে, এমনকি অসংঘবদ্ধ সামাজিক পরিমণ্ডলেও সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায়।

এই কৌশলটির পেছনে একটি দার্শনিক যুক্তি রয়েছে। তা হল :

> Power can be created from "nothing" or a vacuum by filling it. অর্থাৎ, শূন্য থেকেই ক্ষমতার উদ্ভব; কোন শূন্য অবস্থাকে যথাযোগ্যভাবে পূরণ করতে পারলে ক্ষমতার সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ দেয়া যাক। ঢাকার যানজটপূর্ণ রাস্তাগুলোতে একেবারে নির্বোধ অক্ষম কিছু লোকের দ্বারাও এই কৌশল প্রয়োগ ক'রে (যদিও তারা মূল দার্শনিক তত্ত্বটি জানে না) সাময়িকভাবে ক্ষমতা অর্জন করে লাভবান হতে দেখা যায়। বিশেষ ক'রে পুরনো ঢাকার অধিকাংশ রাস্তায়ই প্রচণ্ড জানজটের সময় এরূপ ঘটনা ঘটে। অসংখ্য গাড়ির উপস্থিতির কারণে ছোট ছোট এসব রাস্তার মোড়ে মোড়ে জ্যাম লেগে যায়। মাঝে মাঝে জ্যাম এত বেশি লেগে যায় যে রিকশা গাড়ি ট্যাক্সি ইত্যাদি যানবাহনকে একাধিক ঘন্টা ধ'রে অপেক্ষা করতে হয়। যে-সব স্থানে ট্রাফিক পুলিশ নেই সে-সব স্থানে সমস্যাটি আরো প্রকট হয়। তখন একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ট্রাফিক পুলিশের অনুপস্থিতিই এখানে শূন্যতা। অবস্থার দাবি এই যে, সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভারসাম্য আসুক—অর্থাৎ সমস্যা (জ্যাম) যখন সৃষ্ট হয়েছে, তখন সমাধানও আসুক।

Nature abhors vacuum—প্রকৃতি সর্বদা শূন্যতাকে পূরণ করে। ফলে সেখানে যেসব লোক কাজকাম না পেয়ে আশেপাশে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়, তাদের মধ্য থেকে দু'এক জন স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। উপস্থিত আটকে-পড়া যাত্রীরা এবং ড্রাইভাররা তাতে খুশিই হয়। তারা তাকে মৌন সম্মতি দেয় অবস্থায় হস্তক্ষেপ করার জন্য। এটাই তাদের ক্ষমতা। বিস্ময়কর ব্যাপার, অন্য সময় যে ট্যাক্সি ড্রাইভার বা রিকশাঅলা এরূপ অকেজো লোকেদের সামান্য শক্ত কথাও সহ্য

www.pathagar.com

". . . জনগণ এত বোকা নয় যে তারা এরূপ নাশকতামূলক কার্যকলাপ সহ্য করবে। . . ."

বলা বাহুল্য, এই পরোক্ষ উস্কানির ব্যবহারই বেশি দেখা যায়। এরূপ নৈর্ব্যক্তিক উস্কানির মাধ্যমে উস্কানিদাতা নিজেকে সম্ভাব্য অপ্রিয় ঘটনার দায়ভার থেকে মুক্ত করতে চান। কিন্তু দায়ভার শুধু মৌখিকভাবে অন্যের উপর চাপালেই যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাই ঘটবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবুও এভাবে অনেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে সক্ষম হন।

অনেক সময় এরূপ উস্কানির আরেকটি কদর্য রূপও চোখে পড়ে। জনগণের সামনে অনেকে এভাবে কারো বিরুদ্ধে "নৈতিক" ঔচিত্যের বুলি ফুঁকে দিয়ে ওদিকে আবার নিজেদেরই পোষা গুণ্ডা লেলিয়ে দেন প্রতিপক্ষের উপর। "অপ্রিয় ঘটনার" পর আবার "বিবৃতি" দেন, "'জনগণই' তাদেরকে সমুচিত জবাব দিয়েছে।"

সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ উস্কানি হল পরোক্ষ উস্কানির দ্বিতীয় রূপটি। ভয় বা আতঙ্ক থেকেই রাগের জন্ম। নেতারা এই মনস্তাত্ত্বিক সূত্রটি ভালোই জানেন। তাই তারা সরাসরি উস্কানিমূলক প্ররোচণা না দিয়ে প্রতিপক্ষের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জনমনে ভীতি ছড়িয়ে দেন। এই ভীতি জনতাকে তিলে তিলে উন্মাদ বানিয়ে দেয়। আর এটি তো সবার জানা যে একটি ভয়-পাওয়া কুকুর কামড়াবার জন্য যত আগ্রহী, একটি আত্ম-বিশ্বস্ত কুকুর ততটা নয়। ফলে, ভীত-সন্ত্রস্ত জনতা সুযোগ পেলে দাঁত বসাতে চায়। তারা সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে প্রকৃত বিপদকেই ডেকে আনে।

অবশ্য ব্যাপারটি কখনো একতরফা রূপ ধারণ করে না। উস্কানিরও পাল্টা-উস্কানি আছে। আছে আঘাতের পাল্টা-আঘাত। হিংসার জন্য প্রতিহিংসা। ফলে সৃষ্টি হয় দুটি পক্ষের। উভয় পক্ষই উন্মাদ। তখন যা ঘটে তাকে বলে সত্যিকারের ধ্বংসযজ্ঞ আর কি।

উস্কানির ঠাণ্ডা লড়াই যখন উত্তপ্ত যুদ্ধে রূপ লাভ করে, তখন হয় সেন্টিমেন্ট দ্বিগুণভাবে জ্ব'লে ওঠে, না হয় ঘটনাটি একটি সুরাহার পথে যায়।

সুতরাং উস্কানির মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন বোধে পাল্টা উস্কানি, এড়িয়ে যাওয়া, বা "শান্তিচুক্তি"—এই তিন উপায়ের যে-কোনো একটির বা একাধিকের আশ্রয় নেয়া হয়। অনেক সময় আগে থেকে লেজ গুটিয়ে নেয়া ভীরুতারই নামান্তর। তাই শক্তিশালী দল ঘটনাটি ঘটার সুযোগ দেয়, এবং তারপর পরস্পর একটি সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে। এর মধ্য দিয়েই কেউ রণক্ষেত্রের বিজয় ছিনিয়ে নেয়, কেউবা নিজেদেরকে "নৈতিকভাবে" জয়ী ব'লে ঘোষণা করে।

তবে উভয়ই পরাজিত যতক্ষণ না পর্যন্ত জনগণ তাদের পক্ষে আছে।

www.pathagar.com

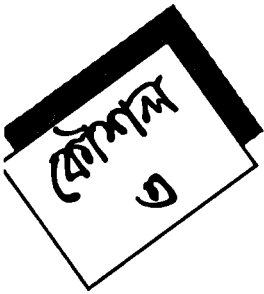

কুকুরকে ব্যস্ত রাখা (Keep the dog busy)

কৌশলটি প্রয়োগ করতে গেলে অনেক বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

কুকুরঅলা বাড়িতে চুরি করতে গেলে চোর একটি সুন্দর কৌশল অবলম্বন করে। সে কুকুরের কামড় এবং ডাক এড়াবার জন্য তাকে কিছু খাবার দেয়। খাবার পেয়ে কুকুর তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সেই সুযোগে চোর তার কাজ সেরে নেয়।

এই কৌশলটিকে লোকাল পর্যায়ে তথা জাতীয় পর্যায়ে কিছু নেতাকে খুব বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করতে দেখা গেছে।

এ কৌশল অনুসারে, প্রতিপক্ষকে কোনো একটি কম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ব্যস্ত রেখে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটিকে অলক্ষ্যে নিজের বাগে আনার চেষ্টা করা হয়। প্রতিপক্ষকে খাওয়াবার জন্য এই ইস্যু-টোপটিকে অনেক সময় কৌশলে সৃষ্টি করা হয়, আবার অনেক সময় এরূপ কোনো ইস্যু নিয়ে প্রতিপক্ষ ব্যস্ত থাকাকালীন তাকে বিভিন্ন কারণ সৃষ্টি ক'রে তার প্রতি আরও আকৃষ্ট ক'রে তোলা হয়। সেই সুযোগে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল ক'রে নেয়ার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় এরূপ ইস্যুর ফাঁদে প্রতিপক্ষকে আটকে রেখে অন্য কোনো বৃহত্তর ইস্যুকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। কৌশলটির অনেক রকমফের থাকতে পারে। নিজের এলাকার ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে এরূপ অনেক বিচিত্র উপায়ের উদাহরণ পাওয়া যাবে।

এ প্রসঙ্গে ছোট একটি গল্প বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এক অঞ্চলে ছিল এক মস্ত ডাকাত। পুলিশ তাকে ধরতে পারত না। না পারত জনগণ তাকে শায়েস্তা করতে। সে করত কি, গ্রামের হাট বারে সবাই যখন বাজার করতে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে হাটে যেত, তখন মাঝপথে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। কুখ্যাতি দ্বারা সে এত বেশি প্রভাব অর্জন করেছিল যে, তার আর কষ্ট ক'রে বাড়ি বাড়ি হামলা করতে হতো না। সে ইচ্ছে করলে এমন ব্যবস্থা করতে পারত যেন লোকেরা তার আস্তানায় গিয়ে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে তার জন্য ভেট দিয়ে আসে। কিন্তু পাছে সবাই তার আস্তানা চিনে ফেলে, এই ভয়ে সে তা করত না। সে এভাবে হাটের দিনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে "ট্যাক্স" আদায় করত। তার রোজগার ভালোই হতো।

এভাবে রাত অব্দি সে ট্যাক্স আদায় করত। হাতে থাকত অস্ত্র। কেউ তার বিরোধিতা করার সাহস পেত না। অবশেষে গভীর রাতে সবাই যখন অবশিষ্ট কিছু

www.pathagar.com

টাকা দিয়ে বাজার ক'রে ফিরত, তখন সে বেছে বেছে ভালো তরি-তরকারিও লুফে নিত।

সবার শেষে হাট ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি ফিরত এক স্বাস্থ্যবান ঝাড়ুদার। ডাকাতটি অস্ত্রের মুখে এ ঝাড়ুদারের পিঠে মাল-জিনিসসহ চড়ে নিরাপদ স্থানে গিয়ে নেমে পড়ত। তারপর সে একা পায়ে হেঁটে তার আস্তানায় চলে যেত।

ঝাড়ুদার দেখল, এ তো মহা সমস্যা। এভাবে প্রতিদিন ঐ মস্ত জোয়ান লোকটিকে বইতে গেলে তো তার অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে। সুতরাং সে একদিন এক ফন্দি আঁটলো। বাজার থেকে কিনলো বড় একটি পাকা কাঁঠাল। আর ওটা মাথায় ক'রে নিয়েই গভীর রাতে কাজ-কাম সেরে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ঐদিন যথারীতি ডাকাতটি ঝাড়ুদারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। ঝাড়ুদার তাকে আপাতত ঐ দিনের জন্য ক্ষমা করতে অনুরোধ করল। অত বড় কাঁঠাল নিয়ে সে ডাকাতকে তার মালামালসহ বইতে কিভাবে? কিন্তু ডাকাত এক গাল দুষ্টু হাসি হেসে বলল, "আজই তো খাঁটি মজা হবে!" কাঁঠালের মোহিনী গন্ধ তার নাকে এবং জিভে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল।

ঝাড়ুদার এটাই চেয়েছিল। সে কাঁঠাল আর ডাকাতকে বয়ে নিয়ে হাঁটছে, আর ডাকাত মনের আনন্দে তার মাথায় বসে কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে। কাঁঠালের স্বাদে সে একেবারে দিশেহারা।

হাঁটতে হাঁটতে ঝাড়ুদার এসে পৌঁছল পার্শ্ববর্তী পুলিশ স্টেশনে। ডাকাত তা মালুমই করতে পারেনি।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও এরূপ কৌশল প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। ইস্যুর কাঁঠাল খাওয়াতে খাওয়াতে প্রতিপক্ষকে কখনো কখনো জননিন্দার চরমে নিয়ে যাওয়া হয়, আবার কখনো কখনো তাকে ওভাবে ব্যস্ত রেখে অন্য কাজ সেরে নেয়া হয়।

বাস্তব উদাহরণ অনেক দেয়া যেত। কিন্তু পাঠক নিজের চারপাশে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে তাকালেই এরূপ উদাহরণ অনেক খুঁজে পাবেন। এ জন্য অধিক আলোচনার লোভ সংবরণ করা গেল।

www.pathagar.com

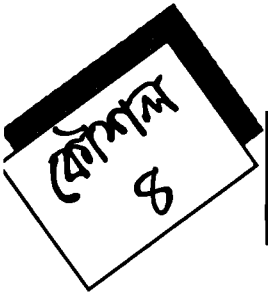

বিভক্ত ক'রে জয় কর (Divide and rule)

এই কৌশলটি সম্ভবত সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এর মূল লক্ষ্য হল "ঘরের শত্রু বিভীষণ" তৈরি করা। কর্মী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি নেতৃত্বের লড়াইতেও এই কৌশলটি অত্যন্ত সার্থকতার সাথে ব্যবহার করা যায়।

There is strength in numbers—অর্থাৎ সংখ্যার মধ্যে শক্তি নিহিত। অন্য কথায়, লোক যার জোর তার। আবার এই লোকেদের মধ্যকার unity বা ঐক্য তাদেরকে আরো শক্তিশালী করে। তাই মানুষের অভিজ্ঞতা এই প্রবাদে সঞ্চিত হয়েছে : Unity is strength—একতাই বল। Divide and rule—কৌশলটির মূল উদ্দেশ্য হল এই numbers বা সংখ্যাকে বিভক্ত ক'রে কমিয়ে দেয়া, এবং একই সাথে unity বা ঐক্যকে বিনষ্ট করা। কৌশলটি সামরিক রাজনৈতিক সকল নেতৃত্বের ক্ষেত্রেই সমানভাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রতিপক্ষ খুব বেশি শক্তিশালী হলে অনেক দিক দিয়েই তার সাথে নেতৃত্বের লড়াইতে জয়ী হওয়া খুব সমস্যাজনক হয়ে দাঁড়ায়। সেরূপ ক্ষেত্রে কৌশলে তার কর্মীমহলে বিরোধের বীজ রোপণ করতে পারলে তাকে সহজে কাবু করা যায়। কৌশলগুলো হল—

- তাদের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো নেতাকে নিজের দলে নিয়ে আসা;
- বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা বা চক্রান্ত দ্বারা বা মুলো দেখিয়ে তাদের নেতাদের বা কর্মীদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী সেন্টিমেন্ট তৈরি ক'রে তাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করা; এবং
- তাদের কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে তাতে ইন্ধন যোগানো।

শেষোক্ত সুযোগটির ব্যবহারই বেশি দেখা যায়। কোনো ব্যাপারে মতপার্থক্য মানুষের মধ্যে থাকবেই। এভাবে সৃষ্টি হতে পারে অন্তর্দ্বন্দ্বের। এভাবে কোনো ছোট খাট ঘটনার। এই ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে তখন বাইরে থেকে প্রতিপক্ষ উক্ত দলের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে দেবার জন্য উক্ত ঘটনার এমন ব্যাখ্যা দেন যেন তা দলটির বিরোধী

www.pathagar.com

গ্রুপের পক্ষে যায়। এই ব্যাখ্যা উক্ত গ্রুপের কানে পৌঁছেও দেয়া হয়। এতে সহানুভূতি, উস্কানি, এবং ইন্ধন পেয়ে অনেক সময় উক্ত গ্রুপ তাদের বিরোধের মাত্রা আরও জোরদার করে, বা এমনকি চিরস্থায়ী বিরোধী জোটেও (faction) পরিণত হয়।

দ্বিতীয় উপায়টির সার্থকতার মূলে সাধারণত আর্থিক উৎকোচই কাজ করে। মানুষের মধ্যে অত্যন্ত অর্থলিপ্সু এবং কপট লোক সব সময়ই কিছু থাকে। তারা টাকার জন্য তাদের নৈতিকতা, ধর্ম, এমনকি দেশও বিক্রি ক'রে দিতে পারে। এই কৌশলটিকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য এসব লোককে ব্যবহার করা হয়।

প্রথম কৌশলটি প্রয়োগ করা হয় প্রতিপক্ষের দলের প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে। লোকাল পর্যায়ে একটি কথা অকাট্য সত্য। তা হল : নীতি নয়, নেতাকে সমর্থন করা। এ কারণে নেতা যখন দল (নীতি) ত্যাগ করে অন্য দলে যান, তখনও তার পক্ষে অধিকাংশ সমর্থকই সমর্থন অব্যাহত রাখে। তা না রাখলে কি নোতুন দলে উক্ত নেতাকে কেউ গ্রহণ করতে চাইত? যাহোক, প্রতিপক্ষের যে-সব নেতা বেশ প্রভাবশালী, তাদের কাউকে কাউকে অনেক সময় বড় পদের বা অন্য সুযোগ সুবিধার লোভ দেখিয়ে লুফে নিতে পারলেই অনেক লাভ। অনেকে তা করেও।

ভাঙন এমন একটি জিনিস যে তা একবার শুরু হলে আর রক্ষে নেই। দল থেকে একজন নেতা ছুট দিলে তার দেখাদেখি অন্যদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ তা করতে পারে। অন্তর্দ্বন্দ্ব একবার শুরু হলে তা অনেক সময় ছোঁয়াচে রোগের মত কাজ করে। (এসব ক্ষেত্রে "নড়া দাঁত পড়া ভাল।" অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ভাঙনের কারণ যে-ব্যক্তি, তাকে অন্যভাবে বাগে আনতে না পারলে সময় থাকতে দল থেকে বিতাড়িত করা ভাল। বিতাড়িত অবস্থায় তার কোনো কর্মকাণ্ডই আর অত বেশি ক্ষতিকর হতে পারবে না।) এ কারণে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে কাউকে অধিষ্ঠিত করার আগে একাধিকবার বিবেচনা ক'রে দেখতে হয়।

www.pathagar.com

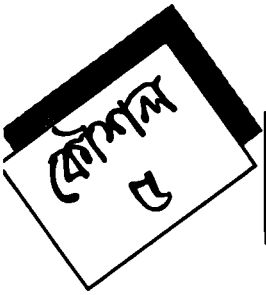

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা (Fighting fire with fire)

ধরুন আপনি বনের মধ্যে একা বসবাস করছেন। হঠাৎ একদিন বনের ওদিকটায় আগুন ধরে গেল। হু হু ক'রে আগুন আপনার দিকে এগুচ্ছে। বনের গাছপালা সাবাড় ক'রে দিয়ে সর্বভুক আগুন আপনার দিকে এগিয়ে আসছে। সেখানে কোনো দমকল বাহিনী নেই। থাকলেও তাতে আগু কোনো ফল হত কি না সন্দেহ। আপনার পেছনে কিছু দূর গিয়ে সমুদ্র। পালাবার একটাই মাত্র পথ—আগুনের মধ্য দিয়ে উল্টো দৌড়ে। কিন্তু তা তো অসম্ভব। এখন আপনি কী করবেন? কিভাবে আগুন থামাবেন?

বুদ্ধিটি কারো কারো মাথায় এসে গিয়েছে হয়তো। আপনার এখন করণীয় হল আপনার সামনের বনে বিপুলভাবে আগুন ধরিয়ে দেয়া।

"মরব নাকি?" কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন, "যে আগুনে পুড়ে মরব ব'লে ভয় পাচ্ছি, সেই আগুনই নিজের হাতে জ্বালাব?"

হ্যাঁ। এ করা ছাড়া আপনার কোনো উপায় নেই যে।

"মানে দু'মিনিট আগে মরার বুদ্ধি, তাই না?" বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে-পাঠক বইটি পড়ছেন, তিনি হয়তো আমাকে এই প্রশ্নটি করলেন।

না, ঠিক তা নয়। আপনি আগুন জ্বালাবেন বাঁচার জন্য। আগুনের সাথে আপনি লড়াই করবেন কিভাবে? আগুনের সাথে লড়াই করবে আগুন। একজনের কুকুর আপনাকে কামড়াতে এলে আপনিও কি কুকুরটিকে কামড়াবার জন্য খেঁজি মেরে উঠবেন নাকি? বরং আপনার উচিত হবে ঐ কুকুরটিকে পাল্টা ধাওয়া করার জন্য আপনার কুকুরটিকে ছেড়ে দেয়া। নয় কি?

তাহলে আসল ঘটনা হল এই। আগুনটি আপনার দিকে আসছে। এখন আপনি যদি কোনো উপায়ে (আমি জানি না কোন উপায়ে) আপনি আপনার সামনের বনে বিপুলভাবে আগুন লাগিয়ে দিতে পারেন, তাহলে সেই আগুন দৌড়াবে ঐ আগুনের দিকে। কারণ, ঐ আগুনের স্থানে বাতাস গরম হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ওখানে বাতাসের শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে আপনার কাছের বাতাস দৌড়াচ্ছে ঐ আগুনের দিকে শূন্যস্থান পূরণ করতে।

www.pathagar.com

কাজেই আপনি যদি আপনার সামনে আগুন জ্বালেন, তাহলে আপনার আগুন এই বাতাসের ধাক্কায় ঐ আগুনের দিকে ধেয়ে যাবে। এক সময়ে দু'টি আগুন পরস্পর মিলিত হয়ে ওখানেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কারণ সামনে বা পেছনে আর কোনো ধারাবাহিক বন নেই যা আগুনের খাদ্য যোগাবে। খালি মাটির উপর কি আগুন জ্বলে?

নেতৃত্বের ভুবনে অনেক সময় আগুন দিয়ে আগুন নেভানোর এই বুদ্ধির খেলা চলে। সঙ্গত কারণে কেউ যখন প্রতিপক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে প্রচার-প্রচারণা বা কৌশলের মাধ্যমে কাবু করতে পারেন না, কিংবা এসব কৌশল যখন অপর্যাপ্ত মনে হয়, তখন অনেক সময় তিনি এই কৌশলের আশ্রয় নেন। এরূপ ঘটনাকে আমরা ইট দিয়ে ইট ভাঙার বা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ঘটনার সাথেও তুলনা করতে পারি। সোজা কথায়, এ হলো অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ দ্বারা প্রতিপক্ষকে কাবু করার চেষ্টা করা। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, সময়োপযোগী বিচক্ষণতা, প্রয়োজনীয় প্রভাব—ইত্যাদি দ্বারা এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করা যায়।

অনেক সময় জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতির অঙ্গনে এই খেলার মহড়াই দর্শকদেরকে বেশি আকর্ষণ ক'রে থাকে। প্রতি বার নির্বাচনের আগে সব পর্যায়েই নেতৃত্বের এই পরোক্ষ যুদ্ধ দেখা যায়। যুদ্ধবিদ্যায়ও এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার" স্বরূপটিকে বিশ্লেষণ করা যাক। দ্বিতীয় কাঁটাটি আপনার প্রতিপক্ষ—যাকে আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য সামরিক ভাষা অনুযায়ী "শত্রু" বলব। এই কাঁটাটি আপনার পায়ে বিঁধেছে। একে তুলে ফেলতে না পারলে আপনি পূর্ণ শক্তি ফিরে পাচ্ছেন না। এর জন্য আপনার চাই আরেকটি কাঁটা—আমাদের বাক্যের প্রথম "কাঁটা"। এই "কাঁটা" কে হতে পারে? এই কাঁটা হতে পারে—

- আপনার শত্রুর শত্রু;
- আপনার শত্রুর বন্ধু; কিংবা
- আপনার বন্ধু।

সম্পর্কগুলিকে বিশ্লেষণ করার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠার মাধ্যমে এগুলির দিকে তাকানো যাক।

আমরা "← — →" চিহ্ন দ্বারা বিরোধিতার বা "শত্রুতার" সম্পর্ক এবং "→" চিহ্ন দ্বারা "বন্ধুত্বের" সম্পর্ক বুঝাচ্ছি। ধরা যাক (A) এর একজন বন্ধু (C), এবং একজন শত্রু (প্রতিদ্বন্দ্বী) (B) আছে। B-এর দু'জন বন্ধু (E) ও (F) এবং দু'জন শত্রু—(A) এবং (D)। (A)কে বাদ দিলে (B)-এর শত্রু থাকে একজন—(D)। (F) আবার (B) এবং (C) উভয়ের বন্ধু। ধরা যাক (A) সরাসরি (B)-এর সাথে যুদ্ধে নামতে চায় না। সে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চায়। তাহলে কাকে কাকে সে সম্ভাব্য কাঁটা-তোলার-কাঁটা হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে? অর্থাৎ সে কাকে কাকে (B)-এর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগে অনুপ্রাণিত করতে পারবে?

www.pathagar.com

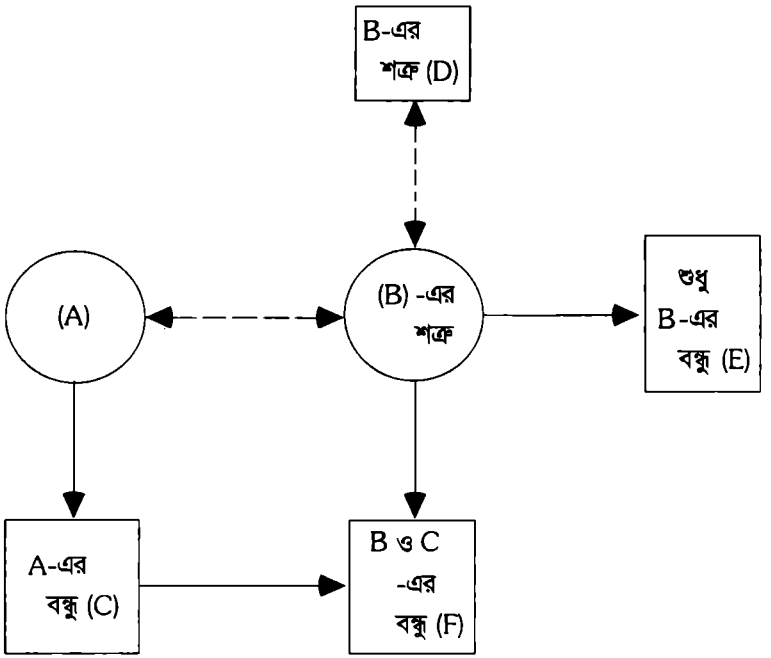

(C) যেহেতু (A)-এর বন্ধু, এবং (C)-এর বন্ধু যেহেতু (F), সেহেতু (C) যদি (F)কে (B)-এর বিরোধিতা করার জন্য, বা অন্তত তাকে সাহায্য না করার জন্য, প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে A-এর একজন সম্ভাব্য "কাজের বন্ধু" (বা কাঁটা-তোলার-কাঁটা) হল (C)। এভাবে (A) যদি (C)কে এবং (C) যদি (F)কে প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে (F) (B)-এর "শত্রু"তে রূপান্তরিত হবে (পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্র দেখুন)।

(D) আগে থেকেই (B)-এর শত্রু। সুতরাং (A) এখন (D)-এর সাথে ভাব জমাতে বা বন্ধুত্ব গ'ড়ে তুলতে পারে তাকে (B)-এর বিরুদ্ধে তার কাজে ব্যবহার করার জন্য।

(E)কে প্রভাবিত করার কোনো উপায় (A)-এর নেই।

(A)-এর সাথে (F)-এর সম্পর্ক আগে থেকে থাক বা না থাক, এখন তা (নোতুন ক'রে) গ'ড়ে তুলতে পারলে তা (B)-কে জব্দ করার কাজে ব্যবহার করা যাবে। অবশ্য (F) বেশি ঘনিষ্ঠ কার—(C)-এর নাকি (B)-এর?—সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

ধরা যাক, উক্ত সবগুলি সম্ভাব্য ব্যক্তিকে (A) কাজে ব্যবহার করতে পারবে। তাহলে (B)-এর কতজন শত্রু এবং (A)-এর কতজন বন্ধু হল নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখা যাক।

www.pathagar.com

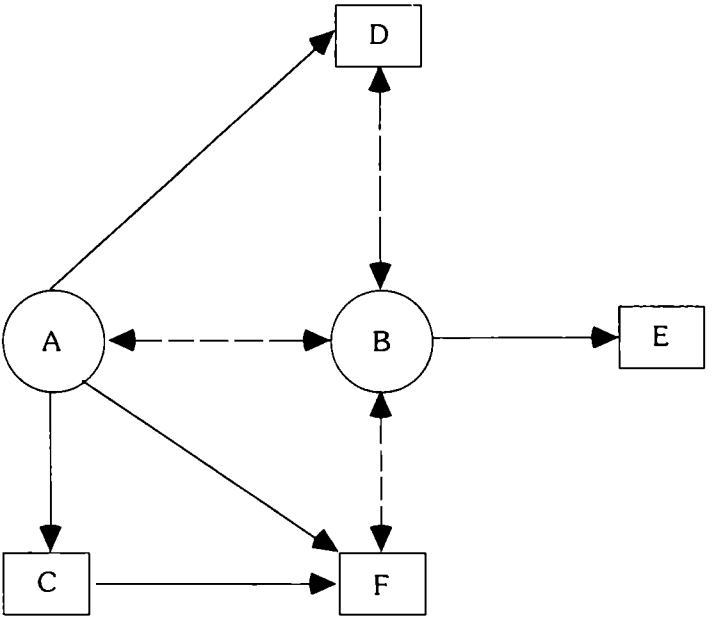

"→" চিহ্ন এবং "←——→" চিহ্নের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, এখন (B)-এর শত্রু ৩ জন, এবং (A)-এর শত্রু ১ জন। অপরপক্ষে, (B)-এর বন্ধু ১ জন (E), এবং (A)-এর বন্ধু ৩ জন (D, C, F)। এখন (A)-এর পক্ষে (B)কে কাবু করা অনেক সুবিধাজনক হবে।

আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, (A) এখন (B)কে কাবু করার জন্য—

- তার (B-এর) শত্রু (D)-এর শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে;
- নিজের (A-এর) বন্ধু (C)-এর মাধ্যমে (এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের মাধ্যমে) তার (B-এর) বন্ধু (F)কে তার শত্রুতে পরিণত করতে পারে; এবং
- সরাসরি নিজে তার বিরোধিতা করতে পারে।

অবশ্য একই সাথে (A)কে তার নিজের শত্রুদের সাথে সাময়িকভাবে ভালো সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করতে হবে।

যারা এভাবে প্রয়োজন মত "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার" পরিকল্পনা রাখেন, তারা সম্ভাব্য এরূপ "কাঁটা-তোলার-কাঁটা"-র বিস্তারিত তথ্য রেকর্ড ক'রে রাখেন। প্রয়োজনে তারা উক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ গ'ড়ে তোলেন।

www.pathagar.com

এই হল "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার" জন্য ব্যবহৃত অনেক নেতার নীল নকশা। এখানে বলে রাখা ভালো যে, এরূপ ক্ষেত্রে কার সাথে বন্ধুত্ব এবং কার সাথে শত্রুতা করতে হবে তা আপনার (বা পার্টির) স্বল্পমেয়াদী (short-term) এবং দীর্ঘমেয়াদী (long-term) লক্ষ্যের আলোকে বিবেচনা করতে হবে। অবশ্য আপনি কোনো পার্টির নেতা হলে এ ব্যাপারে আপনার স্বাধীনতা খুব সীমিত। আর আপনি যদি স্বতন্ত্র কোনো নেতা হন, তাহলে আপনাকে এটুকু বলা যেতে পারে যে, যা করবেন ভবিষ্যতে আপনি যে-লক্ষ্যে পৌঁছতে চান, তার আলোকে তা বিবেচনা ক'রে নিবেন। কোনো সিদ্ধান্ত যেন নিজেরই ঘোষিত মূল নীতির পরিপন্থী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

একটি ছোট উদাহরণ দিয়েই এই কৌশলটির আলোচনা শেষ করছি। নির্বাচনের সময় একই দলের একাধিক নেতার একই আসনের জন্য দাঁড়ানো, কারো ভোট কমানোর জন্য অন্য কাউকে দাঁড়িয়ে দেয়া, কারো সুবিধার জন্য অন্য কাউকে বসিয়ে দেয়া—ইত্যাদি কিন্তু এই কৌশলের প্রয়োগেরই ফলশ্রুতি।

ধরুন আপনার অঞ্চলে আপনার কোনো এক নির্বাচনে বিশেষ একটি পদে প্রার্থী হয়েছেন। আপনি যাদের কাছে প্রিয়, অন্য একজন ব্যক্তি (যিনি আপনার বন্ধুও হতে পারেন এবং রাজনীতির অঙ্গনে সক্রিয় থাকতেও পারেন আবার না-ও থাকতে পারেন) একই শ্রেণীর জনগণের কাছে কম-বেশি প্রিয়। এখন আপনার প্রধান প্রতিপক্ষ যে-শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রিয়, আপনাদের দু'জনের কেউই সেই শ্রেণীর জনগণের কাছে বেশি প্রিয় নন। বিপরীতক্রমে, আপনার প্রধান প্রতিপক্ষও আপনি যে-শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রিয়, তাদের কাছে তেমন প্রিয় নন। ঘটনা যদি এই হয় (যা সচরাচর হয়ে থাকে—ব্যক্তিগত পরিচিতির কারণে, বংশগত কারণে, পেশাগত কারণে, মতাদর্শগত কারণে বা অন্য যে-কোনো কারণে হোক), তাহলে হাজার প্রচার-প্রচারণা চালিয়েও আপনার প্রতিপক্ষ আপনার ভোট বেশি বাগিয়ে নিতে পারবেন না। তাহলে আপনাকে জব্দ করার জন্য তিনি কী করতে পারেন? একটি বড় উপায় হল আপনার উক্ত বন্ধুকে (যিনি আপনার বন্ধু না-ও হতে পারেন) একই পদের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দেয়া। তাহলে আপনার ভোট অবশ্যই কিছু ক'মে যাবে। এক্ষেত্রে আপনার প্রতিপক্ষের কৌশল হল fighting fire with fire, এবং এই কৌশলের ভিত্তি হল Divide and rule।

এই কৌশল শুধু এরূপ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, নেতৃত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ দেখা যায়। ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সময় বিভিন্ন দলের মধ্যে জোট গঠন, কাউকে কারো বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা—ইত্যাদি মূলত এই কৌশলেরই বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক।

www.pathagar.com

কৌশল ৬

অপরের শক্তিকে নিজের কাজে ব্যবহার করা

কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেককেই বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে অপরের যোগ্যতা, শক্তি, সুনাম ইত্যাদি নিজের কাজে ব্যবহার করতে হয়। এরূপ সহযোগিতা অর্জন করতে হয় কখনো বা ভালো সম্পর্কের ভিত্তিতে অনুরোধের মাধ্যমে, কখনো বা কৌশলে কোনো পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উপায়টিই কার্যকর কৌশল, প্রথমটি নয়। নিজের ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে অসহায় অবস্থায় অন্যের সাহায্য চাইলে তখন নেতৃত্বের মৃত্যু ঘটে। একথা সবারই জানা।

তাহলে কিভাবে অন্যের শক্তি ব্যবহার করা যায়? উপায় হল কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাময়িকভাবে কারো সাথে জোট গঠন করা বা কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। কিন্তু এই কাজটি এমনভাবে করতে হবে যেন নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমে পালনীয় দু'টি নীতি হল :

কেবল তখনই কারো সাথে কোনো চুক্তিকে আবদ্ধ হবেন যখন আপনাকে তার দরকার এবং যখন প্রস্তাবটি প্রথমে তার তরফ থেকেই আসবে।
প্রস্তাব পেয়ে প্রথমে "না" বলুন, তারপর আলোচনা শুরু করুন।

এই উপায় অবলম্বন করলে নিজের (এবং দলের) মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব। তৃতীয় কোনো শক্তির আবির্ভাব যদি আপনাদের উভয়ের জন্য একটি হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার মোকাবেলা করার জন্য, কিংবা দলীয় দাঙ্গায় উভয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে থাকলে তা এড়াবার জন্য এই ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যায়।

অনেক সময় শ্রেণী-সংঘাতের কবলে পড়লে টিকে থাকার প্রয়োজনে কিংবা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলেও জোট গঠনের প্রয়োজন হয়। শ্রেণী-সংঘাত বলতে যে শুধু মার্ক্সীয় আর্থ-সামাজিক শ্রেণীকে বুঝতে হবে, তা নয়। শ্রেণীকরণ হতে পারে আদর্শের ব্যবধানের কারণে, মতবাদের মৌলিক পার্থক্যের কারণে, সরকার গঠনের পদ্ধতিগত ব্যাপক পার্থক্যের কারণে, এবং এমনকি ধর্মীয়

www.pathagar.com

বিশ্বাসের অনমনীয় ব্যবধানের কারণে। আমরা বাহ্যিকভাবে শুধু পেশাগত এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনের সম্পর্কগত শ্রেণীভেদই সচেতনভাবে লক্ষ্য করি। এটি কার্ল মার্ক্সের একচেটিয়া ব্যাখ্যারই ফলশ্রুতি। কিন্তু, একটু আগে যেমন বলা হয়েছে, শ্রেণীভেদ আধুনিক যুগে আরো জটিল। এখন "ধর্মের" সাথে "অধর্মের" শ্রেণীভেদ, "ধর্মের" সাথে ভিন্ন ধর্মের শ্রেণীভেদ, নীতিগত মৌলিক পার্থক্যের কারণে শ্রেণীভেদ—ইত্যাদি অনেকটা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, শ্রেণী-সংগ্রামের এখন শুধু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ফলশ্রুতি নয়, এখন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক এবং আদর্শগত ব্যাপারও বটে। ফলে, উদাহরণ স্বরূপ, অনেকে লক্ষ্য না করলেও একথা সত্য যে, আওয়ামী লীগের সমর্থকদের এবং বি.এন.পি.-র সমর্থকদের মধ্যে—সার্বিক বিচারে—একটি জটিল (সরল নয়) মনস্তাত্ত্বিক শ্রেণী-সংগ্রাম লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণী-সংঘাত লক্ষ্য করা যায় জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের এবং তাবলীগ জামাতের অনুসারীদের মধ্যে। শ্রেণী-দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় বামপন্থীদের এবং মৌলবাদীদের মধ্যে। শ্রেণীর ধারণা, অতএব, এখন আরো ব্যাপক এবং অস্পষ্ট। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, একেক ক্ষেত্রে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের প্রাবল্য একেক রকমের। যেমন, জামায়াত এবং তাবলীগের মধ্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ববোধ যত প্রবল, জামায়াত এবং বামপন্থীদের মধ্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ববোধ তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। ফলে, কার্যত, জামায়াত-বামপন্থী শ্রেণী-সংঘাত দাঙ্গার আকার ধারণ করলে, জামায়াত এবং তাবলীগের শ্রেণী-দ্বন্দ্ববোধ কমতে থাকবে এবং তারা প্রয়োজনে একই শ্রেণীর মত আচরণ ক'রে বামদের মোকাবেলা করবে। ধন্যবাদ কার্ল মার্ক্স কে, তিনি মানব-সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে শ্রেণী-সংঘাতের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে প্রথম সক্রিয়ভাবে চিহ্নিত ক'রে আমাদেরকে সমাজ এবং রাজনীতির দিকে তাকাবার একটি নোতুন চোখ উপহার দিয়েছিলেন। তবে বাংলাদেশের মতো জটিল মনস্তত্ত্বের সমাজে শ্রেণীকে কার্ল মার্ক্সের কথা মতো শুধু অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপলেই চলবে না, আরেকটু এগিয়ে যেতে হবে। যাহোক, অন্য কোনোখানে এ ব্যাপারে আরেকটু মৌলিক পর্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। এখন আমরা শুধু এটুকু বলব যে, আপনি যদি দেখেন যে আপনার উপর আপনার শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আক্রমণ মূলত এরূপ কোনো শ্রেণী-সংঘাতের ফল, তাহলে সে-আক্রমণ শুধু আপনার জন্যই ক্ষতিকর নয়, আপনার শ্রেণীর অন্যান্য দল বা নেতার প্রতিও তা হুমকি স্বরূপ। এই হুমকি খুব ভয়াবহ হলে, অর্থাৎ তা কোনো আখেরি মীমাংসার দিকে পরিস্থিতিকে চালিত করতে চাইলে, তখন তার সম্মুখ মোকাবেলা ছাড়া কোনো পথ থাকে না। মনে রাখা দরকার, আঘাত যখন শ্রেণীর উপর আপতিত হয়, তখন ঐ শ্রেণীর সকল দলকেই তা পরিণামে নির্মূল করতে চাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রেণীর অন্তর্গত সবাই মিলে জোট গঠন করার দরকার হতে পারে। আপনার শ্রেণীর অন্তর্গত যে-কোনো দলই আপনার নিকটতম প্রতিবেশি, এবং একথা মনে রাখা দরকার যে :

www.pathagar.com

প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগলে আপনার ঘরটিও ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

এরূপ ক্ষেত্রে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রতিবেশির সাথে জোট বেঁধে চলা যেতে পারে। তবে জোট হওয়া উচিত সাময়িক—কেবল আঘাত ঠেকাবার জন্যই। নইলে জোটের শ্রেণী-চরিত্রের ধারায় মিশে গিয়ে স্বতন্ত্র একটি দল হিসেবে নিজস্ব স্বকীয়তা বিলীন হয়ে যেতে পারে। রাজনীতিতে তা কোনো না কোনো দলের জন্য মৃত্যুর নামান্তর। নিজের আলাদা বৈশিষ্ট্যকে সব সময় বজায় রাখা চাই।

জোট গঠনের বা চুক্তিবদ্ধ হবার বিশেষ প্রয়োজন হতে পারে ক্রস্‌ফায়ারে পড়লে। বিবদমান দুই বা ততোধিক গ্রুপের মধ্যে আকস্মিকভাবে প'ড়ে গেলে অনেক সময় নিজেকে নিরপেক্ষ ব'লে ঘোষণা করলেও কোনো কাজ না-ও হতে পারে। কারণ :

যে-ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত, তার চোখে পার্শ্ববর্তী কেউই নিরপেক্ষ নয়। তাছাড়া আঘাতের উদ্দেশ্য নিয়ে যে-ব্যক্তি হাতে অস্ত্র তুলে নেয়, সে একজন শত্রু খুঁজবেই—এমনকি প্রকৃত শত্রুকে হাতের নাগালে না পেলেও।

ফলে, এরূপ মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে বিবদমান কোনো একটি দলের পক্ষ না নিয়ে পারা যায় না। কারণ, তখন খুব সম্ভবত পক্ষ না নিলে উভয় পক্ষের আঘাতই সহ্য করতে হতে পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় দিক সুচিন্তিতভাবে বিবেচনা ক'রেই পক্ষ নিতে হয়। এই বিবেচনা একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। তা দলের নীতি ও কৌশল, সমর্থকদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, এবং তাৎক্ষণিক মুহূর্তের মিশ্র আলোকে নির্ধারিত হয়। সিদ্ধান্ত এমনভাবে নিতে হয় যেন দলের "ব্যক্তিত্ব" কলংকিত না হয়।

তবে যে-কারণেই জোট গঠন করুন বা চুক্তিবদ্ধ হোন না কেন, সব ক্ষেত্রেই :

মাঝ পথে মিলিত হোন।
(Meet them half-way.)

অর্থাৎ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে একত্র হোন। বিপন্ন অবস্থায় বা প্রয়োজনের সময়ে জোট গঠনকে শীত নির্বাপনের জন্য জ্বালানো আগুনের সাপেক্ষে কারো অবস্থানের সাথে তুলনা করা যায়। সে আগুনের বেশি কাছে গেলে পুড়ে মরার ভয়, আবার তা থেকে বেশি দূরে গেলে ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। জোট গঠনকারী মিত্রদলের সব শর্ত মেনে নেয়া ঠিক নয়। অর্থাৎ কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা চাই। এই দূরত্ব নীতির, উদ্দেশ্যের, কর্মকাণ্ডের। যেমন, জোটের কর্মসূচীতে যোগ দিতে হবে, তবে নিজস্ব দলীয় কর্মসূচিকে বন্ধ রাখা চলবে না। সবার সাধারণ (common) লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ

www.pathagar.com

করতে হবে ঠিকই, তবে তার মধ্য দিয়ে নিজের দলীয় লক্ষ্যের পাল্লা ভারী করার চেষ্টা করতে হবে। জোটের শক্তিকে কৌশলে নিজের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। সফলতার পর (যেমন নির্বাচনে সফলতা, সরকার গঠনে সফলতা, বা গণজাগরণ সৃষ্টির সফলতা) জোটের সার্বিক সফলতার প্রাসঙ্গিক অংশটুকুতে দলীয় কার্যক্রমের কৃতিত্ব আরোপ ক'রে জনগণের সামনে উক্ত জোটের সফলতায় নিজের দলের ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ, চলতে হবে এক সাথে, এক-যোগে, তবে নিজের পায়ে ভর ক'রে। ভিড়ের মধ্যেও নিজেকে স্পষ্ট ক'রে তুলতে হবে। সুতরাং, এক অর্থে, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে চুক্তি মানে এক ধারায় মিশে যাওয়ার জন্য একমত হওয়া নয়, একই লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তিতে পৃথকভাবে চলার জন্য একমত হওয়া (agree to differ)। অন্য কথায়, বন্ধু হবার জন্য চুক্তি নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে থাকার সাথে সাথে শত্রুতার দূরত্ব নিয়ে থাকার ঐকমত্য অর্জনের চুক্তি।

www.pathagar.com

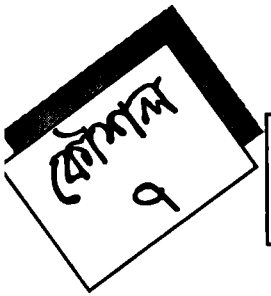

বদনাম এড়ানোর উপায়

বদনাম এড়াবার সবচেয়ে সহজ উপায় হল দোষ না করা—এ হল মহৎ ব্যক্তিদের উপদেশ। কিন্তু innocence is no protection—সরলতা কোনো আত্মরক্ষার কৌশল নয়। দোষ না করেও দোষের বোঝা অনেক সময় বইতে হয়। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একথা সত্য। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবার প্রবণতা নেতৃত্বের ভূবনে চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে। সুতরাং নাম থাকলেই বদনাম থাকবে। মহৎ ব্যক্তিদের কথা মতো বদনাম থেকে দূরে থাকতে হলে নামকে মুছে ফেলা ছাড়া কোনো পথ থাকে না। কিন্তু নাম মুছলেই তো নেতৃত্ব শেষ।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বরং উল্টোটাই সত্য : বদনামকে এড়িয়ে নয়, তাকে কৌশলে ম্যানেজ করার মাধ্যমেই নামকে ঘষে মেজে উজ্জ্বল করতে হবে। দোষ আপনি না করলেও যে-ব্যক্তি দোষ করবে হয়তো সে তা আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিবে, কিংবা অন্য কেউ তা সুযোগ বুঝে আপনার উপর আরোপ করবে।

বদনামের কাদা ছোড়াছুড়িও রীতিমত নেতৃত্বের একটি কৌশল। সুতরাং সবাই সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানে হোক তা প্রয়োগ করবেই। তার ফল কী দাঁড়াবে? যে-দোষ আপনার নয়, তার বোঝাও আপনাকে বইতে হতে পারে। অতএব, আপনাকে কৌশলের দিক থেকে এমনভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন আপনি নিজের ঘাড় ভাঙার আগে দোষ যার বোঝাটিও তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হন।

আবারও বলি : কাজ থাকলে ত্রুটি থাকতেই পারে। কাজের ভূবনে বসবাস করলে নিজের বা অপরের ত্রুটির মুখোমুখি হতেই হবে। নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে কাজের ভূবন। তাই এখানে ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বাভাবিক। তবে **ত্রুটির পানি যেন দোষের সমুদ্রে** না গড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই। আগুন থাকলে ধোঁয়া থাকবেই। প্রতিপক্ষ জনগণকে শুধু আপনার ধোঁয়ার কুণ্ডলীটির দিকে আকৃষ্ট করতে চাইবে। তখন বিমূঢ় হলে চলবে না। জনগণের জন্য যে আপনি আগুন জ্বেলেছেন, তা প্রমাণ করতে পারলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করা যাবে। তখন থেকে জনগণ বুঝতে শুরু করবে, ধোঁয়ার উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে আগুন জ্বালানো হয়েছে।

www.pathagar.com

নেতৃত্বের খেলাটি দর্শক-নির্ভর খেলা। অর্থাৎ এ খেলার মূল উদ্দেশ্য দর্শকের মনোরঞ্জন করা, গোলের সংখ্যা বাড়ানো নয়। ফলে অনেক খেলোয়াড় (অর্থাৎ নেতা) বল নিয়ে খেলার চেয়ে প্লেয়ার নিয়ে খেলা বেশি পছন্দ করে। আর তখনই শুরু হয় কাদা ছোড়াছুড়ি। সবচেয়ে ভালো হয় যদি গোটা দর্শকমণ্ডলী (অর্থাৎ জনগণ)কে নিয়েই খেলা যায়। পুরো গ্যালারিটাকেই খেলার মাঠে রূপান্তরিত করতে পারলে সে খেলায় জয়-পরাজয়ের চেয়ে প্রতিযোগিতাই মূল উপজীব্য হয়ে উঠবে। কিন্তু এ খেলা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ সুযোগ খুব কমই আসে। একথা সবারই জানা যে, কেবল সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল খেলাতেই দর্শকরা খেলোয়াড়দের চেয়েও বেশি আনন্দ পায়। সুতরাং খেলা ষোল আনা জমিয়ে তুলতে গেলে সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এবং এও সত্য যে কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তীর্ণ হতে গেলে নামটিকে ঝকঝকে রাখা চাই। অতএব নেমপ্লেটের উপর থেকে বদনামের মরিচাকে ঘষে-মেজে তুলে ফেলতে হবে।

প্রথমে দেখা যাক কত উপায়ে কারো উপর বদনামের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, অপরের ঘাড়ে দোষ চাপানোর সম্ভাব্য সব ধরনের উপায়ই নেতৃত্বের খেলায় প্রচলিত আছে। এগুলো হল :

- নিজে কোনো দোষ ক'রে ফেললে, এবং তার কারণ চাপা থেকে ফল প্রকাশিত হয়ে পড়লে, তার দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো;
- অন্যের ঘাড়ে চাপানোর উদ্দেশ্যে অলক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে এরূপ দোষ করা, এবং পরে তার ভার অন্যের ঘাড়ে চাপানো;
- তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা অবস্থা দ্বারা সৃষ্ট দোষ কারো ঘাড়ে চাপানো;
- কারো ঘাড়ে চাপানোর সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে কোনো দোষ করার সুযোগ দেয়া বা তা করার ক্ষেত্রে তাকে মৌন সম্মতি দেয়া;
- যার দোষ তার ঘাড়ে চাপানো;
- বিতর্কিত গুণকেও পরিকল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারা দোষ ব'লে ঘোষণা করা;
- ছোট-খাট উপেক্ষণীয় দোষ-ত্রুটিকেও কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে জনগণকে শোনানো;

www.pathagar.com

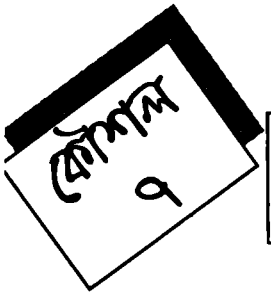

কৌশল ৭

সন্ত্রাস দ্বারা পরিচিতি লাভ (Getting known by terror)

একটি ঘৃণ্য কৌশল, সন্দেহ নেই। তবুও সারাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভূঁইফোড় কিছু কিছু নেতারা এটিকে নির্দ্বিধায় প্রয়োগ ক'রে থাকে। এর সার্থকতা মূলত দেশের আইন-ব্যবস্থা এবং আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষমতা, ইচ্ছা, তৎপরতার উপর নির্ভর করে। এর দ্বারা জনগণের সমর্থন পাওয়া যায় খুবই কম, তবে জনমনে ভীতির সঞ্চার ক'রে তাদের বাকশক্তি থামিয়ে দিয়ে কিছু কালের জন্য প্রভাব অর্জন করা যায়। মজার ব্যাপার হল, কৌশলটিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ হয়ই—কম হোক আর বেশি হোক। এ কৃতিত্ব তাই ব'লে কিন্তু আদৌ কৌশলটির বা নেতার নিজের নয়, তা এ দেশের আইনের অক্ষমতারই "কৃতিত্ব"। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য রীতিমত আশানুরূপ ফলও কেউ কেউ পেয়ে থাকেন। তা অবশ্য নেতারই কৃতিত্ব। একমাত্র যাদের উদ্দেশ্য থাকে সত্যিকার অর্থে জনগণেরই প্রতিনিধিত্ব করা, তারাই দূর ভবিষ্যতে এই ঘৃণ্য কৌশলের গ্লানি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন।

এই কৌশলের একটি রূপ হল নিজের লোকেদেরকে দুই ভাগে ভাগ ক'রে প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের মধ্যে বোমাবাজি, গোলাগুলি বা অন্যরূপ কাঁদা ছোড়াছুড়ি ইত্যাদি লাগিয়ে দেয়া। ব্যাপারটি আগাগোড়া সাজানোও হতে পারে, আবার কখনো কখনো তার মধ্যে কিছুটা বাস্তব বিরোধের গন্ধও থাকতে পারে। ব্যাপারটি কতকটা সিনেমার নাটকীয় কৌশলের মত : ঠিক যেন নায়িকার মন পাবার জন্য বা কৃতজ্ঞতা ভাজন হওয়ার জন্য নায়ক তার পেছনে কয়েকজন গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে পরে নিজের কৃত্রিম বীরত্ব দিয়ে তাকে রক্ষা করলো। এরূপ দাঙ্গা মিটমাট করতে অবশেষে নেতা তার "নিজস্ব" গ্রুপ নিয়ে ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেন। তিনি সফলও হন। হবারই তো কথা!

অবশ্য যখন ব্যাপারটা সাজানো হয় না, তখন ক্ষমতার লড়াইটা প্রায়ই খুন-জখমে পরিণতি লাভ করে। এরূপ বিবদমান গ্রুপের মধ্যে পরে কোনো মিটমাট হতেও পারে, না-ও হতে পারে। তবে সচরাচর কোনো পক্ষই তাদের মধ্যকার বিবাদ সমূলে বিনাশ করতে চায় না ব'লেই মনে হয়। কারণ দ্বন্দ্ব পুরোপুরি শেষ হয়ে গেলে খেলাই তো শেষ। আর নেতৃত্ব তো দ্বন্দ্বেরই খেলা।

www.pathagar.com

এইরূপ ক্ষমতার লড়াই গ্রামাঞ্চলের গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের, পাড়ার সাথে পাড়ার, এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলে দলের সাথে দলের, শহরে মহল্লার সাথে মহল্লার—ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘটিত হতে দেখা যায়।

ব্যাপারটি যতদূর পর্যন্ত সাজানো, ততদূর পর্যন্ত তার রূপভেদ অনেক রকমের। সেসব আলোচনা এখানে নিষ্প্রোয়োজন।

একটি জিনিস লক্ষ্য করার মত : এই ঘটনা লোকাল পর্যায়ে প্রায়ই উদীয়মান নেতা এবং আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত নেতার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় সংঘটিত হয়। সেক্ষেত্রে এর সাথে রাজনৈতিক ইস্যুর চেয়ে জমি-জমা, মৎস চাষ, ধান-কাটা, খাস-জমি, ইজারা গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কিত কারণই বেশি জড়িত থাকে।

কিন্তু এই ঘটনা যখন আরেকটু ব্যাপক পরিসরে ঘটে, তখন তার সাথে নেতৃত্ব এবং রাজনীতির কারণই বেশি ক্রিয়াশীল থাকে।

অবশ্য লোকাল পর্যায়ের জয়-পরাজয় অনেক সময় বৃহত্তর রাজনৈতিক ইঙ্গিতে বা হস্তক্ষেপে একচেটিয়াভাবে নির্ধারিত হয়। কখনো আবার এরূপ ঘটনায় যে-ব্যক্তি জয়ী হন, তিনিই পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের মদদ প্রাপ্ত হন। আর এভাবেই নোতুন নেতার উদয় হয়, নেতৃত্ব বদল হয়।

এরূপ ঘটনা অঞ্চল বিশেষে কম বা বেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে একটি আশ্বাসবাণী পাওয়া যায় (হিংস্র নেতাদের জন্য তা অবশ্য নিরাশ্বাস বাণীও হতে পারে) : দীর্ঘ মেয়াদে এরূপ দাঙ্গা স্বল্প পরিসরের মধ্যে প্রায়ই টেকে না। দুই বিবদমান গ্রুপের মধ্যে স্থানগত দূরত্ব যত কম, তাদের মধ্যে এরূপ দাঙ্গা বারবার সংঘটিত হবার সম্ভাবনাও তত কম। এ কারণে শত উস্কানিতেও এরূপ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ছোট একটি জায়গার মধ্যে বেশিদিন স্থায়ী হয় না। আর যাই হোক, সাধারণ জনগণ তো শান্তিই চায়।

এ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ মেয়াদে (long term-এ) একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে (যেমন গ্রামে) জয়-পরাজয়ের খেলায় বড়জোর দুইটি গ্রুপই টিকে থাকে। আর তারাই মূলত ঐ অঞ্চলে বৃহত্তর কোনো (দুটি) রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করে।

সম্ভবত স্থানীয় প্রভাবশালী এসব নেতারা জানেন যে তাদের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে সফল ক'রে তুলতে হলে তাদেরকে কিছুটা দূরের শত্রুকে বেছে নিতে হবে। এ কারণে তারা সচরাচর নিজের পুকুরের পানি ঘোলা করতে চান না। যদিও তারা তাদের সুবিধার জন্যই এক পাড়া বা মহল্লার সাথে আরেকটি পাড়া বা মহল্লার মারমুখী সেন্টিমেন্টকে জিইয়ে রাখতে চান।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ মূলত জাতীয় পর্যায়ে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার, এবং গ্রাম বা মহল্লা পর্যায়ে একটি নেতৃত্বের হাতিয়ার। তবে এটি কিন্তু পলিটিক্সের আদৌ কোনো ভিত্তিপ্রস্তর নয়। যারা শুধু প্রভাব অর্জনের

www.pathagar.com

জন্যই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায় এবং সেই প্রভাবকে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে লাগায়, তারা দীর্ঘমেয়াদে নেতা হিসেবে টিকে থাকতে পারে না। তাদেরকে হয় কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি ক'রে কিছুকাল টিকে থেকে নিজের আখের গুছিয়ে পরে কৌশল বদলাতে হয়, কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের ভাড়াটে গুণ্ডা (যা বাংলাদেশে আছে বৈ কি!) হিসেবে অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়। অনিশ্চয়তা এ কারণে যে, সঙ্গত কারণেই প্রতিটি রাজনৈতিক দল একই ক্যাডারকে বহুদিন ধ'রে রাখে না, বা রাখতে পারেও না। অন্যদিকে সন্ত্রাস আর গণ-আন্দোলনকে এক ভাবলেও মহা ভুল হবে। গণ-আন্দোলন সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতার যে প্রদর্শনী সৃষ্টি করে, তা ঐ দলের জন্য একটি প্লাস পয়েন্ট। রাজনীতিতে স্বয়ং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যেখানে জড়িত, সেখানে এমনকি রক্তপাতও একটি অনুকূল ইতিহাস। আর যাই হোক, সামগ্রিকভাবে জনগণ কখনো ভুল করে না।

www.pathagar.com

ছোট পুকুরে বড় মাছ
(A big fish in a small pond)

কথায় বলে, ছোট পুকুরে বড় মাছ হবার চেয়ে বড় পুকুরে ছোট মাছ হওয়া ভাল। সত্য। চাকরির ক্ষেত্রে ছোট কোম্পানিতে বড় পদের চেয়ে বড় কোম্পানিতে ছোট পদ অনেকের কাছেই বেশি পছন্দনীয়। অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রেও তাই।

ল্যাংড়া তার অকেজো পায়ের বদলে যে লাঠিটা চায়, তা তার পায়ের চেয়ে বড় হওয়া চাই। মানুষ নিজে যতটুকুই হোক, সাপোর্ট চায় বড় রকমের। কালো ছেলে সুন্দরী মেয়ে ছাড়া বিয়েই করবে না। আর সুন্দরী মেয়ে কোটিপতি পাত্র ছাড়া কল্পনাই করতে পারে না। ভাগ্যিস ইদানিং মধ্যবিত্ত সুন্দরী মেয়েদের সংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে কোটিপতি কালো ছেলেদের সংখ্যাও বাড়ছে!

বড়র সাথে যোগ দিতে পারলে তো সোনায় সোহাগা। সবাই তো তাই-ই চায়। কিন্তু বড়র সাথে যোগ দেয়া যদি সহজই হতো, তাহলে তো আর এত পরিশ্রম, এত কৌশল, এত বিচক্ষণতার কোনো দরকার হত না। ছোটর কি তাহলে কোনই স্থান নেই?

আছে। Small is out—কথাটি সত্য। সত্য যে, বড়র মধ্যে ছোটর স্থান নেই বললেই চলে; তবে এটাও সত্য যে, ছোটর মধ্যে ছোটরই অগ্রাধিকার। যারা প্রথম নেতা হতে চান, তাদের জন্য এটি একটি আশার কথা বটে।

যে-ঘটি তাল পুকুরের মধ্যে ডোবে না, ঐ ঘটিকে আপনার ভয় পাবার তেমন কোনো দরকার নেই। কারণ, আপনার তালপুকুরটি শুকিয়ে ফেলবার বা তা থেকে এক বিন্দু পানি ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা ঐ ঘটির নেই। আপনার ছোট্ট বাটিটি দিয়ে পুরো তালপুকুরের পানিটুকু আপনি একাই মনের আনন্দে বসে ভোগ করতে পারবেন।

নেতৃত্বের ব্যাপারটি কতকটা এ ধরনের। লোকাল পর্যায়ে সব সময়ই ছোট নেতাদের জন্য জায়গা রয়েই যায়। বড় নেতারা বেশি মাত্রায় বড় বলেই এসব স্থানে তেমন সুবিধা করতে পারেন না। এসব মাঠ-পর্যায়ের নেতৃত্বে বড়দের খবরদারি চলে একমাত্র স্থানীয়ভাবে যে বড় (অর্থাৎ সার্বিক বিচারে যে ছোট) তার মাধ্যমেই।

সুতরাং "বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে"। ছোট পুকুরে বড় মাছ হওয়াতেই মূলত লাভ বেশি। কারণ তা হওয়া যেমন সহজ, তেমনি একবার তা হতে পারলে বড়

www.pathagar.com

পুকুরে (বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনে) প্রবেশ করাও তেমন কোনো সমস্যা নয়। আপনার অঞ্চলে বড় কোনো নেতা যদি প্রভাব বিস্তার করতে চান, তাহলে আপনাকেই তার দরকার হবে।

সুতরাং কৌশলে আপনাকে এইভাবে ধাপে ধাপে এগুতে হবে :

— এখন —	: ছোট পুকুরে ছোট মাছ।
— নেতা হতে গেলে —	: ছোট পুকুরে বড় মাছ।
— নেতৃত্ব ধ'রে রাখতে হলে —	: বড় পুকুরে ছোট মাছ।
— যোগ্যতা থাকলে —	: বড় পুকুরে মাঝারি গোছের বা বড় আকারের মাছ।

শেষ ধাপে অবশ্য অন্য পুকুরের মাছও আপনাকে আর খেতে পারবে না। তবে আপনারই পুকুরের অন্যান্য ছোট মাছের প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে, যেন তারা দল ধ'রে অন্য পুকুরে চলে গিয়ে আপনাকে একা বানিয়ে না যায়। একা হওয়াই ছোট হওয়া। মনে রাখতে হবে, আমরা ততক্ষণই বড়, যতক্ষণ ছোট অন্য কারো সাথে নিজেদেরকে তুলনা করি। তুলনা করার কেউ না থাকলে একা একা বড় হওয়া যায় না। তাছাড়া বড়ত্বটা আসল কথা নয়; আসল কথা হল কার তুলনায় কত বড়।

সুতরাং রাজনীতির বড় অঙ্গনে স্থান পাবার জন্য আপনাকে ক্ষুদ্র পরিসরে গলিনীতি অনুসরণ করতে হবে। গলি থেকে রাজপথে আসা ছাড়া রাজনৈতিক বা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বে অন্য কোনো বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

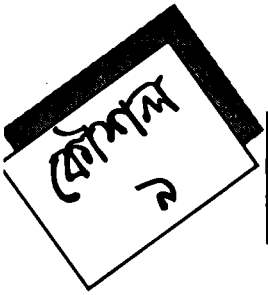

নোতুন বোতলে পুরনো মদ
(Old wine in new bottle)

এই কৌশলটি অত্যন্ত কার্যকর, সুন্দর, এবং খুব স্পষ্ট। সারা বিশ্বের সব দেশে সব প্রতিষ্ঠানে এবং সমাজ ব্যবস্থায় এটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

যারা প্রভাবশালী থেকে ক্ষমতাবান হবার পথে সবেমাত্র পথিক, তাদের জন্য মূলত এই কৌশলটি নয়। এটি তাদের জন্য যারা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বে সবেমাত্র অন্য কারো স্থলে অভিষিক্ত হয়েছেন। কৌশলটিকে এই অধ্যায়ে ফেলার কারণ হল সবেমাত্র দায়িত্ব গ্রহণকারী প্রত্যেক নেতাই ঐ ভূবনে বা ঐ কর্মকাণ্ডে প্রথম। সুতরাং তাকে শুধু দায়িত্ব গ্রহণ করলেই হবে না, তাকে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাতেও হবে : আমি এসেছি।

আপনি যখন এভাবে কোনো নোতুন ক্ষমতায় "আসবেন", তখন আপনার এই আগমন জনগণকে শুধু দেখালেই হবে না, অনুভবও করাতে হবে। অর্থাৎ আপনি যে এলেন, সবাই যেন তা দেখতে পায়, তার শব্দ শুনতে পায়, তার গন্ধ পায়। সাড়া জাগিয়ে আসার দরকার। এসেও সাড়া জাগানোর দরকার।

কিন্তু কিভাবে? খুব সহজ। যা যা আপনার পূর্ববর্তী নেতার আমলে বহাল ছিল সেগুলোর মধ্যে কিছু-কিছুর রং পাল্টাতে হবে, আকৃতি পাল্টাতে হবে, জায়গা পাল্টাতে হবে।

আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারটিই ধরুন। নোতুন সরকার ক্ষমতায় এলে দিব্যি টাকার চেহারা বদলায়, পয়সা নোতুন কায়দায় চকচকিয়ে ওঠে, রোড পার্ক সহ বিভিন্ন স্থানের নাম বদলে যায়, আমলাদের স্থান বদলে যায়, প্রচার মাধ্যমের অনুষ্ঠানাদিতে ব্যাপক রদবদল হয়, ডাকটিকিটের জন্ম হয়, এবং আরো কত কি। এ ধরনের রদবদলের মূল উদ্দেশ্য প্রশাসনিক কাঠামোকে ঢেলে সাজানো নয়, নোতুন নেতা এবং নীতির আগমনকে জনগণের সামনে স্পষ্ট ক'রে তোলা। এসব জিনিসের মাধ্যমেই জনগণ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে, ঐ নোতুন কেউ এসেছে :

আমি খুব কম প্রতিষ্ঠানই দেখেছি যেখানে নোতুন নেতা এলে অফিস রুমের সাজ-সজ্জা, চেয়ার-টেবিলের জায়গা, এবং পূর্বতন কর্মচারী কর্মকর্তাদের বসার জায়গা এবং দায়িত্ব বদল হয় না। এসব বাহ্যিক প্রতীকী রদবদলের প্রয়োজন আছে। মন বদলালে আমরা যেমন বাহ্যিক অবকাঠামো বা আচার-ব্যবহার বদলানোর তাগিদ অনুভব করি, তেমনি বাহ্যিক অবকাঠামো বা আচার-ব্যবহার বদলে ফেললেও আমাদের মন

www.pathagar.com

পরিবর্তনের প্রতি সায় দেয়। অর্থাৎ আমরা যা ভাবি, তা যেমন আমাদের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি আমরা যা করি, তাও আমাদের ভাবনাকে অনেকাংশে নির্ধারণ করে। সুতরাং এসব আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন আছে বৈকি।

এই পরিবর্তন উক্ত বিষয়গুলোর বাইরেও চলতে পারে। চিঠির প্যাডের ডিজাইন এবং রং, চিঠি লেখার নোতুন ফরম্যাট, নোতুন স্লোগান, নোতুন পোশাক বা টুপি বা ব্যাজ বা জুতো, নোতুন পদ সৃষ্টি, নোতুন ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পুরোপুরি নোতুন কিছু করা এ কৌশলের আওতায় পড়ে না। যা করতে হবে তা হয় আগের মত, না হয় আগের চেয়ে বেশি সুবিধাজনক হওয়া চাই। মনে রাখা দরকার, মানুষ পরিবর্তনকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। আমূল পরিবর্তন মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কেননা, তখন সবাই-ই নিজ নিজ পদ, অবস্থান, বা ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। একমাত্র বিপ্লবধর্মী কর্মকাণ্ড ছাড়া অন্য কোথাও হুট ক'রে ব্যাপক রদবদল মানায় না। কাজেই এমন কোনো পরিবর্তন আনা উচিত নয় যা সংশ্লিষ্ট সবাইকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলবে। নিজের লোকেরা যখন ভীত হয়ে ওঠে, তখন শুরু হয় চক্রান্ত, ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্ব, বাইরের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি। সুতরাং নোতুন কিছু করার আগে "নোতুন বোতলে পুরনো মদ" উপহার দিয়ে পরিবর্তনের প্রতি সবাইকে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হবে।

অবশেষে কিছু কিছু নোতুন কাজ করতেই হবে, আগের ব্যবস্থা ঠিক রেখে, না হয় আগের ব্যবস্থার কিছুটা রদবদল ক'রে। **নোতুন নেতা, নোতুন নীতি**—এটি একটি আবশ্যকীয় কৌশল। পার্টির নীতিতে অটল থেকেও "কৌশলের নীতির" পরিবর্তন করে নোতুনত্বের গন্ধ ছড়ানো সম্ভব। নিজে নিজে ভেবেই অনেক উপায় বের করতে পারবেন। তবে ব্যস্ত হবেন না। ধীরে ধীরে ব্যস্ত হতে হবে।

www.pathagar.com

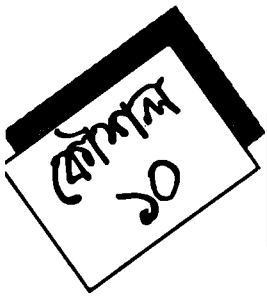

ইস্যু শিকার (Issue hunting)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক তথা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বে যারা রয়েছেন তাদের অনেকেই যে ইস্যু শিকারী একথা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এ দেশের রাজনীতি-মনা যেকোনো সচেতন নাগরিকই ইস্যুর রাজনীতির ধারণাটির সাথে কম-বেশি পরিচিত। সুতরাং এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলা নিষ্প্রোয়জন।

তবুও আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরেই এ প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলতেই হবে।

প্রথমতই মনে রাখা দরকার শূন্যতা অন্বেষণ (looking for a power vacuum, কৌশল-১ দ্রষ্টব্য) আর ইস্যু সন্ধান এক কথা নয়। ইস্যুর রাজনীতির মূল লক্ষ্যই হল বিশেষত ক্ষমতাসীন সরকারী দলের দেশ-পরিচালনা সম্বন্ধীয় বা ব্যক্তিগত (অর্থাৎ দলগত) কোনো সিদ্ধান্তের বা আচরণের সম্ভাব্য ক্ষতিকর এক বা একাধিক দিক নিয়ে সমালোচনা করা এবং তার বিরোধিতা করা। বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, অন্য দেশের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে মালামাল আদান-প্রদানের চুক্তি, বাজেট, সরকারী বা বিরোধী কোনো দলের দ্বারা দেশের কোনো অঞ্চলে সৃষ্ট "অরাজকতা" (অন্যদের ভাষায়), কোনো বিখ্যাত বা কুখ্যাত ব্যক্তির বিতর্কিত (ধর্ম-বিষয়ক বা রাষ্ট্রবিষয়ক) মত প্রদান, দেশের মধ্যে জাতীয়তা বিষয়ে বিতর্কিত কোনো নেতার অবস্থান, সন্ত্রাস দমন আইন (যা দ্বারা প্রায়ই বিরোধী দলের "মজলুম" নেতাদেরকেই দমন করা হয় ব'লে বিরোধী দলের অভিযোগ)—ইত্যাদি বিষয়ে বিরোধী বা ক্ষমতাসীন দল বিক্ষোভ প্রদর্শনসহ গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য যেসব প্রচার-প্রচারণা এবং কার্যক্রম পরিচালনা ক'রে থাকে, সেগুলো মূলত ইস্যু পরিচালনা। কিন্তু "ইস্যুর রাজনীতি" বলতে বর্তমানে যা বুঝায়, তা হল মাঝে মাঝে গণ-মুভমেন্টকে চাঙ্গা ক'রে তোলার জন্য একটু "বেশিমাত্রায়" তৎপর হয়ে ইস্যু খোঁজা।

ইস্যু শিকারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সক্রিয় বিরোধী দল থাকাই রাষ্ট্রপরিচালনার সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। তবে অহেতুক হয়রানি সৃষ্টি করার জন্য পরিচালিত ইস্যুর রাজনীতি সার্বিকভাবে গোটা দেশেরই ক্ষতি করে।

www.pathagar.com

যাহোক, নোতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে সামনে রেখে অনেক সময় নোতুন নেতার আবির্ভাব হয়, পুরনো নেতৃত্বের শক্তি বৃদ্ধি হয় বা কমে।

আঞ্চলিক পর্যায়ের নেতারা সচরাচর কেন্দ্রীয় নেতাদের কার্যক্রমই সম্প্রসারণ করেন; তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা সরকারী সিদ্ধান্ত বা অসিদ্ধান্ত বা প্রতিশ্রুতির খেলাপ স্থানীয়ভাবে জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থের সাথে জড়িত থাকে, সেখানে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি সামনে এগিয়ে এসে নেতৃত্বের খেলায় কিছু পয়েন্ট কামিয়ে নিতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট নেতার অবস্থান দৃঢ়তর হয় এবং তার প্রভাব-বলয়ের পরিধি বৃদ্ধি পায়। এই ফলশ্রুতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নোতুন নেতার জন্ম না দিলেও এর দ্বারা কোনো নেতার নেতৃত্বে নোতুন মাত্রা যোগ হয়।

ইস্যুর রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় কথা হল যথাসময়ে ইস্যুটিকে ধরা। ইস্যু তার পরিপূর্ণ চরিত্র পাওয়ার আগে তাকে আঘাত করলে উল্টো ফলই হতে পারে। কারণ, তখন সরকার পক্ষ আপনার প্রতিক্রিয়া বুঝে ফেলে ঘটনার মোড় ঠিক উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবেন। আবার বাসি ইস্যু নিয়ে কামড়া-কামড়ি করলে আপনার পক্ষের জনগণই আপনার দুর্বলতাকে বুঝে ফেলবে। তাতেও ফল হবে উল্টো। ব্যাপারটি কতকটা গোয়েন্দা বাহিনীর আসামী ধরার মত। কোনো লোককে আসামী জেনেও প্রমাণ ছাড়া ধরা যায় না, আবার লোকটি নাগালের বাইরে চলে গেলে তখন আর প্রমাণেও কাজ হয় না। এ জন্য দরকার হল আসামীর মত ইস্যুকেও একেবারে হাতে-নাতে ধরা।

ইস্যুর রাজনীতি আমাদের দেশে নিত্যদিনের ঘটনা হলেও অধিকাংশ নেতাই এক্ষেত্রে অবিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। প্রথম অবিচক্ষণতা হল তাদের মশা মারতে কামান দাগার স্বভাব। সামান্য ইস্যু নিয়ে তারা অনেক সময় একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেন। কোনো ইস্যুকে অবলম্বন ক'রে ততদূর যাওয়া উচিত যতদূর জনগণ তা নিয়ে স্বেচ্ছায় যেতে চায়। দলীয় অন্যান্য নেতাদের ইচ্ছার চেয়ে এক্ষেত্রে জনতার ইচ্ছাকে বেশি মূল্য দেয়া উচিত। ইস্যুর ব্যাপারে অসংযম জনমনে বিরক্তির সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয় অবিচক্ষণতা হল ইস্যুর শিকড়ে যে-জনগণ পানি ঢালে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ফল সে-জনগণকে দেয়া হয় না। নেতারা ইস্যুটিকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির কাজেই লাগায়।

প্রতিশ্রুতিশীল ইস্যু যেহেতু সব সময় আসে না, সেহেতু একটি ইস্যুর সার্থক পরিচালনা থেকে লব্ধ জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব থাকতে থাকতে অন্য কোনো ইস্যু ধ'রে বা অন্য কোনো উপায়ে (যেমন ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, ইত্যাদি; পরে আলোচ্য) নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে পারলে টিকে থাকা যায়।

বর্তমানে আঞ্চলিক পর্যায়ে খাস জমি (হঠাৎ ক'রে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদী শুকিয়ে যাবার ও তার গতি পরিবর্তনের কারণে প্রচুর খাস জমির সৃষ্টি হয়েছে ব'লে), চিংড়ি চাষ

www.pathagar.com

(প্রভাবশালী চিংড়ি চাষীদের দ্বারা গ্রামবাসীদের নির্যাতন শোষণ ইত্যাদি কারণে), চর দখল (ধানের জমি বা উক্ত জমির ফসল) ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে প্রতি মুহূর্তেই অসংখ্য অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে এবং সেসব ঘটনাকে (বা ইস্যুকে) অবলম্বন ক'রে নোতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হচ্ছে বা নেতৃত্বের পালাবদল হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য নেতৃত্বের প্রাথমিক এবং প্রধান হাতিয়ার হল পেশীশক্তি এবং টাকার দৌরাত্ব। অন্তত এসব ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত, যেহেতু এগুলোর মধ্য থেকে কোনো প্রতিশ্রুতিশীল নেতৃত্বের অভ্যুদয় বলতে গেলে অসম্ভব।

www.pathagar.com

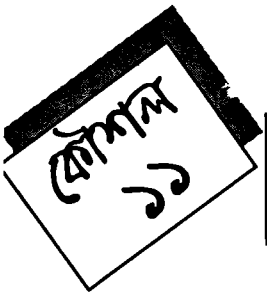

জনহিতকর কাজ (Benevolent activities)

যে-কাজে সমাজের সকলের মঙ্গল হয়, তা ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা তাড়িত হয়ে বা না হয়েও করা যেতে পারে। নিছক মাহাত্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যে এমন কাজ কেউ করেন না তা নয়। তবে এসব ক্ষেত্রে বড় কথা হল মাহাত্মটুকু, যার পরিণাম পরিচিতি, প্রভাব, এবং জনগণের ভালোবাসা।

ধর্মে এমনভাবে দিতে বলা হয়েছে যেন ডান হাত যখন দেয়, তখন বাম হাত যেন টের না পায়। কিন্তু প্রকাশ্যে দেয়াকে অপরাধ ব'লে অবশ্যই চিহ্নিত করা হয়নি। বিশেষ ক'রে পারস্পরিক "দেবে আর নেবের" সামাজিক অভ্যাসটি গড়ে তুলতে হলে কিংবা ভালো কাজে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করতে হলে, জনহিতকর কাজের প্রদর্শনীও মাঝে মাঝে দরকার। এ কারণে প্রত্যেক সমাজে এ রীতি প্রচলিত আছেও।

এই উপায়ে যে-সব ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে এবং প্রতিবেশিদের সহায়তায় গাছ লাগানো, ধূমপান প্রতিরোধ আন্দোলন, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অরাজনৈতিক চরিত্রের প্রভাব বা ক্ষমতা অর্জন ক'রে থাকেন। অনেকে এই প্রভাবকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন, অনেকে করেন না।

আমাদের দেশে অনেক নেতাই নিজের প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য হোক আর জনগণের মঙ্গলের জন্যই হোক, এরূপ সামাজিক দায়িত্ব পালন ক'রে থাকেন। যারা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বে (যেমন সরকারী দলে, সরকারী চাকরিতে, বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে) থাকেন, তাদেরকে উদাহরণ সৃষ্টি করার জন্য বা প্রতীকী কায়দায় এরূপ কাজ করতে হয়। গ্রামাঞ্চলে এরূপ কাজ যারা ক'রে থাকেন, তারা জনগণের বিশেষ ভালোবাসা পেয়ে থাকেন।

বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি, গ্রামাঞ্চলের সম্পদশালী অনেক ব্যক্তি যারা জনগণের সন্তুষ্টির জন্য নিজের সম্পদ বা উপার্জন থেকে কিংবা অনেকের মধ্য থেকে সংগ্রহ ক'রে মসজিদ মন্দির ক্লাব নির্মাণ টুর্নামেন্টের আয়োজন ইত্যাদি ক'রে থাকেন, তারা সে অঞ্চলের অনেক লোকের শ্রদ্ধাভাজন হন। বলা বাহুল্য, অনেকেই প্রভাব অর্জন করার জন্যই তা করেন, এবং তারা তাদের চেয়ে বেশি সার্থকতা অর্জন করেন যারা তা করেন

www.pathagar.com

না। যদিও নির্বাচনের আগে এসব কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেয়া আইনে নিষিদ্ধ, তবুও এসব কাজ ক'রে তার দোহাই না দিয়ে পরবর্তীতে ভোট চাওয়া নিশ্চয়ই একটি স্বাভাবিক আইনসিদ্ধ কাজ। এ কারণে অনেককে এরূপ কাজ করতে দেখা যায়।

আমাদের দেশে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের হিড়িক পড়ে বন্যার এবং টর্নেডো-ঘূর্ণিঝড়ের সময়। অবস্থা গতিক দেখে মনে হয়, অনেকেই দুর্গতদের সাহায্য করতে যায় না, যায় নিজেদের পরোপকারিতার এবং অঙ্গীকারের আলামত দেখাবার জন্য। তাও যারা দুর্গত তাদেরকে দেখাবার জন্য নয়—তারা তো তাদের আসল চেহারাই দেখে ফেলে—বরং ঐ মুহূর্তে সারাদেশের যেসব মানুষ দূরে বসে উক্ত দুর্দশার দর্শক, তাদেরকে দেখানোর জন্য। ভালো কাজে প্রতিযোগিতা যত হবে তত মঙ্গল, তবে কাজের ছুতোয় আত্মজাহির আদৌ ভালো কাজ কি-না সেটা ভেবে দেখা দরকার।

যাহোক, একথা সন্দেহাতীত যে জনকল্যাণমূলক কাজ করার সাথে নেতৃত্বের অন্যান্য প্রচার-প্রচারণা এবং কৌশল প্রয়োগ করলে সবচেয়ে বেশি কাজ হয়। সুতরাং যারা নেতা হবার প্রথম ধাপে আছেন, তাদের জন্য এটি একটি উপযুক্ত পদক্ষেপ।

তবে একটু স্বার্থপর হতে হবে। ভালো কাজ ভালোভাবে করতে হবে বটে, তবে করার পর নিজের ঢাকটি অন্যকে দিয়ে বাজাতেও হবে (৪ নং কৌশল দেখুন)।

একথা ঠিক যে, সেই উপকারই মানুষ সবচেয়ে মনে রাখে এবং বেশি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে, যা ঠিক তার প্রয়োজনের সময়েই তাকে দেয়া হয়। এজন্য সচরাচর আমরা কাউকে কিছু দিই একমাত্র তখনই যখন সে তা চায়। এটাও রাজনীতি। তবে দেবার ক্ষমতার যার আছে, তার নিজস্ব একটি দায়িত্বও রয়ে যায় সাধ্যমত উদারভাবে দেবার। আমাদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু গাছ লাগাতে হবে যার নিচে আমরা বসব না, কিছু না কিছু ফুল ফুটাতে হবে যার ঘ্রাণ আমরা উপভোগ করব না। সমাজ থেকে, দেশ থেকে, পৃথিবী থেকে প্রতি মুহূর্তে আমরা অনেক কিছু নিচ্ছি, অনেক নিয়েছি, আরো কত নিতে হবে আমরা জানি না। সুতরাং নিঃস্বার্থ হয়ে এ দেশটাকে, এ সমাজকে এ পৃথিবীটাকে কিছু দেয়া আমাদের দায়িত্ব।

"দিতে যারা জানে তারাই জানে,
দেয়ার আছে মূল্যটি কোনখানে।"

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার উপায়

www.pathagar.com

নেতৃত্বের ভূবনে প্রথম করণীয় হল পরিচিতি লাভ করা। এই পরিচিতি চেহারায়, নামে, বংশ মর্যাদায়, শিক্ষায়, বিচক্ষণতায়, সততায়, আন্তরিকতায়, ধন-সম্পদে, বিভিন্ন দিকে হতে পারে। তবে নাম-পরিচয় বাতাসে ছড়িয়ে দিলেই যে সঠিক পরিচিতি আসবে তেমনটি নয়। গ্রামে-গঞ্জে স্বাভাবিক নিয়মে একে অপরকে চেনে। এই চেনা আর নেতা হিসেবে কাউকে চেনা এক কথা নয়। আমরা এই বইতে যে-ধরনের পরিচিতির কথা বলছি, তা নেতা হিসেবে পরিচিতি—যে পরিচিতি একই সাথে সান্নিধ্যের এবং দূরত্বের, ভালোবাসার এবং ঘৃণার, বন্ধুত্বের এবং ভীতির। এই পরিচিতি, অতএব, একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফল।

এই পরিচিতির সাথে প্রভাব ও জনপ্রিয়তা বা জননিন্দা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেউ কেউ আপনাকে ভালোবাসবে ব'লে কেউ কেউ আপনাকে ঘৃণা করবে। এবং কেউ কেউ আপনাকে ঘৃণা করবে ব'লেই কেউ কেউ আপনাকে বেশি ভালোবাসবে। কিছু কিছু লোক আপনাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে বলে কেউ কেউ আপনাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করবে। যেখানে নেতৃত্ব জড়িত সেখানে পরিচিতির চরিত্র এরকমই। বিপরীতভাবে, যার শত্রু নেই, তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ হতে পারেন, তবে তিনি নেতা নন।

এই পরিচিতি, সুতরাং, একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফলে এর কোনো নির্দিষ্ট শেষ নেই। এ কারণে "নজরে পড়ার বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার কৌশল" শীর্ষক অধ্যায়ে যে-কৌশলগুলো বর্ণিত হয়েছে, পরিচিতি লাভের প্রক্রিয়া ওখানে শুরু বটে, তবে ওখানে শেষ নয়। এই অধ্যায়ে বর্ণিত কৌশলগুলো অনেকাংশে পরিচিতি লাভের হাতিয়ার, আবার অনেকাংশে সে পরিচিতিকে জনপ্রিয়তার দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেয়ারও উপায় হিসেবে কাজ করবে। কৌশলগুলো বিচক্ষণ নেতাদের বাস্তব জীবন থেকে নেয়া। সুতরাং এগুলো অবশ্যই কাজ দেবে।

www.pathagar.com

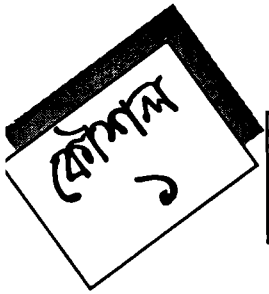

কৌশল ১

নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ
(Take control of something)

নিয়ন্ত্রণ থেকে ক্ষমতার (Power-এর) সৃষ্টি। অর্থ, সম্পদ, তথ্য (Information), ফাইল, সিদ্ধান্ত (Decision) ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ (Control) করতে পারলে ক্ষমতা অর্জন করা যায়। মূলত এই নিয়ন্ত্রণই অফিসিয়াল এবং যাবতীয় বৈধ ক্ষমতার প্রধান উৎস।

কোনো প্রতিষ্ঠানে বা অফিস-আদালতে একেকজন কর্মকর্তা একেকটি জিনিস নিয়ন্ত্রণ করেন। কেউ নিয়ন্ত্রণ করেন অর্থ, কেউ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, কেউ তথ্য—এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন জিনিস। ফলে, উদাহরণস্বরূপ, গোপনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের সবাইকে (যারা উক্ত তথ্যের উপর নির্ভরশীল) তার উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এভাবে তথ্য-নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা একটি বিশেষ অতিরিক্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। আপনার কোনো কাজের নথি-পত্র যখন সরকারী বা বেসরকারী কোনো অফিসের কোনো কর্মকর্তার হাতে থাকে, তখন আপনাকে তার মুখাপেক্ষী হয়ে ব'সে থাকা ছাড়া কোনো পথ থাকে না। এই ফাইলের সুবাদে তিনি আপনার উপর কিছু প্রভাব অবশ্যই খাটাতে পারেন।

তথ্যের ক্ষেত্রে যেমন, সম্পদের ক্ষেত্রেও তেমন। ধরুন আপনার অঞ্চলের একটি সমিতির আপনি ট্রেজারার বা খাজাঞ্চি। সমিতির যাবতীয় নগদ টাকা-পয়সা আপনার তত্ত্বাবধানে থাকে। এবার একটু কল্পনা ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবেন সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা তাদের যে-কোনো কার্যক্রমের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আপনার উপর কতখানি নির্ভরশীল। আর তারা আপনার উপর নির্ভরশীল ব'লেই আপনি তাদের উপর ঐ বিশেষ ব্যাপারে ক্ষমতাবান।

নিয়ন্ত্রণের ধারণাটা তো বুঝা গেল, কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা যায় কিভাবে?—সম্ভবত মনে মনে আপনি এতক্ষণে এই প্রশ্নটি করছেন। নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার সবচেয়ে সহজ এবং নির্ভরযোগ্য উপায় হল :

দায়িত্ব গ্রহণ

(taking responsibility)

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট সবার মঙ্গলের জন্য কোনো ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করার অযুহাত সৃষ্টি করা তেমন কঠিন কোনো কাজ নয়, কিন্তু খবরদারি দেখিয়ে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করা আদৌ কোনো সহজ কাজ নয়।

এই দায়িত্ব গ্রহণের কাজটিকে আরো সহজ এবং ফলপ্রসূ ক'রে তোলা যায় যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা হল :

ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
(institutionalization of power)

অর্থাৎ, আপনি আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে-প্রভাব অর্জন করেছেন, তাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিন। এ প্রতিষ্ঠান হতে পারে কোনো ক্লাব, কোনো সমিতি, কোনো সংঘ, কোনো রাজনৈতিক ক্ষুদ্র জোট (অবশ্য রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বাংলাদেশে এত বেশি যে . . . আর কি বলব!), জনকল্যাণ সংস্থা (যেমন ধূমপানের বিরুদ্ধে বা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণমত সৃষ্টি করার জন্য), কোনো বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্য বা কোনো বিশেষ দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য গঠিত টাস্ক ফোর্স ইত্যাদি। অবশ্য আপনি যদি আগে থেকেই কোনো প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত থাকেন, তাহলে আপনার প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত কিভাবে নোতুন নোতুন জিনিসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায় তার প্রতি। সে ক্ষেত্রেও আপনি পার্টির নিয়ম-নীতির মধ্যে থেকে উক্ত বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গ'ড়ে তুলতে পারেন। তবে সব ক্ষেত্রেই প্রথমে দায়িত্ব গ্রহণ করার কষ্টটুকু স্বীকার করতে হবে।

নিখুঁতভাবে সুসংগঠিত কোনো সংগঠন গ'ড়ে না তুলেও সাধারণ জনতাকে নিয়ে অনেক সময় অনেক কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। এমনকি কিছু কিছু ব্যবসার মধ্য দিয়েও তা সম্ভব। খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে মাছের চাষের ব্যবসা এর একটি উদাহরণ। এসব অঞ্চলে কোনো একটি বিলে মাছের খামার (যা "ঘের" নামে পরিচিত) করতে হলে ঐ বিলে যত লোকের জমি আছে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের লিখিত সমর্থন লাগে। কারণ এর সাথে জমিঅলাদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ (জমির ফলনের পরিমাণ, ঐ অঞ্চলে বন্যার পানির জলাবদ্ধতা, কিছু লোকের কর্মসংস্থান ইত্যাদি) জড়িত। এ কারণে ঘের মালিক ঘেরটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এলাকাবাসীর উক্ত বিষয়গুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের নেপথ্যে যে দায়িত্ব রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তাও অর্জন করতে পারেন (কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই নিয়ন্ত্রণ হাতে পেয়ে দায়িত্বের কথা ভুলে যান। আর এভাবে তাকে এক সময় নিয়ন্ত্রণ হারাতেও হয়।) যৌথ খামার ব্যবস্থাতেও এরূপে ক্ষমতা অর্জন করা যায়। আপনার অঞ্চলের সামাজিক অবকাঠামো বিশ্লেষণ ক'রে আপনি নিজেই এরকম অনেক উপায় বের ক'রে নিতে পারবেন।

www.pathagar.com

প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত (institutionalized) ক্ষমতা সব সময়ই বৈধতা পায়। কারণ দশ জনের সমর্থনেই তা গঠিত। রাষ্ট্র থেকে শুরু ক'রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সংঘ, ক্লাব ইত্যাদি সবকিছুতেই বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব যাদের হাতে থাকে, তা সম্পর্কিত যাবতীয় সম্পদ এবং কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও তাদের হাতে থাকে। এই ক্ষমতাই প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বা authority। Authority হল power যা বিশেষ মহলে বৈধ। সুতরাং কোনো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেও যেমন ক্ষমতা অর্জন করা যায়, তেমনি কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগদান ক'রেও তা অর্জন করা যায়।

নিজের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করার আরেকটি উপায় হল এরূপ সংগঠন সৃষ্টি করার পর তাতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা। এরূপ ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন করার সময় এই বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে :

— কোন কোন ব্যক্তিগবর্গকে প্রভাবিত করতে পারলে এলাকার সবচেয়ে বেশি লোকের সমর্থন পাওয়া যাবে;
— তাদের মধ্যে কাকে কাকে মনোনীত করা নিরাপদ নয়;
— যাদেরকে নির্বাচন করা হবে, তাদের মধ্যে কোনো শত্রুতা আছে বা ছিল কি না; ইত্যাদি।

একটি সংগঠনের মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, মনোমালিন্য ইত্যাদি থাকতে পারে। বাস্তবে তা থাকেও। এসব বিষয় অত্যন্ত কৌশলে পরিচালনা করতে হয়। বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব প্রদান, তাদের মাধ্যমে বাঞ্ছিত কাজ আদায়, তাদের মধ্যে পরিশীলিত আচরণ গ'ড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়গুলোও যথেষ্ট দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে হয়। এ ব্যাপারে আমরা "দল পরিচালনা" শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

অবশেষে আমরা দায়িত্বের প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই। সংগঠনের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা বন্টনের একটি মূল সূত্র এই যে,

কাউকে কোনো দায়িত্ব দিলে ঐ দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাও (authority) তাকে দিতে হবে।

এ হল সংগঠনের ব্যবস্থাপনার (ম্যানেজমেন্ট-এর) তত্ত্ব। এতে পলিটিক্সের উপাদান নেই। দায়িত্বের সাথে সাথে ক্ষমতা পেয়ে গেলে তো আর কোনো ঝুট-ঝামেলা থাকল না। কিন্তু কে আপনাকে দেবে দায়িত্ব? কে দেবে ক্ষমতা? আপনি যে-প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত, সে-প্রতিষ্ঠান আপনাকে যে-ক্ষমতা দিবে, বিচক্ষণ নেতা হলে আপনি তার চেয়ে বেশি ক্ষমতা অর্জন ক'রে নিতে পারবেন। কৌশল একটাই :

www.pathagar.com

যার যে-কাজটি করার দক্ষতা নেই, তার কাছ থেকে সে-কাজটি করার দায়িত্ব নেয়া।

এভাবে তাকে আপনি আপনার উপর নির্ভরশীল ক'রে তুলতে পারবেন।

আবারও বলি, ক্ষমতার একটি সূত্র হল :

সব ক্ষমতাই পরিণামে রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করে।

সুতরাং প্রথম প্রথম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দিয়েই যে প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন ক'রে তারপর রাজনীতির অঙ্গনে পদার্পণ করা যায়। প্রথম প্রথম এটাই অনেক নিরাপদ ব'লে মনে হয়।

www.pathagar.com

লো-বল টেকনিক
(Play the low-ball technique)

একটি ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল। অধিকাংশ লোকই, শুধু নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োগ ক'রে থাকে। কিন্তু, বিস্ময়করভাবে, অধিকাংশ লোকই কৌশলটির মূল তত্ত্বটি না বুঝেই নিছক ধৈর্যবশত বা উদ্দেশ্য সাধনের আপ্রাণ প্রচেষ্টার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই কৌশলটি প্রয়োগ করে। ফলে অনেকে কৌশলটির পূর্ণ ক্ষমতাটুকু প্রয়োগ করতে পারে না। বিপরীতপক্ষে, কৌশলটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি জেনে সচেতনভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারলে এর থেকে অনেক সুফল আশা করা যায়।

আপনি যখন কাউকে দিয়ে কোনো কিছু করাতে চান, বা তাকে কোনো কিছু বিশ্বাস বা গ্রহণ করাতে চান, বা তাকে দিয়ে আপনার নিজের ইচ্ছানুসারে কোনো কাজ করাতে চান যা সে স্বাভাবিকভাবে করবে না ব'লে আপনি মনে করেন, তখন সে-কাজে সফল হবার জন্য এই কৌশলটি প্রয়োগ করতে পারেন।

কৌশলটির মূল কথা হল : **কাউকে দিয়ে কোনো বড় কাজ করাতে গেলে প্রথম বারই তাকে তা করতে বলা হলে সে তা করতে না-ও চাইতে পারে। কিন্তু বড় কাজটির আগে তাকে দিয়ে ছোট ছোট একটি বা দুইটি কাজ করার জন্য রাজি করাতে পারলে বড় কাজটি করার জন্য তাকে সহজে রাজি করানো যাবে বা করানো সহজ হবে—অর্থাৎ, তখন তার রাজি হবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।**

কেন এমন হয়? এর প্রধান তিনটি কারণ আছে। প্রথমত, মানুষ তার মানসিক অবস্থার ধারাবাহিকতা নষ্ট করতে চায় না। এটাই মানসিক সাম্যের নীতি। এই সাম্যের নীতি অনুসারে একবার হ্যাঁ বলার মানসিকতা তৈরি হয়ে উঠলে মানুষ সাধারণত না বলতে চায় না। আবার প্রথম ছোট কাজের ক্ষেত্রে সে যদি রাজি না হয়, তাহলে খুব সম্ভব দ্বিতীয় (বড়) কাজটি করার প্রস্তাব করলেও সে না-ই বলবে বা রাজি হবে না। সুতরাং কেবল প্রথম কাজটির ক্ষেত্রে তাকে হ্যাঁ বলাতে পারলেই পরবর্তী কাজটির জন্য তাকে অনুরোধ বা আহ্বান করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, প্রথম ছোট কাজটি করার পর লোকটির মন থেকে বড় কাজটি করার কষ্টের, ভয়ের, অনিশ্চয়তার, বা বিফলতার দুশ্চিন্তা অনেক কমে যাবে। ফলে বড় কাজটি করার প্রস্তাবে হাঁ-বোধক জবাব দেয়া তার জন্য মানসিকভাবে সহজতর হবে।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত,—এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ—মানুষ নিজেকে নিজের কাজ দিয়ে বিচার করতে বেশি ভালোবাসে। কোনো কাজের ব্যাপারে সে আগে অনীহা প্রকাশ করলেও, তাকে যদি সে কাজ একবার করানো যায়, এবং তাতে সে সফল হয়, তাহলে সে ঐ কাজকে ভালোবাসতে শুরু করে। এভাবে ঐ কাজটির দায়িত্ব তাকে যে-ব্যক্তি দিয়েছিল, সে ব্যক্তির উপরও তার আস্থা এবং ভালোবাসার জন্ম হয়। ফলে সে ঐ জাতীয় অন্য কাজ করতে কিংবা ঐ ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত অন্য কাজ করতেও আগ্রহী হয়ে ওঠে। (এই তত্ত্বটির ব্যাপক প্রয়োগ আমরা অন্যত্র "অ্যাক্শন থেরাপি"তে দেখব।)

উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

এক ভিখারী বুড়ি এক কৃপণ ধনীর বাড়ির গেটে প্রায়ই গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মিনতি করত : মা দুইড্যা ভিক্ষা দেন। মা, দুইড্যা ভিক্ষা দেন।

কিন্তু বাড়ির মধ্য থেকে হ্যাঁ বা না কোনো সাড়াই আসত না। কিন্তু সে হতাশ না হয়েই ফিরে যেত।

বুড়ি ভিক্ষা না পেলে কি হবে। সে একেবারে নাছোড়বান্দা। চেষ্টার ত্রুটি তার কখনো ছিল না। সে প্রায়ই এসে অনুরূপভাবে ভিক্ষা চেয়ে অবশেষে খালি হাতে ফিরে যেত।

কৃপণ গৃহস্বামী বুড়ির এই অধ্যবসায়ে বিরক্ত হয়ে একদিন ভাবল, তাকে সে লজ্জা দিবে। সুতরাং পরদিন বুড়ি এসে একইভাবে মিনতি করতে লাগলে গৃহস্বামী এসে গেটটি খুলে তাকে বললো : এই বুড়ি, কেটে পড়। নইলে তোমার কপালে ছাই জুটবে।

বুড়ি তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠল : দে বাবা, তাই দে। না হয় ছাই-ই দে। (আর মনে মনে বলল, ছাই দিতে দিতে হাত আসুক।)

গৃহস্বামী কৃপণ হলেও ভদ্রলোক তো। বড় সমস্যায় পড়ল। কিভাবে সে ছাই দেবে বুড়িকে? এদিকে মুখ ফসকে বলেও ফেলেছে। তবুও কৃপণের মন। তা কথায় ভেজানো যায় না। (তবে কাজে ভেজানো যায়। একটু পরেই তার প্রমাণ পাবেন।) সে বুড়িকে ছাই-ই দিল।

বুড়ি হাসি মুখে ছাই নিয়ে চ'লে গেল। কোনো রূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল না।

পরদিনও বুড়ি এসে সমধিক আগ্রহে ছাই নিয়ে গেল।

বুড়ি এভাবে ছাই নিতেই থাকল।

একদিন হঠাৎ পাত্র থেকে থলিতে ছাই ঢেলে নিতে গিয়ে বুড়ি অবাক হল। আজ ছাই নয়, চাল। "আর ছাই নেই বাবা?" বুড়ি মুচকি হেসে গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করল।

গৃহস্বামী আরো বেশি অবাক হল। সে যে বুড়িকে আজ ছাইয়ের বদলে চাল দিয়েছে তা সে নিজেই জানে না!

এরপর থেকে বুড়ি ঐ বাড়িতে চাল ছাড়া আর ছাই পায়নি কখনো।

www.pathagar.com

বুড়ি প্রকৃতই বুদ্ধিমতী ছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল খালি হাতে ফেরার চেয়ে কিছু পাওয়া—হোক না সে ছাই। দিতে দিতেই মানুষের হাত আসে।

এই কৌশলটিকে আপনি কোনো ব্যক্তিকে আপনার দলে আনার জন্য বা কোনো বিষয়ে আপনাকে সমর্থন করাবার জন্য ব্যবহার করাতে পারেন। তবে ধৈর্য হারালে চলবে না কিন্তু।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি তত্ত্বের উল্লেখ করা যায়। তত্ত্বটির মর্মকথা সহজে এরূপ : আমি আপনার জন্য (বিশেষত আপনার মঙ্গলের জন্য) একটি কাজ করলাম। এই কাজটি করার পর আমার উপর আপনি যতটুকু কৃতজ্ঞ হবেন, আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি এবং হৃদ্যতা তার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাবে। তত্ত্বটি আপাতবিরোধী হলেও অত্যন্ত জটিল একটি সত্য কথা। একটু ভেবে দেখলেই এর দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিটি বুঝা যাবে।

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। মহানবী (সঃ)-এর জীবনের একটি ঘটনা। ছোট বেলায় পড়েছিলাম। ঘটনাটি স্পষ্টভাবে মনে নেই। আবার গাদা গাদা বই ঘাটতে ঘাটতে এই মুহূর্তে হাদিস খুলে দেখার প্রাণশক্তিও নেই। ঘটনাটির সারাংশে হয়তো কোনো ভুল হবে না এই বিশ্বাসেই তা কতকটা স্মৃতি থেকে এবং কতকটা আন্দাজে বলছি। (লিখতে লিখতে হাত এসে গেছে ব'লে পড়তে আর মন চাচ্ছে না!) বিজ্ঞ পাঠক বিনীত লেখকের তথ্যগত ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবেন আশা করি। ঘটনাটি এরূপ : একবার এক ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদী (?) দম্পতি হযরত (সঃ)কে আহারের দাওয়াত দিলেন। হযরত (সঃ) তা গ্রহণ করলেন। তার বাড়িতে যথাসময়ে গেলেনও। কিন্তু দুষ্টমতি দম্পতি তার গায়ে পশুর রক্তাক্ত নাড়ি-ভুড়ি নিক্ষেপ ক'রে তাকে অপমান করলেন। হযরত (সঃ) তাতে মনঃক্ষুণ্ন হলেন না।

এভাবে উক্ত দম্পতি পরপর তিন দিন (?) হযরতকে দাওয়াত করলেন এবং প্রতিদিনই তাকে একই ভাবে অপমানিত করলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হল, একই ঘটনা বারবার সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও নবীজী (সঃ) তাদের দাওয়াত প্রতিবারই গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু চতুর্থ (?) দিন ঘটনার ব্যতিক্রম হল। উক্ত দম্পতি নবীজীর (সঃ) ধৈর্যে এবং মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে তো যথাযোগ্য মর্যাদায় আপ্যায়ন করলেনই, উপরন্তু তারা ঈমান আনলেন।

মানুষের দ্বারে যান। যে যা দেয়, নিতে থাকুন। দিতে দিতেই মানুষের হাত আসে।

মানুষকে দারাজ বুক নিয়ে আহ্বান করার মধ্যে আরো একটি সুফল নিহিত আছে। তাতে আপনার উদ্দেশ্য হাসিলের যেমন সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি নিজের মানসিক শক্তি বৃদ্ধিরও পূর্ণ নিশ্চয়তা আছে। তাহলে একটি গল্প শুনুন।

এক ব্যক্তি এক ধর্মগুরুর কাছে গিয়ে বলল, "হুজুর, আমি খাঁটি মুসলমান হতে চাই। আমাকে পথ বাতলে দিন।"

www.pathagar.com

হুজুর বললেন, "এক লক্ষ বার কালেমা তায়্যিবা প'ড়ে তারপর আমার কাছে আয়।"

লোকটি তাই করল।

হুজুর এবার বললেন, "কালেমার মানে বুঝেছিস?"

"জ্বী হুজুর, বুঝেছি।"

"মর্ম বুঝেছিস?"

"মানেটা বুঝেছি হুজুর, কিন্তু মর্মটাতো বুঝিনি।"

"তাহলে একটা ছাগলের কানে কানে প্রতিদিন কালেমার দাওয়াত দিবি। ওকে এর মানেটা বুঝাবার চেষ্টা করবি।"

"কিন্তু হুজুর, ওকে মর্মটা বুঝানোর চেষ্টা করব না?"

হুজুর বিরক্ত হলেন। "দূর হ, বোকা! তুই নিজে মর্ম জানিস নে, অন্যকে তা বুঝাবি কিভাবে? মর্মটা তোর জন্য, আর মানেটা ছাগলের জন্য।"

লোকটি সেদিন থেকে তাই করতে শুরু করল। সে প্রতিদিন একটি ক'রে ছাগল খুঁজে বের করে। তার কানটা ধ'রে টেনে এনে তাতে কালেমার দাওয়াত ফুকে দেয়। ছাগলটি "ব্যা" ক'রে ছাগলের মতো দৌড়ে পালায়।

লোকটি মনে মনে বলে, কি সমস্যায় ফেললেন হুজুর! ছাগলকে শেখাতে গিয়ে শেষমেশ নিজে যা শিখেছিলাম তা-ও ভুলে বসব নাকি! তবুও হুজুরের আদেশ শিরোধার্য। হুজুর তো নিঃসন্দেহে তার চেয়ে বেশিই বোঝেন। ফলে সে তার ছাগলকে কালেমা শেখানোর কাজে বন-জঙ্গল-মাঠ-ঘাট-পথের পাঠশালায় অহরাত ঘুরতে লাগল। প্রতি বারই একই রেজাল্ট : ব্যা! ব্যা! করতে করতে ছাগলের দৌড়ে পলায়ন।

লোকটি মনে মনে ব'লে, তুই পালাবি পালা, ছাগল! আমার কাজ আমি করবই।

একদিন একটি ধাড়ি ছাগলের দুই কান চেপে ধ'রে লোকটি প্রথমে বাম কানে ফুকে দিল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

ছাগল বলল "ব্যা!!"

সে আরেক কান টেনে ধ'রে দ্বিগুণ আগ্রহ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু . . . রসুলুল্লাহ।

ছাগলটি একবার ফোঁস ক'রে উঠল। তারপর . . . বলুনতো তারপর কী হল ? . . . তারপরও একইভাবে ছাগলটি "ব্যা!" ব'লে চিৎকার ক'রে মাথাটাকে এক ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে দিল এক দৌড়।

লোকটির খেয়াল এতক্ষণে ছাগল থেকে নিজের মনের ভেতরমুখী হয়েছে। সে খানিকক্ষণ বিবশ হয়ে চোখ কপালে তুলে কি যেন ভাবল বা অনুভব করল। তারপর তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে গলা ফাটিয়ে ব'লে উঠল, "যা ছাগল! তুই না বুঝিস, আমিতো বুঝেছি!"

এবার কিন্তু সে মর্ম বুঝেছে।

দেখুন, মানেটা অন্যকে বুঝানো যায়, তবে মর্মটা বুঝানো যায় না। তা কাজের মাধ্যমে নিজের মধ্যে অনুভব ক'রে নিতে হয়।

www.pathagar.com

আপনি এক হাজার দরোজায় যাবেন, অন্তত দু'জন আপনার পক্ষে আসবে। এই দু'জন সমর্থক আপনার অতিরিক্ত পাওনা। বড় পাওনা হল নেতৃত্বের গুণ, ধৈর্যের মর্ম, সহনশীলতার মাহাত্ব।

প্রিয় পাঠক, আমি এতক্ষণ ধর্ম প্রচার করিনি, কাজের কথা বলেছি।

লো-বল টেকনিকটির প্রথম আবিষ্কার এবং ব্যবহার হয়েছিল ব্যবসা জগতে। বিশেষত গাড়ির সেলসম্যানরা এই কৌশলটি সফলতার সাথে ব্যবহার করত। সেক্ষেত্রে এটি কিভাবে ব্যবহৃত হত তা একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করছি। মূলত এই উদাহরণটির মাধ্যমেই বুঝা যাবে কৌশলটির আসল রূপটি কী।

কিছুদিন আগে পাখি কিনতে গেছি। একটি বড় খাঁচায় এক জাতীয় কতকগুলি পাখি ছিল। সবগুলোর দাম করা হল। পাখিগুলি আমি কিনব। কিন্তু আমি খাঁচাসহ সব পাখিগুলিকে একত্রে কিনব ব'লে সে অনুসারেই দাম বলেছি। কিন্তু দাম-দস্তুর করার পর দোকানী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "খাঁচা এনেছেন না?" আমিতো অবাক। মাছের বাজার করতে এসেছি নাকি? বললাম, "না"। "তাহলে তো খাঁচাও কিনতে হয়।" কি আর করা। পাখিগুলো কেনার জন্য আগে থেকেই মানসিকভাবে তৈরি হয়ে আছি যে। খালি হাতে ফিরতে মন চাইছে না। সুতরাং অতিরিক্ত টাকা দিয়ে খাঁচা কিনলাম। কিন্তু খাঁচাসহ পাখিগুলোকে আমার হাতে তুলে দেয়ার আগে তারা পাখিগুলোর খাবারের এবং পানির পাত্রগুলো বের ক'রে রাখলো। "কী ব্যাপার, এগুলোও কি কিনতে হবে নাকি?" জানতে চাইলাম। দোকানী একগাল মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বলল, "জ্বী ভাইয়া, ওগুলো আমাদেরকেও আলাদাভাবেই কিনতে হয়।"

এই হল লো-বল টেকনিক। আমি ভেবেছিলাম সবকিছু মিলে যে দাম হয় আমি তাই-ই বলেছি। কিন্তু তারা আমার ভুলকে একটু একটু ক'রে শুধরে দিল। একবার মানসিকভাবে কোনোকিছু করতে প্রস্তুত হয়ে গেলে ছোট খাটো বাধা আর তা ঠেকাতে পারে না।

অবশ্য পাখিগুলো নিয়ে যখন চলে আসব, তখন তাদের একজন বলল, "খাবার আছে বাসায়?"

ফলত বড় একটি ধন্যবাদ দিয়ে খাবারও কিনলাম। কারণ, আমাকে তারা যদি খাবারের কথা মনে করিয়ে না দিত, তাহলে বাসায় গিয়ে পাখিগুলোকে কী খাওয়াতাম?

অনেক সময় লো-বল টেকনিকের আরেকটি সংস্করণও দেখা যায়। আপনি, ধরা যাক, কোনো দোকানে একটি গাড়ি কিনতে গেলেন। এই মডেলের গাড়ি আপনি অন্য কোনো দোকানে দেখেননি। খুব ভালোও লেগেছে। সেলস্‌ম্যানের সাথে দর-দাম করলেন। সে আপনাকে বলল, "দামটা, আমি নিশ্চিত নই, তবে ৮ লাখ হতে পারে। অল্প কিছু বেশিও হতে পারে। অবশ্য আপনি আগে গাড়িটা পছন্দ করেন স্যার। পছন্দ হলে তারপর ম্যানেজার সাহেবের সাথে দাম নিয়ে আলাপ করা যাবে। . . . এই মডেলের গাড়ির অন্য কোথাও পাবেন না। লেটেস্ট মডেল। চারটা এনেছিলাম। একটাই মাত্র আছে।"

www.pathagar.com

সুতরাং আপনি গাড়িটাকে আরো বেশি পছন্দ করার তাগিদ অনুভব করতে লাগলেন। ভাবলেন, গাড়ি তো পছন্দ হল, এবার দামটা পছন্দ করা যাক।

ম্যানেজার একটু অন্যমনস্ক হয়ে আরেক জনের সাথে আলাপ করতে করতে বললেন, "সাড়ে আট লাখ।"

আপনি কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে মন স্থির ক'রে ফেললেন। "কিছু কমানো যায় না?"

"কি যে বলেন স্যার," পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেলসম্যান বলল, "একেবারে হিসাব-করা লাভ।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। পছন্দ যখন হয়েছে, তখন না নিয়ে উপায় কি।"

এতক্ষণে ম্যানেজার সাহেব তার জরুরি আলাপ শেষ করেছেন। তিনি অপরাধীর মত ব্যতিব্যস্ত হয়ে তার গাড়ির মূল্যতালিকা খুঁজছেন। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে হাঁক ছাড়লেন, "রহিম চাচা!"

রহিম চাচা কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তাকে মূল্যতালিকাটি এনে দিল।

তাতে একবার চোখ বুলিয়ে তিনি জিহ্বা কেটে অপরাধীর মত হাসলেন, "সরি স্যার। মডেলটির দাম ৯ লাখ। এই দেখুন।" তিনি আপনাকে মূল্যতালিকাটি দেখালেন।

এক ধাপে যখন ৫০,০০০ টাকা উঠতে পেরেছেন, এ ধাপে তখন আর আপনাকে ঠেকায় কে। গাড়িটাকে আপনি ভালোবেসে ফেলেছেন। আর ভালোবাসার পথে বাধা আসলে তা আরো গাঢ় হয় বৈ কি!

লো-বল টেকনিকে কোনো সামাজিক পাপ নেই। গাড়িটির প্রকৃত বিক্রিমূল্যই ছিল ৯ লাখ। কৌশলে আপনার কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেয়া হয়নি, শুধু আপনার পছন্দের এবং সিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

তাহলে এ কৌশল অনুসারে আপনার কী করণীয়? সম্ভবত এতক্ষণেই তা অনুমান করতে পেরেছেন। তবুও আরেকটু স্পষ্ট ভাষায় বলা যাক।

ধরা যাক কোনো ব্যক্তিকে আপনি আপনার পক্ষে আনতে চান। সরাসরি তাকে দাওয়াত দিলে তিনি না আসতেও পারেন ব'লে আপনার ধারণা। সুতরাং তার কাছে প্রথম দিন দোয়া চান। পরদিন গিয়ে আপনার কর্মকাণ্ডের প্রতি তার পক্ষ থেকে **সামাজিক** সহানুভূতি চান, রাজনৈতিক সহানুভূতি নয়। পরবর্তী দিন তাকে আপনার কোনো জনসভায় বা গণ-কার্যক্রমে দলীয় সদস্য হিসেবে নয়, সমাজের একজন শুভাকাঙ্খী, গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে যোগদান করতে বলুন। সভায় জনতার সামনে তাকে এ পর্যায়ে শুধু একজন সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করবেন, আপনার দলের সমর্থক বা শুভানুধ্যায়ী হিসেবে নয়। কারণ এখনও তিনি মানসিকভাবে আপনাকে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত না হতেও পারেন। এতক্ষণে তার "হাত এসে গিয়েছে"। সুতরাং এরপর পরবর্তী ধাক্কাটি দিন। অর্থাৎ, আপনার সভায় একজন নিরপেক্ষ সমাজ-সচেতন ব্যক্তি হিসেবে তাকে বক্তব্য দিতে অনুরোধ করুন, এবং কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ডে (যেমন বৃক্ষরোপণ, কাঙালিভোজ) তার অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করুন। এ পর্যায়ে তিনি নিজের কাজকে ভালোবেসে ফেলবেন, নিজের কাজের মধ্যে

www.pathagar.com

নিজেকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করবেন, নিজের কাজ অনুসারে নিজের চিন্তাকে আকৃতি দান করতে প্রবৃত্ত হবেন।

এরপর তাকে ছোট খাট দায়িত্ব দিতে থাকুন। মানুষ নিজের দায়িত্ব দ্বারাই নিজের ওজন মাপতে খুব ভালোবাসে। দায়িত্ব মানুষের যোগ্যতাও বাড়িয়ে দেয়।

এই কৌশলটি আপনি আপনার কর্মীদেরকে নিয়েও নিজেদের উপর প্রয়োগ করতে পারেন—নিজের উপর! উদাহরণস্বরূপ, বড় আন্দোলনে যাবার আগে ছোট-খাট আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানসিকভাবে এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে ভাল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন। বড় কোনো ব্যাপারে কাউকে কোনো ব্যক্তির বিরোধিতা করতে উদ্বুদ্ধ করাবার জন্য প্রথমে তাকে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ছোট-খাট ব্যাপারে তাকে বিরোধী ক'রে তুললে বড় বিরোধিতা সহজেই হয়। আবার, কারো মধ্যে বড় কোনো কাজে সফল হবার প্রবল ইচ্ছা ও আত্মশক্তি জাগ্রত করতে হলে তাকে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে সফলতা দেখাতে হবে। ছোট ছোট কাজে সফল হতে হতে তার মধ্যে উচ্চাকাঙ্খার এবং মনোবলের সৃষ্টি হবে। . . . ইত্যাদি ইত্যাদি।

কৌশলটি, নিঃসন্দেহে, অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

www.pathagar.com

বলকে চালু রাখা
(Set the ball rolling)

অনেক ক্ষেত্রে টিকে থাকা বড় কথা নয়, কিন্তু নেতৃত্বের ক্ষেত্রে টিকে থাকা অবশ্যই বড় কথা। এক্ষেত্রে টিকে থাকা মানে সক্রিয় থাকা; এক্ষেত্রে টিকে থাকা মানে এগিয়ে যাওয়া। আর এগিয়ে না যাওয়া মানে পিছিয়ে যাওয়া। আর পিছিয়ে যাওয়া তো ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হবারই নামান্তর।

তাহলে কী করণীয়? ইস্যু তো সব সময় আসে না।

করণীয় কিছু একটি বের করতেই হবে। চোখের আড়াল মানে মনের আড়াল হওয়া। চিন্তার আড়াল হওয়া। চিন্তার আড়াল হলেই মৃত্যু।

নেতৃত্ব বৃক্ষের মত। শেকড়ে খাবার পেলে আজীবন বাড়তে থাকে। আবার পার্শ্ববর্তী বৃক্ষটির অবস্থান ও অবস্থা দ্বারা তার বৃদ্ধি নির্ধারিত হয়—অর্থাৎ আপেক্ষিকভাবে কমে বা বাড়ে। শেকড়ে খাদ্য না পেলে পরিণাম ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যাওয়া। তারপর অনিবার্য মৃত্যু।

এই বৃক্ষের শেকড়ে খাদ্য দিতে হবে। জনতার মনের আড়াল হওয়া চলবে না।

সুতরাং কী করা উচিত?

করণীয় অবশ্যই আছে। প্রথম কথা হল :

বলটাকে গড়িয়ে দিন। চলতে থাক।
(Set the ball rolling.)

কার্যক্রম সব সময়ই থাকা উচিত। বলটাকে চালু রাখতে পারলে খেলোয়াড় আপনিই এসে জুটবে। খেলোয়াড় এলে খেলা জমবে। খেলা জমলে দর্শক আসবে। দর্শক আসলে সমর্থক এবং বিরোধী সবই পাওয়া যাবে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের চেয়ে প্রতিপক্ষ দর্শকেরই গুরুত্ব বেশি। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের সাথে আপনার সম্পর্কটি প্রত্যক্ষ, অথচ দর্শকের সাথে আপনার সম্পর্কটি পরোক্ষ। উক্ত প্রত্যক্ষ সম্পর্কের প্রকৃতি দ্বারাই পরোক্ষ সম্পর্কের চরিত্র নির্ধারিত হয়। আবার আপনার

www.pathagar.com

প্রধান লক্ষ্য হল এই পরোক্ষ সম্পর্ককে সুবিবেচনার সাথে ম্যানেজ করা। দর্শকের মনোরঞ্জনই আপনার খেলার মূল উদ্দেশ্য।

তাহলে, এক অর্থে, আপনি খেলছেন দর্শকের সাথে। কিভাবে খেলা উচিত?

উচিত ব'লে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে স্পষ্ট কিছু নেই। এ কারণে যা উচিত নয়, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। কারণ এ খেলায় জয়-পরাজয়ের রায় কোনো তৃতীয় কর্তৃপক্ষ থেকে আসে না, আসে দর্শক-জনতা থেকেই। সুতরাং আসল কথা জয়ের কথা ভাবা নয়, দর্শক-জনতার মনোরঞ্জনের কথা ভাবা।

একই প্রশ্ন আবারও অনিবার্য হয়ে পড়ে, "কিভাবে?"

এবং একই জবাব আবারও : কিভাবে সেটি বড় কথা নয়, কিভাবে নয় সেটিই আসল কথা।

তবে অধিকাংশ নেতা কিভাবে "দর্শক-জনতার" অনুভূতিতে সাড়া জাগাবার প্রয়াস পান তা বিশ্লেষণ করা অবশ্য-কর্তব্য। তারা জনগণকে নিয়ে দু'ধরনের খেলা খেলেন :

যুদ্ধের সময় শান্তির বাণী শুনানো; এবং শান্তির সময় যুদ্ধের পূর্বাভাস দেয়া।

প্রথম কৌশলটি অনিবার্য। যুদ্ধের সময় (অর্থাৎ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অস্থিরতার সময়) মানুষের কানে শান্তির বাণী অমৃতের মত মনে হয়। তখন হতাশ জনতাকে শান্তির বাণী যিনি আগে বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে শুনাতে পারেন, তিনি জনতার বিপুল করতালি লাভ করেন। এক্ষেত্রে যুদ্ধ একটি ইস্যু; ঐ মুহূর্তে কাঙ্খিত কল্পিত শান্তিও একটি ইস্যু। সুতরাং যুদ্ধের সময় ইস্যুর অভাব নেই।

আর শান্তির সময়?

চুপ ক'রে যেহেতু ব'সে থাকা যায় না (কারণ, নিষ্ক্রিয়তাই এক্ষেত্রে মৃত্যুর নামান্তর), সেহেতু কিছু একটি করতে হবে। শান্তির মুহূর্ত ব'লে কিছু নেই। শান্তি মানেই যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে চুপ হয়ে থাকা, কিংবা আসন্ন যুদ্ধের নিরব প্রস্তুতির উদ্দেশ্যপূর্ণ নিশ্চুপতা। নেতারা এ তত্ত্বটি ভালোভাবে জানেন। জানেন ব'লে তারা শান্তির সময়ও জনতার চোখে যুদ্ধের বিভীষিকার বীভৎস দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কল্পনা ছড়িয়ে দেন। জনতা যুদ্ধ চায় না ব'লে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এভাবে শান্তির মুহূর্তে তাদের মনের যুদ্ধ শুরু হয়। সে যুদ্ধ এক সময় পরিণতি লাভ করে বাহ্যিক বাস্তব যুদ্ধে। তখন নেতা তার প্রথম কৌশলটি নিয়ে জনতার মঞ্চে আবারও এসে হাজির হন। তিনি তখন আবারও শান্তির মন্ত্র পাঠ শুরু করেন।

মূলত এটি হল "বলকে চালু রাখার" গতানুগতিক কৌশল। কৌশলটির মূল কথা এবং এই গতানুগতিক নেতৃত্বের ধারার উদ্দেশ্য একই—জনগণকে ব্যস্ত রাখা। কিন্তু সব ধরনের ব্যস্ততার পরিণাম এক হতে পারে না। এই গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। নইলে জাতির রাজনীতির স্বাস্থ্য-বর্ধন হবে না। আর রাজনীতির ইমারত ধ্বসে

www.pathagar.com

পড়লে নেতৃত্বের বাঁশের কেল্লা টিকবে কিভাবে? এজন্যই বলেছি, কী করা উচিত নয় সেটি নির্ধারণ করাই বড় কথা। তাহলে কী করা উচিত তা নির্ধারণ করা আরো সহজ হবে।

আসল কথা হল, জনগণকে ব্যস্ত রাখতে হবে। তবে উক্ত গতানুগতিক কায়দায় নয়, অন্যভাবে। ব্যস্ত রাখতে হবে—

যুদ্ধের সময় শান্তির অন্বেষণে, এবং
শান্তির সময় শান্তির সম্ভোগে।

শান্তিকে যথার্থভাবে উপভোগের প্রক্রিয়াও একটি ব্যস্ততা। এই ব্যস্ততা গঠনমূলক। এই ব্যস্ততা সৃজনশীল। এর মূল-মন্ত্র হল অনুভূতির বিশ্রাম এবং বিশ্রামের অনুভূতি।

প্রচণ্ড কাজের শেষে বিশ্রাম মানে কাজ থেকে সাময়িক অব্যাহতি; আর অসহনীয় সৃষ্টিহীন অকেজো অবস্থার পর বিশ্রাম মানে কাজে যোগদান। সুতরাং বিশ্রাম হল একটু পরে কী করা উচিত তাই। আবার একটু পরে কী করা উচিত তা নির্ধারিত হয় এতক্ষণ কী করেছি তা দ্বারা।

মানুষ বিশ্রাম চায়। তাকে যথাযোগ্য মুহূর্তে যথাযোগ্য বিশ্রামে রাখা মানেই তাকে সঠিক উপায়ে ব্যস্ত রাখা। আমার মতে "বলকে চালু রাখার" গূঢ়ার্থ এটাই।

তাহলে নেতৃত্বের বিশাল বৃক্ষের শেকড়ে কিভাবে খাদ্য দিতে হবে?
কী করলে জনতার মনের আড়াল না-হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যাবে?
অর্থাৎ, কিভাবে বলটিকে চালু রাখা যায়?

উত্তর হল, জনগণ যা চায় তাদেরকে তাই দিন।
তারপর, তাদেরকে যা দেয়া উচিত তাই দিন।
তারপর, তাদেরকে তাই দিন যা তাদের প্রাপ্য।

অর্থাৎ যুদ্ধের সময় তাদেরকে শান্তি এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিন। কারণ তখন তারা তাই কামনা করবে।

আর শান্তির সময় তাদের শান্তিতে থাকতে দিন। তাদের শান্তি উদ্‌যাপনের সঙ্গী হোন। এ সময়কার জনসভায় শুধু থাক নেতৃত্ব, পলিটিক্স বাদ যাক। এ সময়ের জনসভা হোক সঙ্গীত-সভা, আনন্দ-সভা, অনুভূতির সভা। এ সময়ের খেলা হোক শুধু আনন্দময় প্রতিযোগিতার, আশু জয়-পরাজয়ের নয়। আপনি যদি যুদ্ধে (যেমন নির্বাচনে) হেরেও যান, তবুও এখন আপনার ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশের সময় নয়। সময়ের দাবিই এখন বড় কথা। সুখ এবং প্রফুল্লতা দিয়ে অন্যদের সাথে মেশা যায়; দুঃখ এবং আক্রোশ

www.pathagar.com

নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে। নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয়াই চরম পরাজয়। সুতরাং জনগণ যখন হাসতে চায়, তাদেরকে হাসতে দিন। নিজেও তাদের সাথে হাসুন। সময়ের দাবি আমরা মানি না ব'লেই আমাদের দেশে নেতাদের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তারপর, কেবল সত্যিকারের যুদ্ধের পূর্বাভাস পেলেই জনগণকে যুদ্ধে যাবার উস্কানি দিন। তার আগে নয়। আমরা দেহের রক্তপাত ঘটাই কেবল মনের রক্তপাত ঠেকাবার জন্যই। মানসিক শান্তিই আসল শান্তি। এই শান্তি বিঘ্নিত হলে যুদ্ধে জয়-পরাজয় কোনো নিয়ম মানে না। তখন ভুল নেতৃত্বের জয় এবং সফল নেতৃত্বের পরাজয় ঘটে। সুতরাং মনের শান্তি বিঘ্নিত ক'রে নয়, মনের শান্তি বিঘ্নিত হবার ভয়কে জীইয়ে রেখেই যুদ্ধের উস্কানি দিতে হবে।

"বলকে চালু রাখার" আরেকটি উপায় আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় রাজনীতিতে প্রচলিত আছে। এ উপায়টির মূল কথা হল :

প্রতিশ্রুতিশীল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান ক'রো না।
(Do not nip a promising problem in the bud.)

ফলে রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন কিছু কিছু সমস্যাকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পুরোপুরি সমূলে উৎপাটিত করা হয় না। বরং তা ভবিষ্যতের ইস্যু সৃষ্টি করার জন্য জীইয়ে রাখা হয়।

অনেক সময়, অবশ্য, সমস্যার সমাধানই সমস্যাটিতে নোতুন মাত্রা যোগ করে। তার বিশেষ একটি দিককে খুব ডামাডোল বাজিয়ে ব্যাপক তোড়জোড়ের মধ্য দিয়ে লোক দেখানোর জন্য সমাধান করা হয়। অথচ সমস্যার আসল ক্ষতিকর দিকটিই অলক্ষ্যে চাপা প'ড়ে থাকে, যথাসময়ে যা আবারও ইন্ধন পেয়ে দ্বিগুণ তাপে জ্ব'লে ওঠে।

বলা বাহুল্য, এই "সংকটের রাজনীতির" (politics by cirsis) অবসান ঘটে কতকটা ডারউইনের "প্রাকৃতিক নির্বাচনের" কায়দায়, যা গোটা নেতৃত্বের কাঠামোর রূপটি বদলে দেয়। দেশ ও জাতির জন্য এ রাজনীতি এবং এরূপ নেতৃত্ব দীর্ঘ-মেয়াদে (long term-এ) কোনো সুফল ব'য়ে আনতে পারে না।

অন্ততপক্ষে জাতীয় পর্যায়ে সংকটের সৃষ্টি করবে এমন কোনো সমস্যাকে জীইয়ে রাখলে খেলায় জয় হবে "অন্য" কারো। অবশ্য একথাও ঠিক যে এরূপ সমস্যা পুরোপুরি প্রকটিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভালো। তাতে সমস্যাটির উপস্থিতি জনগণ যেমন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে, তেমনি বয়েস-খাওয়া সমস্যার প্রকৃত গতিবিধি জেনে তা সমাধানের জন্য সঠিক পদক্ষেপও নেয়া যাবে।

জনগণ যে-সমস্যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল নয়, তা সমাধান ক'রে এক দিকে যেমন কোনো সুনাম নেই, অন্য দিকে প্রতিপক্ষের আক্রোশপূর্ণ ব্যাখ্যার কুফলের সম্ভাবনাও আছে। এ কারণে সমস্যার সংকটের রূপ ধারণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা

www.pathagar.com

ভাল। তবে বেশি দেরি হয়ে গেলে সমাধানের সুযোগ (যেটি হলো প্রকৃত নেতৃত্বের সুবর্ণ সুযোগ) হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

চোখের আড়াল না হওয়ার একটি "নিরপেক্ষ" অথচ কার্যকর উপায় হল ঐতিহাসিক দিবস পালন, মৃত্যুদিবস পালন, শিষ্টতা বজায় রেখে জয়োল্লাস করা, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড চালানো এবং প্রচারণা ইত্যাদি। এসব কর্মসূচি সর্বদা পালিত হয় বটে, তবে এগুলোতে সৃজনশীল চিন্তার দ্বারা নোতুন নোতুন মাত্রা যোগ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন প্রতীক কর্মসূচিও "বলকে চালু রাখার" ব্যাপারে সফল ভূমিকা রাখতে পারে।

www.pathagar.com

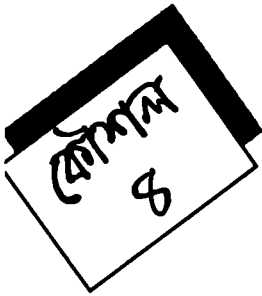

বাছাই সমালোচনা (Selective criticism)

আমাদের দেশে একটি অদ্ভুত রীতি প্রচলিত আছে। তা হল প্রতিপক্ষের সবকিছুকে সমালোচনা করার রীতি। প্রতিপক্ষের নীতিকে, তার ইতিহাসকে, তার কর্মকাণ্ডকে, তার সমর্থকদেরকে—সবকিছুকেই সমালোচনার একচেটিয়া প্লাবনে ধুয়ে দেবার একটি প্রবণতা আমাদের আছে। বিপরীতক্রমে, নিজেদের পুরোপুরি সাফাই গাওয়াতেও আমরা পারঙ্গম। আমাদের কারুরই কোনো খুঁত নেই, সব খুঁত প্রতিপক্ষের।

ভুল কৌশল!

ব্যর্থ এ সমালোচনা!

আমি নৈতিকতাকে সামনে রেখে একথা বলছি তা নয়, বলছি আরো কার্যকর কৌশল অবলম্বনের তাগিদকে সামনে রেখে।

এই মহামূল্য সূত্রটি মনে রাখা দরকার :

জনগণ কখনো ভুল করে না।
(The public is always right.)

এ কারণে, প্রতিপক্ষের **সমর্থকদেরকে** সমালোচনা করা আত্মপ্রবঞ্চনারই শামিল। সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত প্রতিপক্ষ নেতা বা নেতৃবৃন্দ বা তাদের নীতি—**জনগণ** নয়। জনগণকে সমালোচনা করা মানে হলো নিজেকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা, নিজেকে তাদের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা। ব্যাপারটি নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারারই নামান্তর।

এই মূল কথাগুলো মনে রেখেই সমালোচনার ভাষাকে গ'ড়ে তুলতে হবে। জনগণকে স্পষ্টভাবে বুঝাতে হবে যে তাদের সাথে আপনার কোনো মনোমালিন্য নেই—এমনকি তারা প্রতিপক্ষের সমর্থক হলেও। তারা প্রতিপক্ষকে সমর্থন করছে হয়তো নিছক ধোকায় পড়ে। তাদেরকে তা বুঝাতে হবে। ধোকার ধূম্রজাল কেটে নিজ দায়িত্বে জনগণকে সত্যের আলো দেখাতে হবে। এ দায়িত্ব আপনার একার।

www.pathagar.com

একই ভাবে, অন্য কোনো কর্মকাণ্ড বা দাঙ্গা যেন জনগণের কোনো ক্ষতির কারণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক কিছুতেই জনগণের ক্ষতি হয় বটে, তবে সে ক্ষতি যেন পরোক্ষ ব'লে জনগণের কাছে অনুভূত হয়; কোনোক্রমেই তা যেন তাদের প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকির রূপ ধারণা না করে।

জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। নেতৃত্ব বজায় রাখতে হলে জনতার দ্বারস্থ হতেই হবে।

এ প্রসঙ্গে এই ধারার সমালোচনার একটি উপায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হল বেছে বেছে সমালোচনা বা selective critisim। প্রতিপক্ষ যদি খুবই শক্তিশালী হয়, এবং তার সমর্থক যদি আপনার চেয়ে বেশি বা প্রায় আপনার সমান কিংবা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের (বা দেশের) জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে প্রতিপক্ষ নেতা বা তার নীতি বা উভয়ের সমষ্টি জনগণকে সত্যিকারে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। এই যদি হয় বাস্তবতা, তাহলে প্রতিপক্ষকে ঢালাওভাবে সমালোচনা করাতে বা তাকে মূল্যহীন অঙ্গীকারহীন বলে ঘোষণা করাতে কোনো ফল হওয়া তো দূরের কথা, বরং উল্টো ফলই হবে।

প্রতিপক্ষের নেতৃত্ব বা নীতি যে আকর্ষণীয়, তার সফলতাই তার প্রমাণ। জনগণের চোখে তিনি 'ভালো' এবং 'যোগ্য'। সুতরাং আপনার ভাষায় তাকে 'মন্দ' বা 'অযোগ্য' ব'লে ব্যাখ্যা করলে জনগণ আপনাকেই মিথ্যুক এবং ধোকাবাজ ভাববে—আপনার কথা যতই সত্য হোক না কেন। জনতার কাছে যুক্তির চেয়ে আবেগের আবেদন বড়। তাই এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের কিছু কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভালো কাজকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। এই স্বীকৃতি আপনাকে প্রতিপক্ষের সমর্থকদের কাছে একজন উদার ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রহণযোগ্য ক'রে তুলবে। এরপর প্রতিপক্ষের নেতৃত্বের এবং নীতির মন্দ এবং সম্ভাব্য ক্ষতিকর দিকগুলোকে আপনার ভাষায় ব্যাখ্যা করুন। ব্যাপারটি এমন যেন আপনি আপনার প্রতিপক্ষের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সমর্থন করতে পারছেন না—কারণ, গুণের চেয়ে তার মধ্যে দোষই বেশি।

প্রতিপক্ষকে স্বীকৃতি দিলে জনগণ বুঝতে পারবে যে এতদিন তারা তাকে সমর্থন করেছিল সঙ্গত কারণেই, অর্থাৎ তার 'ভালো' বা কল্যাণমুখী গুণগুলোর জন্যই। অর্থাৎ তারা তখন ভুল করেনি। জনগণকে বুঝতে দেয়া উচিত যে তারা বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছে। এবং এটাও বুঝানো দরকার যে এ মুহূর্তে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন তাদের পক্ষে আরো বুদ্ধিমানের কাজ হবে প্রতিপক্ষকে সমর্থন না করা।

অবশ্য প্রতিপক্ষ যদি অত্যন্ত নগণ্য হয়, তাহলে তার ব্যাপারে (বড় হয়ে) কোনরূপ মন্তব্য না করাই ভাল। তাকে অবহেলায় চুপসে যেতে দিন। আর যদি এমন হয় যে তিনি ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ করছেন, তাহলে অত্যন্ত কৌশলে ব্যাপারটির মোকাবেলা করা দরকার। নেতৃত্বের লড়াই অধ্যায়ে এরূপ অনেক কৌশল নিয়ে আমরা

www.pathagar.com

আলোচনা করব। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ যদি কোনো বিপ্লবী চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক হয়, এবং তার জনসমর্থন যদি এ মুহূর্তে অত্যন্ত কম থাকে, তাহলে সম্ভব হলে সবাই জোট বেঁধে উক্ত "নীতির" বা বিপ্লবী তত্ত্বের এবং নেতার অসারতা এবং ক্ষতিকরতা জনগণের কাছে প্রমাণসহ তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। তবে একেবারে নগণ্য কোনো প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়েও না তাকানোর ভান করাটাই ভালো। দুর্বলকে কেউ কখনো আঘাত করে না। তাকে বুদ্ধির ভুলে একবার আঘাত ক'রে বসলেই জনগণ তাকে শক্তিশালী ভাবতে শুরু করবে। আর রাজনীতিতে জনগণ শক্তিশালীরই পক্ষে।

মোদ্দা কথা, জনগণকে বোকা ঠাওরানো আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

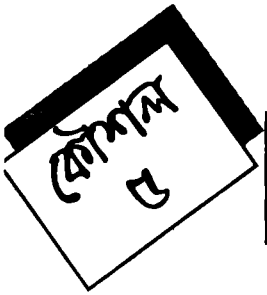

বড় গাছে নাও বাঁধা

(Make alliance with big people)

লোকাল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বে এই কৌশলটির প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। গ্রাম পর্যায়ে এটি মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত অরাজনৈতিক জোট। "দেবে আর নেবের" ভিত্তিতে এই জোট গঠন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত।

ক্ষমতা আর নামডাক (বা সামাজিক মর্যাদা) অনেক সময় একই ব্যক্তিতে নাও মিলতে পারে। অন্য কথায়, যার ক্ষমতা আছে, তার সামাজিক মর্যাদার অভাব থাকতে পারে; আবার যার সামাজিক মর্যাদা আছে, তার ক্ষমতার অভাব থাকতে পারে। যেমন, বার্ট্রান্ড রাসেলের বিশ্লেষণ অনুসারে, ইংল্যান্ডে রাণীর ক্ষমতা নেই, মর্যাদা আছে, এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা আছে, মর্যাদা নেই। ক্ষমতার এবং মর্যাদার উৎস যে-সব ক্ষেত্রে ভিন্ন, সে-সব ক্ষেত্র থেকে যে-সব ব্যক্তিবর্গ উঠে আসেন, তাদের মধ্যে এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সমাজে এরূপ পার্থক্য বিপুলভাবে দেখা যায়। কিন্তু ক্ষমতা এবং মর্যাদার পারস্পরিক সম্বন্ধের সূত্র হল এই যে :

ক্ষমতা মর্যাদা খোঁজে। (Power seeks prestige.)
মর্যাদা ক্ষমতা খোঁজে। (Prestige seeks power.)

ফলে ক্ষমতাবানের সাথে মর্যাদাবানের দ্রুত মিলন সংঘটিত হয়। এই দুইয়ে যখন মিলিত হয়, তখন তাদের সম্মিলিত ফল, আমার পর্যবেক্ষণজাত অভিজ্ঞতা অনুসারে, এরূপ হয় যে, তাদের মধ্যকার মোট ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় : মর্যাদাহীন ক্ষমতাবানের মর্যাদা কিছুটা বৃদ্ধি পায়; এবং ক্ষমতাহীন মর্যাদাবানের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেলেও মর্যাদা কিছুটা কমে। সম্ভবত ক্ষমতাবানের প্রতি জনগণের কিছুটা উঁকিমুখর সন্দেহের কারণে এমনটি হয়। যাহোক, এতে উভয় পক্ষেরই বিপুল লাভ হয়। কিন্তু পরিণামে লাভ বেশি হয় ক্ষমতাবানের। কালক্রমে তিনি পুরোপুরি মর্যাদাবান ব'লে সমাজে গণ্য হন।

ক্ষমতা এবং মর্যাদার এই প্রাথমিক দূরত্বের কারণগুলি একটু তলিয়ে দেখা যাক। লোকসমাজে স্বাভাবিক মর্যাদা ভোগ করেন তারা যারা বংশগতভাবে বিত্তশালী এবং

www.pathagar.com

কুলিন, যারা সৎ এবং উচ্চশিক্ষিত, যারা সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত (যেমন ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, প্রকৌশলী)। এসব ব্যক্তিদের জীবন-যাপন প্রণালী অনেকটা নিরিবিলি গোছের। মর্যাদার কারণে এদের কিছুটা প্রভাব আছে বৈ কি, তবে ক্ষমতা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ঝুট-ঝামেলা এরা পোহাতে চান না। আমাদের সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুসারে, এসব পরিবার থেকে অন্যান্য ক্ষমতাশালীরা মেয়ে বিয়ে করার জন্য বেশি আগ্রহী। কারণ, উপরোক্ত মর্যাদার অধিকারিণী হওয়া ছাড়াও, এসব পরিবারের মেয়েরা সচরাচর শিষ্টাচারিণী, শিক্ষিতা, সুদর্শনা, এবং সংস্কৃতিমনা হয়ে থাকে।

অপরপক্ষে, গ্রামে-গঞ্জে বর্তমানে যারা ক্ষমতাবান, তারা হয় কোনো শ্রমিক সংঘের নেতা, না হয় কোনো জনবহুল পরিবারের বা গোষ্ঠীর সন্তান (লোকসংখ্যা বেশি ব'লে লাঠি বেশি; লাঠি বেশি ব'লে ক্ষমতাও বেশি), না হয় বড় ধরনের ব্যবসায়ী (যাতে কালো টাকার মিশ্রণ আছে কিংবা যে-ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হলে পেশীশক্তির দরকার হয়), না হয় পূর্বের কুখ্যাত অবস্থা থেকে উঠে-আসা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পারিবারিক কৌলিন্যের মর্যাদা এদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ক্ষমতার চ্যানেলের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন। অর্থ-সম্পদ এদেরও আছে। এসব পরিবারের ছেলেদের সাথে ক্ষমতাপিপাসু মর্যাদাবান পরিবারগণ তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে (উল্টোও হতে পারে) তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রয়াস পান। বিপরীতক্রমে, ক্ষমতাবান মর্যাদাপিপাসু পরিবারগণ তাদের ছেলেদেরকে মর্যাদাবান ক্ষমতাপিপাসু এসব পরিবারের মেয়েদের সাথে বিয়ে দিয়ে ধন্য হন। এরূপ ঘটনা সচরাচর একই অঞ্চলের দুই পরিবারের মধ্যে ঘটে।

মর্যাদা ক্ষমতার ভূষণ স্বরূপ।

মর্যাদা ক্ষমতার সংবাদকে অনেক দূর পৌঁছে দেয়। এক কথায়, মর্যাদা ক্ষমতার গ্রহণযোগ্যতা এবং সম্মানযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। এসব কারণে অনেকেই বিশেষ ক'রে বৈবাহিক সম্পর্ক-সূত্রে এভাবে "বড় গাছে নাও বেঁধে" নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রয়াস পান। এর ফলও হয় ইতিবাচক। (অবশ্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য সংঘটিত রাজনৈতিক জোট আমাদের বর্তমান আলোচনার আওতাভুক্ত নয়।)

"বড় গাছে নাও বাঁধার" ভিন্ন ধরনের উদাহরণও আছে। দুই ভিন্ন অঞ্চলের দুই ক্ষমতাবান পরিবারের মধ্যেও এই বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য একই—অধিক ক্ষমতা অর্জন। এসব ক্ষেত্রে ক্ষমতাপিপাসু মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ ক'রে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়, তাকে নিচের সূত্রাকারে প্রকাশ করা যেতে পারে :

www.pathagar.com

ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে চায়। (Power tends to increase.)
ক্ষমতা বেশি বেশি জায়গা দখল করতে চায়।
(Power tends to conquer places.)

ক্ষমতার এই সব চরিত্রের কারণেই তা বিরোধী ক্ষমতার জন্ম দেয়, এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিভিন্ন খণ্ড-ক্ষমতা আবারও সাময়িকভাবে জোট বাঁধতে থাকে। প্রক্রিয়াটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া—কতকটা তরঙ্গ সমন্বিত বৃত্তের মত। এসব ব্যাপারে আমরা পরে আলোচনা করব।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যপূর্ণ নির্যাতনভোগ
(Purposeful undergoing of sufferings)

এটি একটি অত্যন্ত বিচক্ষণতাপূর্ণ কৌশল।

এর প্রতিষ্ঠা জনগণের সহানুভূতিপূর্ণ ভাবাবেগের উপর এবং বিকাশ সফলতার মোহিনী শক্তির উপর।

এই কৌশল প্রয়োগ ক'রে অনেক ছোট হয়েও অনেক সময় অনেক বড়কে কুপোকাত করা যায়। এবং একই সাথে জনতার বিপুল সমর্থনও লাভ করা যায়।

আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সফলতাই সমর্থন অর্জন ক'রে নেয়। অর্থাৎ, সফলতা মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং অবৈধ উপায়ও সফলতার দ্বারা বৈধতাপ্রাপ্ত হয়। যুগ যুগ ধ'রে তাই মানুষের অভিজ্ঞতা বারবার একই সাক্ষ্য দিয়েছে : The end justifies the means। ফলে, বৈধ উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও পরিণাম যদি হয় বিফলতা, তাহলে উক্ত উপায়কেও কেউ অবৈধ ব'লে আখ্যা দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। বিপরীতক্রমে, অবৈধ উপায় অবলম্বন ক'রেও যদি সফলতা আসে, তাহলে উক্ত সফলতাই উক্ত অবৈধ উপায়কে বৈধ ব'লে প্রতিষ্ঠিত করে। কেবল নেতৃত্বের ক্ষেত্রেই এই বিস্ময়কর নীতিটি সত্য।

এই নীতিটি নেতৃত্বের ভূবনে শ্বাশ্বত সত্য।

তবুও নিদারুণভাবে অত্যাচারিত হয়ে এবং বিফলতার দ্বার গোড়ায় পৌঁছে গিয়েও কখনো কখনো সবাইকে আশ্চর্য ক'রে দিয়ে বিপুল সমর্থন লাভ করা যায় এবং এমনকি জয়ী হওয়াও যায়।

তাহলে কি "সফলতা ও উপায়ের বৈধতা" সম্পর্কিত পূর্বোক্ত নীতিটি ভ্রান্ত?

না।

তাহলে?

হ্যাঁ, এই কৌশলটির এই আপাত-বিরোধী ধাঁ-ধাঁ-ই আসল শক্তি। একটু পরেই আমরা এর রহস্য উন্মোচন করব।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। তা হল, "মানবিক সহানুভূতি" এবং "রাজনৈতিক সমর্থন" এক কথা নয়। আমরা একই সময়ে দুই গ্রুপের একটির প্রতি

www.pathagar.com

মানবিক সহানুভূতি দেখাতে পারি, অথচ সমর্থন করতে (বা ভোট দিতে) পারি আরেক গ্রুপকে। বাস্তব সত্য কথা, অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে তথাকথিত "গণ-আদালতের" কর্মকাণ্ড, বিচার, এবং রায় প্রদানকে কেন্দ্র ক'রে জনমনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকেই জনাব আযমকে মানবিক করুণা করেছিলেন, অথচ সমর্থন দিয়েছিলেন গণ-আদালতকে (যারা সমর্থন দেননি আমি তাদের কথা বলছি না।) এর চেয়ে সাড়া জাগিয়েছিল জেনারেল (ভূতপূর্ব) এরশাদের সাজাপ্রাপ্তির ঘটনা এবং কারাভ্যন্তরে তার একাকীত্বের কাহিনী। অধিকাংশ জনগণই ছোট-খাট দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, "এ ধরনের কষ্ট লোকটাকে না দিলেও চলত"। অথচ গত বছরের (১৯৯৬ সালের) নির্বাচনে ঠিক ঐ জনসংখ্যার অধিকাংশই তাকে ভোট দেয়নি।

অন্তত বর্তমান যুগে মানুষ রাজনীতি আর মানবতাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে।

অথচ এই "মানবিক সহানুভূতি" অর্জন করেই একটু বিচক্ষণতা খাটিয়ে এবং ধৈর্যগুণ অবলম্বন ক'রে "সক্রিয় সমর্থন" অর্জন করা সম্ভব। তবে তা বেশি সহজে সম্ভব প্রধানত লোকাল পর্যায়ে, জাতীয় পর্যায়ে নয়।

তাহলে কি এই "মানবিক সহানুভূতি" এবং "সক্রিয় সমর্থন" কার্যত একই মনোভাবের দুইটি ব্যবহারিক রূপ?

অবশ্যই নয়।

এগুলো আবেগের দুটি ধাপ। তবে এদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য এত বেশি যে পরিমাণগত সমতাও এদেরকে এক করতে পারে না। প্রথমটি খাঁটি মানবোচিত; দ্বিতীয়টির সাথে স্বার্থ এবং ভয় মিশ্রিত।

সচরাচর বিপ্লবী মতবাদে এবং ত্যাগপূর্ণ রক্তপাতে বিশ্বাসী কিছু কিছু দল এই কৌশলটিকে বেশি পছন্দ করে। আবার লোকাল পর্যায়ে কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন যারা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমর্থন পাননি অথচ তাদের বিপুল "গোপন শক্তি" আছে। ইচ্ছে করলে তারা এই গোপন শক্তি প্রয়োগ ক'রে স্থানীয় ক্ষমতার বলয় অধিকার করতে পারেন বা অন্য কোনো বড় সম্পত্তির ভোগ-দখল করতে পারেন। কিন্তু আইনের হস্তক্ষেপে পরে তাদের অবস্থা আগের মত বা তার চেয়ে খারাপ হয়ে যাবে—এই আশংকায় তারা পেশীশক্তিকে সরাসরি প্রয়োগ করেন না। তখন তাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে জনগণের সমর্থন আদায়। কারণ তাদের বিশ্বাস, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন নিতে পারলে তারা আইনের চোখে সহজেই ধুলো দিতে পারবেন। রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিই তখন তাদেরকে রক্ষা করবে।

কিন্তু জনগণের সমর্থন তো ছেলের হাতের মোয়া নয় যে হুমকি দিয়ে বা নাকে কেঁদে তা অর্জন ক'রে নেয়া যাবে। তাছাড়া ক্ষমতায় যিনি বর্তমান আছেন তিনি তার সফলতার জন্য এবং কাজের জন্য জনপ্রিয়ও বটে। এমতাবস্থায় তারা জনগণের সমর্থন আদায়ের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রথমে তাদের "মানবিক সহানুভূতি" পাবার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাদের ব্যাপক কর্মসূচিকে তিনটি প্রধান ধারাবাহিক পর্যায়ে ফেলা যায় :

www.pathagar.com

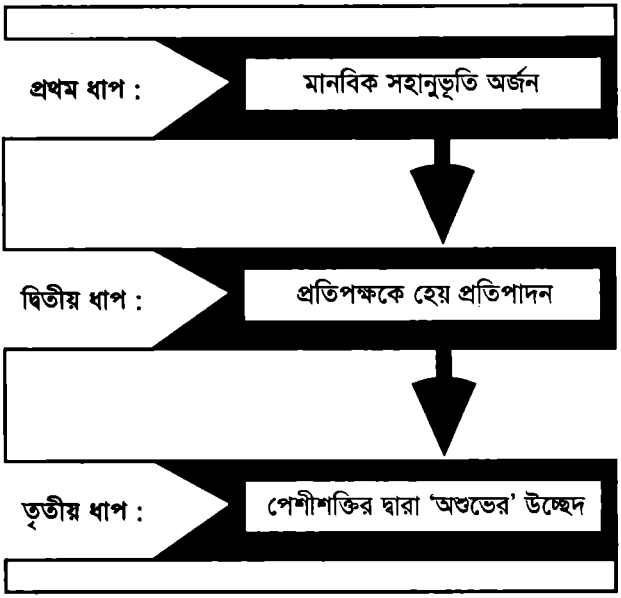

প্রথম ধাপে তারা মনে-প্রাণে চেষ্টা ক'রে "মজলুম" (অত্যাচারিত) সাজেন। ছোট-খাট উস্কানি দ্বারা প্রতিপক্ষকে (কিংবা ক্ষমতাসীন দলকে) উত্যক্ত ক'রে তোলেন। প্রতিপক্ষ যে-আঘাত করেন তা তারা আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা ছাড়াই বুকে পেতে নেন। তাদের উদ্দেশ্য হলো "অদৃশ্য" (অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, যা জনগণ দেখতে বা বুঝতে না পারে) কারণ (অর্থাৎ উস্কানি) সৃষ্টি ক'রে বড় রক্তপাতের ঘটনা ঘটানো এবং প্রকাশ্যে অত্যাচারিত হওয়া। এ পর্যায়ে তারা নিরস্ত্র অবস্থায় অত্যাচারিত হন এবং ডামাডোল পিটিয়ে জনসমক্ষে তা প্রচার এবং প্রদর্শন করেন। এ সবকিছুর উদ্দেশ্য হল জনগণের "মানবিক সহানুভূতি" পাওয়া। তারা সুনামও পান। কারণ, সঠিক সময়ে (জনগণের জন্য) মরতে পারাটাই সুনামের কাজ।

দ্বিতীয় ধাপে তারা সঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়ে আরো কৌশলে অগ্রসর হন এবং অত্যাচারিত হবার ঘটনাটি বারবার ঘটাতে থাকেন। প্রতিপক্ষ কোমলমনা হলেও তাকে আঘাত হানতে বাধ্য করা হয় তীব্র গোপন উস্কানির মাধ্যমে। প্রতিপক্ষকে জঘন্য অত্যাচারী ব'লে চিহ্নিত ক'রে তারা দেখিয়ে দিতে চান যে কুকুরের (অর্থাৎ প্রতিপক্ষের) কামড় হাঁটুর নিচে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে জনগণের ঘৃণার বিষয়বস্তু ক'রে তোলেন। তারা বুদ্ধিমান বটে! কস্মিনকালেও জনগণের কোনো প্রত্যক্ষ ক্ষতির কারণ হন না। কোনো ক্রমে জনগণের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি হলে (যা বাস্তবে হয়ও) তার দায়-দায়িত্ব প্রতিপক্ষের ঘাড়েই কৌশলে চাপিয়ে দেন। এতে জনগণের মন আরো বিষিয়ে যায়। এ পর্যায়ে তারা "লাশের রাজনীতির" আশ্রয় নেন। প্রতিপক্ষ আঘাত না করলেও

www.pathagar.com

অনেক সময় নিজেরাই নিজেদের লোককে খুন ক'রে আইনের চোখে প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেন। অবশ্য আইন অন্ধ নয়। এখানে আইন বড় কথা নয়। বড় কথা হলো জনগণের সামনে প্রতিপক্ষের "মুখোশ" খুলে দেয়া। জনতার হৃদয় এতক্ষণে আবেগে টইটুম্বুর। (অভাগা জনতা!)

তৃতীয় এবং শেষ ধাপে এসে এই "মজলুম" ব্যক্তিগুলো তাদের গোপন শক্তি মাটির গর্ত থেকে বের করে এবং প্রবল প্রতাপে রাতারাতি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে। এই ঘায়েল মানে অধিকাংশ সময়েই প্রাণপাত, কখনো কখনো ধর-পাকড়, উচ্ছেদ, জ্বালানো-পোড়ানো, স্থান বা বাসভবন দখল ইত্যাদি।

তারা এখন জিতে গেছেন!

জনতা এখন তাদের পক্ষে চ'লে এসেছে।

কারণ কী?

এ কারণে নয় যে তারা এতকাল মজলুম ছিলেন, বরং এ কারণে যে তারা এখন জয়ী হয়েছেন। তাদের সফলতাই জনগণের কাছে তাদের উপায়কে বৈধ ব'লে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এবং এ কারণে যে জনগণ আর রক্তপাত চায় না।

এবং এ কারণে যে জনগণ এই প্রাক্তন মজলুমদের জালেমি (অর্থাৎ অত্যাচারী) চেহারা আর দেখতে চায় না। তারা তাদেরকে রীতিমত ভয়ও পায়।

সুতরাং "মানবিক কারণে" জনতার সমর্থন আসেনি, এসেছে মজলুমদের "বিজয়ের" বা "সফলতার" কারণে। আর এই সমর্থনকে আরও আন্তরিক, ঘনিষ্ঠ, এবং মজবুত করার পেছনে ভূমিকা রেখেছে সেই "মানবিক সহানুভূতি।"

এই কৌশলটি মাঝে মাঝে দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক আইনগত সমস্যার সৃষ্টি করে। জাতীয় পর্যায়ে সত্যিকারের স্বৈরাচারী (অর্থাৎ যারা আইনের বেড়া ডিঙিয়ে ঠিক এই কৌশলে ক্ষমতায় এসেছে) সরকারের পতন ঘটাবার জন্য এ কৌশলটি ব্যবহৃত হলে তার সার্থকতা থাকে। তবে লোকাল পর্যায়ে এর কেবল দ্বিতীয় ধাপ পর্যন্ত সবার থেমে যাওয়া উচিত (তাও বিনা রক্তপাতে; তবে আমার কথা কি কেউ শুনবে?)। সবচেয়ে ভালো হয় কৌশলটিকে বড়জোর কাঁদা-ছুড়াছুড়িতে সীমাবদ্ধ রাখা। কারণ, যে যতটুকু পানিতে নামবে, তার ঠিক (কমপক্ষে) ততটুকুই ভিজবে।

তবুও এটাই দুঃখের বিষয় যে—এমনকি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও—এই কথাটি সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে :

The end/Success justifies the means.

www.pathagar.com

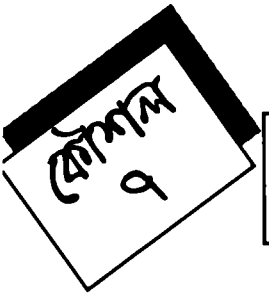

কৌশল ৭

হাতি পড়লেই এক লাথি (Beat the dead horse)

বড় নেতার প্রচণ্ড প্রতাপে ছোট ছোট নেতারা যখন সুবিধা ক'রে উঠতে পারেন না, তখন তারা এরূপ একটি সুযোগ খোঁজেন।

দিন সব সময় সমান যায় না।

হাতিও কাদায় পড়ে। আর হাতি না পড়লে তো ব্যাঙের বা শিয়ালের পক্ষে তাকে চাটি দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং হাতি পড়লেই এক লাথি। ঝোপ বুঝে কোপ আর কি।

কিন্তু হাতিকে আঘাত করার প্রকৃত কারণ কী? প্রতিশোধ? নাকি তাকে দমিয়ে দিয়ে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করা?

কারণ উভয়ই। তবে ফল প্রায়ই হয় দ্বিতীয়টি—অর্থাৎ হাতির প্রভাব ক'মে যাওয়া এবং শিয়ালের আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়া।

লোকাল পর্যায়ে হাতি আইনের তারকাঁটা ডিঙাতে গিয়ে প'ড়ে গেলে, কিংবা উর্ধ্বতন মনিবের সাময়িক রোষানলে পড়লে, কিংবা অন্য কোনো স্থানীয় প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে বা রাজনৈতিকভাবে ঘায়েল হলে, কিংবা নিজের পারিবারিক বা চারিত্রিক ত্রুটির কারণে সামাজিকভাবে কব্জায় পড়লে হাতি অনেক সময় কুপোকাত হয়। এক হাতির এই সাময়িক পতনের কারণে যে সাময়িক শূন্যতার সৃষ্টি হয়, প্রতিপক্ষ বড় হাতি তার সবটুকু পূরণ করতে পারে না। ফলে ছোট-খাট শিয়াল মামাদের জন্যও কিছু স্থান রয়ে যায়। এই সুযোগে শিয়াল মামারা প্রতিপক্ষ বড় হাতির তাবেদারি ক'রে কিংবা নিজেদের বিচক্ষণতার দ্বারা নিজ নিজ প্রভাব এবং আধিপত্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন।

এসব ক্ষেত্রে হাতি যদি কোনো জননিন্দিত কারণে প'ড়ে যায়, তাহলে শিয়াল মামারা বেশি সুবিধা করতে পারেন। অবশ্য প'ড়ে যাওয়াটাই অনেক সময় জনগণের কাছে নিন্দনীয়। অতএব, কারণ যাই হোক, পড়লে হাতির ক্ষতি হবেই। আর হাতির ক্ষতি মানে অন্য কারো লাভ, কারণ ক্ষমতার শূন্যতা দ্রুত পূরণ হয়।

কিন্তু এই লাথির স্বরূপ কী তা জানা দরকার। এর মানেই যে কেবল শারিরীক আঘাত তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচার-প্রচারণাই এই আঘাতের মস্ত বড় হাতিয়ার। এ

www.pathagar.com

প্রচার আনুষ্ঠানিক এবং গুজব-রটানো উভয়ই হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পত্তি দখল যেখানে ক্ষমতার মূল উৎস (এবং প্রয়োগক্ষেত্র), সেখানে উক্ত সম্পদের ভোগ দখলকারী বড় নেতার দুর্বল মুহূর্তে তা দখল করার মাধ্যমেও এরূপ আঘাত করা হয় (চিংড়ি চাষের বিল, চর, অমীমাংসিত ফসলের জমি ইত্যাদি হলো এরূপ সম্পদের উদাহরণ)। অনেক সময় উক্ত বিপন্ন হাতির ঘরে-বাইরে বিভিন্ন ধরনের চক্রান্তের জাল বুনে তাকে দুর্বল ক'রে দেয়ার চেষ্টা করা হয়।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫

নেতৃত্বের লড়াই

www.pathagar.com

এই বইতে আলোচিত সবগুলি কৌশলই নেতৃত্ব বিষয়ক। কিছু কৌশল ব্যবহৃত হয় প্রধানত প্রভাব অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, কিছু কৌশল ব্যবহৃত হয় প্রভাব বৃদ্ধির এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, কিছু কৌশল ব্যবহৃত হয় নেতৃত্বের লড়াইতে জয়ী হবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে, ইত্যাদি। তবে এমনটি বলা যায় না যে এক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কৌশল অন্য কোনো ফল দেয় না বা উদ্দেশ্য সাধন করে না। প্রকৃতপক্ষে এই কৌশলগুলিকে বিভিন্ন অধ্যায়ের অধীনে ভাগ করা হয়েছে আলোচনার সুবিধার জন্য। এগুলো কোনো নেতার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে জড়িত এমন আদৌ নয়; বরং একেক ধরনের কৌশল একেক ধরনের মুহূর্তের জন্য বেশি কার্যকর। সুতরাং এগুলির মধ্যে এই প্রয়োজনে ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে শ্রেণীবিভাগ না করাই ভালো।

এই অধ্যায়ে যে কৌশলগুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলিকে মূলত নেতৃত্বের লড়াইয়ে জয়ী হবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রয়োগ করা হয়। তবে এই কৌশলগুলির ক্ষেত্রেও উপরোক্ত কথাগুলি প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

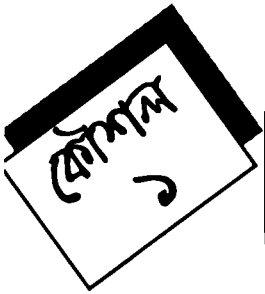

ফাঁকা আওয়াজ (Empty bluster)

কৌশলটি বহুল-ব্যবহৃত। সাংবাদিকদের ভাষায় একে বলে হুমকি। তবে হুমকির চেয়ে এই কথাটির অর্থ আরেকটু সংকীর্ণ। কেউ আত্মহত্যা করার ঘোষণা দিলে তা কারো জন্য হুমকি ব'লে চিহ্নিত হলেও, তাকে ফাঁকা আওয়াজ বলা যায় না।

ফাঁকা আওয়াজ ঠিক ফাঁকা গুলির মত : শব্দটি দ্বারা জানিয়ে দেয়া হল যে আমার কাছে বন্দুক আছে, যদিও আমি এখনও তা তাক করিনি। আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত নই, তবে প্রস্তুতি নিতে আমার বেশি সময় লাগবে না, কারণ আমার সামর্থ্য আছে।

এ প্রসঙ্গে দু'য়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। নেতৃত্বের লড়াইতে প্রথমত সব পক্ষই চায় রক্তপাত, রাষ্ট্রীয় ক্ষতি, বা জনতার হয়রানি এড়াতে। এ কারণে কোনো আপত্তিকর ক্রিয়ার প্রতি প্রত্যেকে প্রথমত মৌখিক প্রতিবাদের মাধ্যমেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তাদের ভাষায়, প্রতিপক্ষ নির্দিষ্ট কোনো কাজ না করলে বা করা থেকে বিরত না থাকলে, তারা কিছু কিছু কর্মসূচি পালনে বাধ্য থাকবেন। এই হল ফাঁকা আওয়াজ। এরূপ আওয়াজ বেশ জোরেসোরেই সৃষ্টি করা হয়, যেন প্রতিপক্ষ (সরকার বা অন্য কোনো দল) এবং জনগণ উভয়ই তা ভালোভাবে শুনতে পায়।

প্রতীক অনশন, মৌন বা বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদিও এরূপ আওয়াজের সাথে সাথে পালিত হতে পারে। তবে বৃহত্তর কর্মসূচী সর্বদা সামনে রেখেই আওয়াজ তোলা হয়, যেন প্রতিপক্ষ উক্ত কর্মসূচীর ভয়ে আগেভাগেই দাবি পূরণের প্রয়াস পান। এই আওয়াজের মূলে সব সময় থাকে এক বা একাধিক দাবি এবং উক্ত দাবি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি (হরতাল, অনশন, বিক্ষোভ, ঘেরাও, ধর্মঘট ইত্যাদি)।

ফাঁকা আওয়াজের প্রধান উদ্দেশ্য দু'টি : অভিযোগটি তদন্ত ক'রে দেখার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিপক্ষকে কিছু সময় দেয়া এবং তার উপর চাপ সৃষ্টি করা, এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগটি সম্বন্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

কৌশলটি নিঃসন্দেহে সকলের জন্য উপকারী, কারণ অধিকতর খারাপ পরিণতি ডেকে আনবে এমন কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনার আগে সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষকে এর মাধ্যমে "হুঁশিয়ার" করা বা "হুমকি" দেয়া হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ফাঁকা গুলিতে সব বাঘ মরে না, কেবল জ্বরাগ্রস্ত অথর্ব দুর্বল-হৃদয় বাঘ ছাড়া। ফলে বিকল্প থাকে দু'টি :

এর পর চুপ হয়ে যাওয়া,
বা ঘোষিত কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া।

চুপ হয়ে যাওয়া মানেই চুপসে যাওয়া। নেতৃত্বের এখানেই মৃত্যু। সুতরাং ধ'রে নেয়া হল যে ফাঁকা আওয়াজ প্রদানকারী ব্যক্তি কর্মসূচি পালনের পথে এগুবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিন ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে :

কোনো না কোনো ভাবে প্রতিপক্ষ কর্মসূচিকে বানচাল করে দিতে পারেন;

প্রতিপক্ষ এসব ব্যাপারকে পুরোপুরি দেখেও না দেখার ভান ক'রে যেতে পারেন। ফলে কর্মসূচি দুর্বল হলে তা অবহেলায় এমনিতেই চুপসে যাবে; এবং

প্রতিপক্ষ দাবি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে মেনে নিয়ে সমস্যাটির একটি সন্তোষজনক সুরাহা করতে পারেন।

শেষোক্ত অবস্থা নিতান্তই সুখকর, বলাই বাহুল্য। তবে অবস্থা যদি প্রথম দু'টির একটি হয়, তাহলে?

জীবন-মরণ সমস্যা এখানেই।

প্রতিপক্ষ জয়ী হলে আপনার নেতৃত্বের নদীতে ভাটা পড়তে বাধ্য।

সুতরাং এক্ষেত্রে নিচের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি মনে রাখতে হবে।

আপনি যা শুনেছেন তা ভুলে গেলেও, আপনি যা শুনিয়েছেন তা কখনো ভুলবেন না।

অর্থাৎ আপনার প্রতি যে-হুমকি দেয়া হয়েছে, তা ভুলে গেলেও আপনার তেমন কোনো ক্ষতি না-ও হতে পারে। তবে আপনি যে-হুমকি অপরকে দিয়েছেন, তা আপনাকে মনে রাখতেই হবে। কারণ, প্রয়োজন হলে উক্ত হুমকিকে সফলভাবে কাজে রূপান্তরিত ক'রে দেখাতে হবে। নইলে ভবিষ্যতের সব হুমকিকেই সবাই অগ্রাহ্য করবে। সুতরাং কর্মসূচী প্রণয়নের আগে ভালোভাবে ভেবে দেখতে হবে প্রয়োজন বোধে উক্ত কর্মসূচি বিজয়ের আগ পর্যন্ত চালিয়ে নেয়ার যোগ্যতা আছে কি-না, এবং উক্ত কর্মসূচি বানচাল করার যে-কোনো প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ ক'রে দেয়ার ক্ষমতা আছে কি না। সব সময়ই মনে রাখতে হবে :

www.pathagar.com

যে কামড়াতে পারে না, তার দাঁত বের করা আদৌ উচিত নয়।

এর পরবর্তী কথা হল এরূপ ক্ষেত্রে আঘাতের (অর্থাৎ হরতাল, ধর্মঘট, ঘেরাও ইত্যাদি) চেয়ে আওয়াজ বেশি দেয়া উচিত। হুট ক'রে হানা আঘাত জনগণের চোখে ভালো নাও দেখাতে পারে। তাছাড়া যত কম কর্মসূচিতে উদ্দেশ্য হাসিল হবে, ততই মঙ্গল। তবে আঘাত যদি করতে হয়, তাহলে তা হতে হবে কার্যকর আঘাত। আঘাত সার্থক হলে পরবর্তীতে শুধু আওয়াজেই অনেক কাজ হবে।

শেষ কথাটি হল আওয়াজের রক্ষণশীলতার নীতি সম্বন্ধে। শেক্সপীয়ারের ভাষায়ই কথাগুলি বলা যাক :

তোমার যা আছে, তার চেয়ে কম প্রকাশ কর।
যতটুকু জানো, তারও চেয়ে কম বলবে।
যতটা ঋণ করেছো, ততটা ধার দিয়ো না।

সুতরাং অপ্রকাশিত ক্ষমতা সব সময়ই কিছু হাতে রাখা চাই। এই ক্ষমতা হল মূলত কৌশল এবং কিছু কিছু সম্ভাব্য কর্মসূচি যা প্রকাশ করা হবে আরো পরে। আরো বড় কথা হল, যে-কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা যাবে না, তা আদৌ ঘোষণা করতে নেই।

মানুষ যেটুকু জানতে পারে, সেটুকুকে সে ভয় পায় না। ভয় পায় সেটুকুকে, যেটুকু সে মনে করে আছে, তবে দেখতে পায় না।

www.pathagar.com

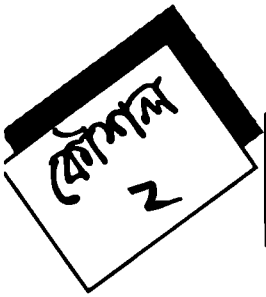

উস্কানির রাজনীতি
(The politics of inducement)

আপনি কি জানেন কে কতভাবে আপনার প্রতি কোন কোন ব্যক্তিকে উস্কে দিচ্ছে?

আধুনিক বিশ্বে এমনকি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও উস্কে দেয়ার এত সব অত্যাধুনিক কৌশল প্রচলিত হয়েছে যে আপনাকে সেগুলোর মূল রহস্য জানতে হবে এবং সেভাবে হিসেব ক'রে সামনের দিকে পা ফেলতে হবে। বর্তমানে কারো বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টি করা আর তার বিরুদ্ধে শত্রু উস্কে দেয়া পারতপক্ষে একই চরিত্র ধারণ করেছে। এখন বিরোধিতাই উস্কানির নামান্তর মাত্র।

বাস্তবে দেখা যায় কোনো নেতা তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উস্কে দেন—

তার নিজের কর্মীদেরকে,
তৃতীয় কোন দলকে, বা
সমর্থক জনগণকে।

এই উস্কানি হতে পারে—

প্রত্যক্ষ, বা
পরোক্ষ।

প্রত্যক্ষ উস্কানির স্বরূপ সচরাচর এরূপ হয় :

"তারা যদি এরূপ হয়রানির সৃষ্টি করে। তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলুন। . . .

"এরূপ গণস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দিতে হবে। . . ."

অন্যদিকে, পরোক্ষ উস্কানিতে কী করতে হবে তা বলা হয় না। অত্যন্ত কৌশলে শ্রোতার মনে আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া গ'ড়ে তোলা হয়। এভাবে—

". . . তাদের এসব কার্যকলাপের সম্পূর্ণ দায়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে।"

". . . আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চাই, তাদের এসব অরাজকতামূলক কার্যকলাপ দেশ ও দশের ব্যাপক অমঙ্গল ডেকে আনবে। . . ."

www.pathagar.com

". . . জনগণ এত বোকা নয় যে তারা এরূপ নাশকতামূলক কার্যকলাপ সহ্য করবে। . . ."

বলা বাহুল্য, এই পরোক্ষ উস্কানির ব্যবহারই বেশি দেখা যায়। এরূপ নৈর্ব্যক্তিক উস্কানির মাধ্যমে উস্কানিদাতা নিজেকে সম্ভাব্য অপ্রিয় ঘটনার দায়ভার থেকে মুক্ত করতে চান। কিন্তু দায়ভার শুধু মৌখিকভাবে অন্যের উপর চাপালেই যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাই ঘটবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবুও এভাবে অনেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে সক্ষম হন।

অনেক সময় এরূপ উস্কানির আরেকটি কদর্য রূপও চোখে পড়ে। জনগণের সামনে অনেকে এভাবে কারো বিরুদ্ধে "নৈতিক" ঔচিত্যের বুলি ফুঁকে দিয়ে ওদিকে আবার নিজেদেরই পোষা গুণ্ডা লেলিয়ে দেন প্রতিপক্ষের উপর। "অপ্রিয় ঘটনার" পর আবার "বিবৃতি" দেন, "'জনগণই' তাদেরকে সমুচিত জবাব দিয়েছে।"

সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ উস্কানি হল পরোক্ষ উস্কানির দ্বিতীয় রূপটি। ভয় বা আতঙ্ক থেকেই রাগের জন্ম। নেতারা এই মনস্তাত্ত্বিক সূত্রটি ভালোই জানেন। তাই তারা সরাসরি উস্কানিমূলক প্ররোচণা না দিয়ে প্রতিপক্ষের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জনমনে ভীতি ছড়িয়ে দেন। এই ভীতি জনতাকে তিলে তিলে উন্মাদ বানিয়ে দেয়। আর এটি তো সবার জানা যে একটি ভয়-পাওয়া কুকুর কামড়াবার জন্য যত আগ্রহী, একটি আত্ম-বিশ্বস্ত কুকুর ততটা নয়। ফলে, ভীত-সন্ত্রস্ত জনতা সুযোগ পেলে দাঁত বসাতে চায়। তারা সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে প্রকৃত বিপদকেই ডেকে আনে।

অবশ্য ব্যাপারটি কখনো একতরফা রূপ ধারণ করে না। উস্কানিরও পাল্টা-উস্কানি আছে। আছে আঘাতের পাল্টা-আঘাত। হিংসার জন্য প্রতিহিংসা। ফলে সৃষ্টি হয় দুটি পক্ষের। উভয় পক্ষই উন্মাদ। তখন যা ঘটে তাকে বলে সত্যিকারের ধ্বংসযজ্ঞ আর কি।

উস্কানির ঠাণ্ডা লড়াই যখন উত্তপ্ত যুদ্ধে রূপ লাভ করে, তখন হয় সেন্টিমেন্ট দ্বিগুণভাবে জ্ব'লে ওঠে, না হয় ঘটনাটি একটি সুরাহার পথে যায়।

সুতরাং উস্কানির মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন বোধে পাল্টা উস্কানি, এড়িয়ে যাওয়া, বা "শান্তিচুক্তি"—এই তিন উপায়ের যে-কোনো একটির বা একাধিকের আশ্রয় নেয়া হয়। অনেক সময় আগে থেকে লেজ গুটিয়ে নেয়া ভীরুতারই নামান্তর। তাই শক্তিশালী দল ঘটনাটি ঘটার সুযোগ দেয়, এবং তারপর পরস্পর একটি সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে। এর মধ্য দিয়েই কেউ রণক্ষেত্রের বিজয় ছিনিয়ে নেয়, কেউবা নিজেদেরকে "নৈতিকভাবে" জয়ী ব'লে ঘোষণা করে।

তবে উভয়ই পরাজিত যতক্ষণ না পর্যন্ত জনগণ তাদের পক্ষে আছে।

www.pathagar.com

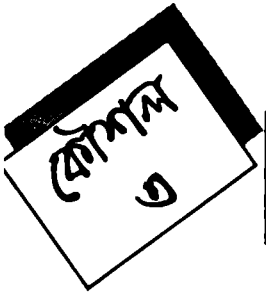

কুকুরকে ব্যস্ত রাখা (Keep the dog busy)

কৌশলটি প্রয়োগ করতে গেলে অনেক বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

কুকুরঅলা বাড়িতে চুরি করতে গেলে চোর একটি সুন্দর কৌশল অবলম্বন করে। সে কুকুরের কামড় এবং ডাক এড়াবার জন্য তাকে কিছু খাবার দেয়। খাবার পেয়ে কুকুর তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সেই সুযোগে চোর তার কাজ সেরে নেয়।

এই কৌশলটিকে লোকাল পর্যায়ে তথা জাতীয় পর্যায়ে কিছু নেতাকে খুব বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করতে দেখা গেছে।

এ কৌশল অনুসারে, প্রতিপক্ষকে কোনো একটি কম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ব্যস্ত রেখে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটিকে অলক্ষ্যে নিজের বাগে আনার চেষ্টা করা হয়। প্রতিপক্ষকে খাওয়াবার জন্য এই ইস্যু-টোপটিকে অনেক সময় কৌশলে সৃষ্টি করা হয়, আবার অনেক সময় এরূপ কোনো ইস্যু নিয়ে প্রতিপক্ষ ব্যস্ত থাকাকালীন তাকে বিভিন্ন কারণ সৃষ্টি ক'রে তার প্রতি আরও আকৃষ্ট ক'রে তোলা হয়। সেই সুযোগে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল ক'রে নেয়ার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় এরূপ ইস্যুর ফাঁদে প্রতিপক্ষকে আটকে রেখে অন্য কোনো বৃহত্তর ইস্যুকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। কৌশলটির অনেক রকমফের থাকতে পারে। নিজের এলাকার ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে এরূপ অনেক বিচিত্র উপায়ের উদাহরণ পাওয়া যাবে।

এ প্রসঙ্গে ছোট একটি গল্প বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এক অঞ্চলে ছিল এক মস্ত ডাকাত। পুলিশ তাকে ধরতে পারত না। না পারত জনগণ তাকে শায়েস্তা করতে। সে করত কি, গ্রামের হাট বারে সবাই যখন বাজার করতে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে হাটে যেত, তখন মাঝপথে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। কুখ্যাতি দ্বারা সে এত বেশি প্রভাব অর্জন করেছিল যে, তার আর কষ্ট ক'রে বাড়ি বাড়ি হামলা করতে হতো না। সে ইচ্ছে করলে এমন ব্যবস্থা করতে পারত যেন লোকেরা তার আস্তানায় গিয়ে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে তার জন্য ভেট দিয়ে আসে। কিন্তু পাছে সবাই তার আস্তানা চিনে ফেলে, এই ভয়ে সে তা করত না। সে এভাবে হাটের দিনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে "ট্যাক্স" আদায় করত। তার রোজগার ভালোই হতো।

এভাবে রাত অব্দি সে ট্যাক্স আদায় করত। হাতে থাকত অস্ত্র। কেউ তার বিরোধিতা করার সাহস পেত না। অবশেষে গভীর রাতে সবাই যখন অবশিষ্ট কিছু

www.pathagar.com

টাকা দিয়ে বাজার ক'রে ফিরত, তখন সে বেছে বেছে ভালো তরি-তরকারিও লুফে নিত।

সবার শেষে হাট ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি ফিরত এক স্বাস্থ্যবান ঝাড়ুদার। ডাকাতটি অস্ত্রের মুখে এ ঝাড়ুদারের পিঠে মাল-জিনিসসহ চড়ে নিরাপদ স্থানে গিয়ে নেমে পড়ত। তারপর সে একা পায়ে হেঁটে তার আস্তানায় চলে যেত।

ঝাড়ুদার দেখল, এ তো মহা সমস্যা। এভাবে প্রতিদিন ঐ মস্ত জোয়ান লোকটিকে বইতে গেলে তো তার অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে। সুতরাং সে একদিন এক ফন্দি আঁটলো। বাজার থেকে কিনলো বড় একটি পাকা কাঁঠাল। আর ওটা মাথায় ক'রে নিয়েই গভীর রাতে কাজ-কাম সেরে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ঐদিন যথারীতি ডাকাতটি ঝাড়ুদারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। ঝাড়ুদার তাকে আপাতত ঐ দিনের জন্য ক্ষমা করতে অনুরোধ করল। অত বড় কাঁঠাল নিয়ে সে ডাকাতকে তার মালামালসহ বইতে কিভাবে? কিন্তু ডাকাত এক গাল দুষ্টু হাসি হেসে বলল, "আজই তো খাঁটি মজা হবে!" কাঁঠালের মোহিনী গন্ধ তার নাকে এবং জিভে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল।

ঝাড়ুদার এটাই চেয়েছিল। সে কাঁঠাল আর ডাকাতকে বয়ে নিয়ে হাঁটছে, আর ডাকাত মনের আনন্দে তার মাথায় বসে কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে। কাঁঠালের স্বাদে সে একেবারে দিশেহারা।

হাঁটতে হাঁটতে ঝাড়ুদার এসে পৌঁছল পার্শ্ববর্তী পুলিশ স্টেশনে। ডাকাত তা মালুমই করতে পারেনি।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও এরূপ কৌশল প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। ইস্যুর কাঁঠাল খাওয়াতে খাওয়াতে প্রতিপক্ষকে কখনো কখনো জননিন্দার চরমে নিয়ে যাওয়া হয়, আবার কখনো কখনো তাকে ওভাবে ব্যস্ত রেখে অন্য কাজ সেরে নেয়া হয়।

বাস্তব উদাহরণ অনেক দেয়া যেত। কিন্তু পাঠক নিজের চারপাশে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে তাকালেই এরূপ উদাহরণ অনেক খুঁজে পাবেন। এ জন্য অধিক আলোচনার লোভ সংবরণ করা গেল।

www.pathagar.com

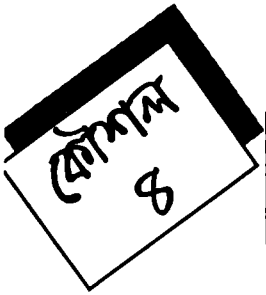

বিভক্ত ক'রে জয় কর (Divide and rule)

এই কৌশলটি সম্ভবত সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এর মূল লক্ষ্য হল "ঘরের শত্রু বিভীষণ" তৈরি করা। কর্মী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি নেতৃত্বের লড়াইতেও এই কৌশলটি অত্যন্ত সার্থকতার সাথে ব্যবহার করা যায়।

There is strength in numbers—অর্থাৎ সংখ্যার মধ্যে শক্তি নিহিত। অন্য কথায়, লোক যার জোর তার। আবার এই লোকেদের মধ্যকার unity বা ঐক্য তাদেরকে আরো শক্তিশালী করে। তাই মানুষের অভিজ্ঞতা এই প্রবাদে সঞ্চিত হয়েছে : Unity is strength—একতাই বল। Divide and rule—কৌশলটির মূল উদ্দেশ্য হল এই numbers বা সংখ্যাকে বিভক্ত ক'রে কমিয়ে দেয়া, এবং একই সাথে unity বা ঐক্যকে বিনষ্ট করা। কৌশলটি সামরিক রাজনৈতিক সকল নেতৃত্বের ক্ষেত্রেই সমানভাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রতিপক্ষ খুব বেশি শক্তিশালী হলে অনেক দিক দিয়েই তার সাথে নেতৃত্বের লড়াইতে জয়ী হওয়া খুব সমস্যাজনক হয়ে দাঁড়ায়। সেরূপ ক্ষেত্রে কৌশলে তার কর্মীমহলে বিরোধের বীজ রোপণ করতে পারলে তাকে সহজে কাবু করা যায়। কৌশলগুলো হল—

- তাদের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো নেতাকে নিজের দলে নিয়ে আসা;
- বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা বা চক্রান্ত দ্বারা বা মুলো দেখিয়ে তাদের নেতাদের বা কর্মীদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী সেন্টিমেন্ট তৈরি ক'রে তাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করা; এবং
- তাদের কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে তাতে ইন্ধন যোগানো।

শেষোক্ত সুযোগটির ব্যবহারই বেশি দেখা যায়। কোনো ব্যাপারে মতপার্থক্য মানুষের মধ্যে থাকবেই। এভাবে সৃষ্টি হতে পারে অন্তর্দ্বন্দ্বের। এভাবে কোনো ছোট খাট ঘটনার। এই ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে তখন বাইরে থেকে প্রতিপক্ষ উক্ত দলের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে দেবার জন্য উক্ত ঘটনার এমন ব্যাখ্যা দেন যেন তা দলটির বিরোধী

www.pathagar.com

গ্রুপের পক্ষে যায়। এই ব্যাখ্যা উক্ত গ্রুপের কানে পৌঁছেও দেয়া হয়। এতে সহানুভূতি, উস্কানি, এবং ইন্ধন পেয়ে অনেক সময় উক্ত গ্রুপ তাদের বিরোধের মাত্রা আরও জোরদার করে, বা এমনকি চিরস্থায়ী বিরোধী জোটেও (faction) পরিণত হয়।

দ্বিতীয় উপায়টির সার্থকতার মূলে সাধারণত আর্থিক উৎকোচই কাজ করে। মানুষের মধ্যে অত্যন্ত অর্থলিপ্সু এবং কপট লোক সব সময়ই কিছু থাকে। তারা টাকার জন্য তাদের নৈতিকতা, ধর্ম, এমনকি দেশও বিক্রি ক'রে দিতে পারে। এই কৌশলটিকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য এসব লোককে ব্যবহার করা হয়।

প্রথম কৌশলটি প্রয়োগ করা হয় প্রতিপক্ষের দলের প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে। লোকাল পর্যায়ে একটি কথা অকাট্য সত্য। তা হল : নীতি নয়, নেতাকে সমর্থন করা। এ কারণে নেতা যখন দল (নীতি) ত্যাগ করে অন্য দলে যান, তখনও তার পক্ষে অধিকাংশ সমর্থকই সমর্থন অব্যাহত রাখে। তা না রাখলে কি নোতুন দলে উক্ত নেতাকে কেউ গ্রহণ করতে চাইত? যাহোক, প্রতিপক্ষের যে-সব নেতা বেশ প্রভাবশালী, তাদের কাউকে কাউকে অনেক সময় বড় পদের বা অন্য সুযোগ সুবিধার লোভ দেখিয়ে লুফে নিতে পারলেই অনেক লাভ। অনেকে তা করেও।

ভাঙন এমন একটি জিনিস যে তা একবার শুরু হলে আর রক্ষে নেই। দল থেকে একজন নেতা ছুট দিলে তার দেখাদেখি অন্যদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ তা করতে পারে। অন্তর্দ্বন্দ্ব একবার শুরু হলে তা অনেক সময় ছোঁয়াচে রোগের মত কাজ করে। (এসব ক্ষেত্রে "নড়া দাঁত পড়া ভাল।" অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ভাঙনের কারণ যে-ব্যক্তি, তাকে অন্যভাবে বাগে আনতে না পারলে সময় থাকতে দল থেকে বিতাড়িত করা ভাল। বিতাড়িত অবস্থায় তার কোনো কর্মকাণ্ডই আর অত বেশি ক্ষতিকর হতে পারবে না।) এ কারণে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে কাউকে অধিষ্ঠিত করার আগে একাধিকবার বিবেচনা ক'রে দেখতে হয়।

www.pathagar.com

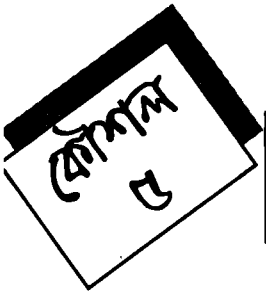

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা
(Fighting fire with fire)

ধরুন আপনি বনের মধ্যে একা বসবাস করছেন। হঠাৎ একদিন বনের ওদিকটায় আগুন ধরে গেল। হু হু ক'রে আগুন আপনার দিকে এগুচ্ছে। বনের গাছপালা সাবাড় ক'রে দিয়ে সর্বভুক আগুন আপনার দিকে এগিয়ে আসছে। সেখানে কোনো দমকল বাহিনী নেই। থাকলেও তাতে আশু কোনো ফল হত কি না সন্দেহ। আপনার পেছনে কিছু দূর গিয়ে সমুদ্র। পালাবার একটাই মাত্র পথ—আগুনের মধ্য দিয়ে উল্টো দৌড়ে। কিন্তু তা তো অসম্ভব। এখন আপনি কী করবেন? কিভাবে আগুন থামাবেন?

বুদ্ধিটি কারো কারো মাথায় এসে গিয়েছে হয়তো। আপনার এখন করণীয় হল আপনার সামনের বনে বিপুলভাবে আগুন ধরিয়ে দেয়া।

"মরব নাকি?" কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন, "যে আগুনে পুড়ে মরব ব'লে ভয় পাচ্ছি, সেই আগুনই নিজের হাতে জ্বালাব?"

হ্যাঁ। এ করা ছাড়া আপনার কোনো উপায় নেই যে।

"মানে দু'মিনিট আগে মরার বুদ্ধি, তাই না?" বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে-পাঠক বইটি পড়ছেন, তিনি হয়তো আমাকে এই প্রশ্নটি করলেন।

না, ঠিক তা নয়। আপনি আগুন জ্বালাবেন বাঁচার জন্য। আগুনের সাথে আপনি লড়াই করবেন কিভাবে? আগুনের সাথে লড়াই করবে আগুন। একজনের কুকুর আপনাকে কামড়াতে এলে আপনিও কি কুকুরটিকে কামড়াবার জন্য খেঁজি মেরে উঠবেন নাকি? বরং আপনার উচিত হবে ঐ কুকুরটিকে পাল্টা ধাওয়া করার জন্য আপনার কুকুরটিকে ছেড়ে দেয়া। নয় কি?

তাহলে আসল ঘটনা হল এই। আগুনটি আপনার দিকে আসছে। এখন আপনি যদি কোনো উপায়ে (আমি জানি না কোন উপায়ে) আপনি আপনার সামনের বনে বিপুলভাবে আগুন লাগিয়ে দিতে পারেন, তাহলে সেই আগুন দৌড়াবে ঐ আগুনের দিকে। কারণ, ঐ আগুনের স্থানে বাতাস গরম হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ওখানে বাতাসের শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে আপনার কাছের বাতাস দৌড়াচ্ছে ঐ আগুনের দিকে শূন্যস্থান পূরণ করতে।

www.pathagar.com

কাজেই আপনি যদি আপনার সামনে আগুন জ্বালেন, তাহলে আপনার আগুন এই বাতাসের ধাক্কায় ঐ আগুনের দিকে ধেয়ে যাবে। এক সময়ে দু'টি আগুন পরস্পর মিলিত হয়ে ওখানেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কারণ সামনে বা পেছনে আর কোনো ধারাবাহিক বন নেই যা আগুনের খাদ্য যোগাবে। খালি মাটির উপর কি আগুন জ্বলে?

নেতৃত্বের ভুবনে অনেক সময় আগুন দিয়ে আগুন নেভানোর এই বুদ্ধির খেলা চলে। সঙ্গত কারণে কেউ যখন প্রতিপক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে প্রচার-প্রচারণা বা কৌশলের মাধ্যমে কাবু করতে পারেন না, কিংবা এসব কৌশল যখন অপর্যাপ্ত মনে হয়, তখন অনেক সময় তিনি এই কৌশলের আশ্রয় নেন। এরূপ ঘটনাকে আমরা ইট দিয়ে ইট ভাঙার বা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ঘটনার সাথেও তুলনা করতে পারি। সোজা কথায়, এ হলো অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ দ্বারা প্রতিপক্ষকে কাবু করার চেষ্টা করা। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, সময়োপযোগী বিচক্ষণতা, প্রয়োজনীয় প্রভাব—ইত্যাদি দ্বারা এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করা যায়।

অনেক সময় জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতির অঙ্গনে এই খেলার মহড়াই দর্শকদেরকে বেশি আকর্ষণ ক'রে থাকে। প্রতি বার নির্বাচনের আগে সব পর্যায়েই নেতৃত্বের এই পরোক্ষ যুদ্ধ দেখা যায়। যুদ্ধবিদ্যায়ও এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার" স্বরূপটিকে বিশ্লেষণ করা যাক। দ্বিতীয় কাঁটাটি আপনার প্রতিপক্ষ—যাকে আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য সামরিক ভাষা অনুযায়ী "শত্রু" বলব। এই কাঁটাটি আপনার পায়ে বিঁধেছে। একে তুলে ফেলতে না পারলে আপনি পূর্ণ শক্তি ফিরে পাচ্ছেন না। এর জন্য আপনার চাই আরেকটি কাঁটা—আমাদের বাক্যের প্রথম "কাঁটা"। এই "কাঁটা" কে হতে পারে? এই কাঁটা হতে পারে—

- আপনার শত্রুর শত্রু;
- আপনার শত্রুর বন্ধু; কিংবা
- আপনার বন্ধু।

সম্পর্কগুলিকে বিশ্লেষণ করার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠার মাধ্যমে এগুলির দিকে তাকানো যাক।

আমরা "← — →" চিহ্ন দ্বারা বিরোধিতার বা "শত্রুতার" সম্পর্ক এবং "→" চিহ্ন দ্বারা "বন্ধুত্বের" সম্পর্ক বুঝাচ্ছি। ধরা যাক (A) এর একজন বন্ধু (C), এবং একজন শত্রু (প্রতিদ্বন্দ্বী) (B) আছে। B-এর দু'জন বন্ধু (E) ও (F) এবং দু'জন শত্রু—(A) এবং (D)। (A)কে বাদ দিলে (B)-এর শত্রু থাকে একজন—(D)। (F) আবার (B) এবং (C) উভয়ের বন্ধু। ধরা যাক (A) সরাসরি (B)-এর সাথে যুদ্ধে নামতে চায় না। সে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চায়। তাহলে কাকে কাকে সে সম্ভাব্য কাঁটা-তোলার-কাঁটা হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে? অর্থাৎ সে কাকে কাকে (B)-এর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগে অনুপ্রাণিত করতে পারবে?

www.pathagar.com

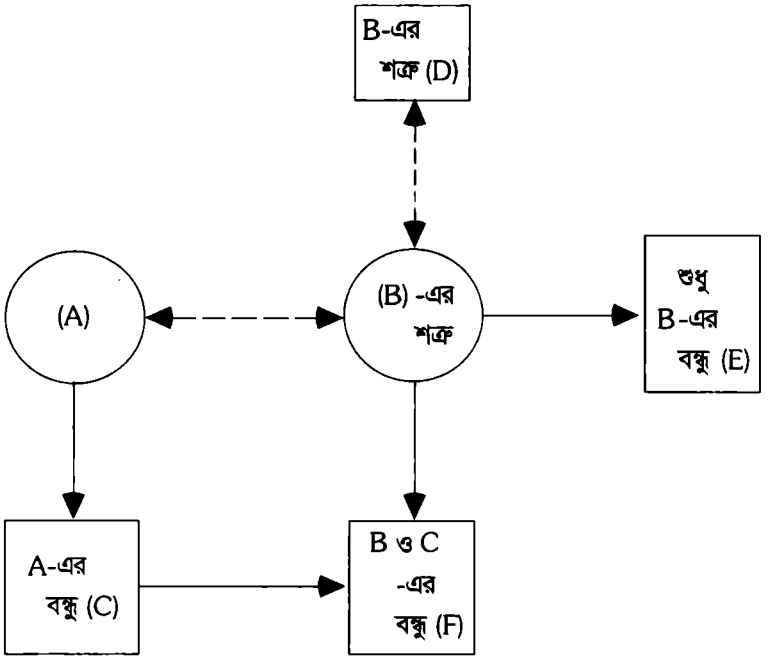

(C) যেহেতু (A)-এর বন্ধু, এবং (C)-এর বন্ধু যেহেতু (F), সেহেতু (C) যদি (F)কে (B)-এর বিরোধিতা করার জন্য, বা অন্তত তাকে সাহায্য না করার জন্য, প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে A-এর একজন সম্ভাব্য "কাজের বন্ধু" (বা কাঁটা-তোলার-কাঁটা) হল (C)। এভাবে (A) যদি (C)কে এবং (C) যদি (F)কে প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে (F) (B)-এর "শত্রু"তে রূপান্তরিত হবে (পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্র দেখুন)।

(D) আগে থেকেই (B)-এর শত্রু। সুতরাং (A) এখন (D)-এর সাথে ভাব জমাতে বা বন্ধুত্ব গ'ড়ে তুলতে পারে তাকে (B)-এর বিরুদ্ধে তার কাজে ব্যবহার করার জন্য।

(E)কে প্রভাবিত করার কোনো উপায় (A)-এর নেই।

(A)-এর সাথে (F)-এর সম্পর্ক আগে থেকে থাক বা না থাক, এখন তা (নোতুন ক'রে) গ'ড়ে তুলতে পারলে তা (B)-কে জব্দ করার কাজে ব্যবহার করা যাবে। অবশ্য (F) বেশি ঘনিষ্ঠ কার—(C)-এর নাকি (B)-এর?—সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

ধরা যাক, উক্ত সবগুলি সম্ভাব্য ব্যক্তিকে (A) কাজে ব্যবহার করতে পারবে। তাহলে (B)-এর কতজন শত্রু এবং (A)-এর কতজন বন্ধু হল নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখা যাক।

www.pathagar.com

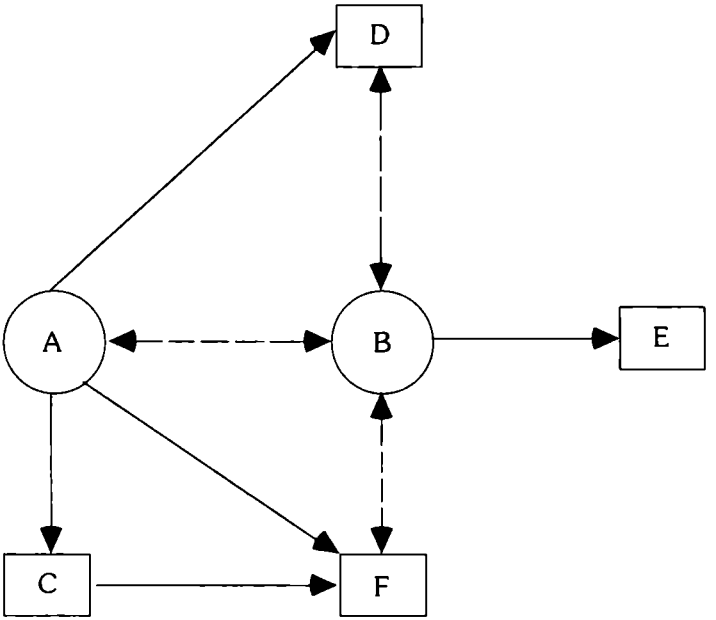

"→" চিহ্ন এবং "←——→" চিহ্নের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, এখন (B)-এর শত্রু ৩ জন, এবং (A)-এর শত্রু ১ জন। অপরপক্ষে, (B)-এর বন্ধু ১ জন (E), এবং (A)-এর বন্ধু ৩ জন (D, C, F)। এখন (A)-এর পক্ষে (B)কে কাবু করা অনেক সুবিধাজনক হবে।

আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, (A) এখন (B)কে কাবু করার জন্য—

- তার (B-এর) শত্রু (D)-এর শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে;
- নিজের (A-এর) বন্ধু (C)-এর মাধ্যমে (এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের মাধ্যমে) তার (B-এর) বন্ধু (F)কে তার শত্রুতে পরিণত করতে পারে; এবং
- সরাসরি নিজে তার বিরোধিতা করতে পারে।

অবশ্য একই সাথে (A)কে তার নিজের শত্রুদের সাথে সাময়িকভাবে ভালো সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করতে হবে।

যারা এভাবে প্রয়োজন মত "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার" পরিকল্পনা রাখেন, তারা সম্ভাব্য এরূপ "কাঁটা-তোলার-কাঁটা"-র বিস্তারিত তথ্য রেকর্ড ক'রে রাখেন। প্রয়োজনে তারা উক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ গ'ড়ে তোলেন।

www.pathagar.com

এই হল "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার" জন্য ব্যবহৃত অনেক নেতার নীল নকশা। এখানে বলে রাখা ভালো যে, এরূপ ক্ষেত্রে কার সাথে বন্ধুত্ব এবং কার সাথে শত্রুতা করতে হবে তা আপনার (বা পার্টির) স্বল্পমেয়াদী (short-term) এবং দীর্ঘমেয়াদী (long-term) লক্ষ্যের আলোকে বিবেচনা করতে হবে। অবশ্য আপনি কোনো পার্টির নেতা হলে এ ব্যাপারে আপনার স্বাধীনতা খুব সীমিত। আর আপনি যদি স্বতন্ত্র কোনো নেতা হন, তাহলে আপনাকে এটুকু বলা যেতে পারে যে, যা করবেন ভবিষ্যতে আপনি যে-লক্ষ্যে পৌঁছতে চান, তার আলোকে তা বিবেচনা ক'রে নিবেন। কোনো সিদ্ধান্ত যেন নিজেরই ঘোষিত মূল নীতির পরিপন্থী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

একটি ছোট উদাহরণ দিয়েই এই কৌশলটির আলোচনা শেষ করছি। নির্বাচনের সময় একই দলের একাধিক নেতার একই আসনের জন্য দাঁড়ানো, কারো ভোট কমানোর জন্য অন্য কাউকে দাঁড়িয়ে দেয়া, কারো সুবিধার জন্য অন্য কাউকে বসিয়ে দেয়া—ইত্যাদি কিন্তু এই কৌশলের প্রয়োগেরই ফলশ্রুতি।

ধরুন আপনার অঞ্চলে আপনার কোনো এক নির্বাচনে বিশেষ একটি পদে প্রার্থী হয়েছেন। আপনি যাদের কাছে প্রিয়, অন্য একজন ব্যক্তি (যিনি আপনার বন্ধুও হতে পারেন এবং রাজনীতির অঙ্গনে সক্রিয় থাকতেও পারেন আবার না-ও থাকতে পারেন) একই শ্রেণীর জনগণের কাছে কম-বেশি প্রিয়। এখন আপনার প্রধান প্রতিপক্ষ যে-শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রিয়, আপনাদের দু'জনের কেউই সেই শ্রেণীর জনগণের কাছে বেশি প্রিয় নন। বিপরীতক্রমে, আপনার প্রধান প্রতিপক্ষও আপনি যে-শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রিয়, তাদের কাছে তেমন প্রিয় নন। ঘটনা যদি এই হয় (যা সচরাচর হয়ে থাকে—ব্যক্তিগত পরিচিতির কারণে, বংশগত কারণে, পেশাগত কারণে, মতাদর্শগত কারণে বা অন্য যে-কোনো কারণে হোক), তাহলে হাজার প্রচার-প্রচারণা চালিয়েও আপনার প্রতিপক্ষ আপনার ভোট বেশি বাগিয়ে নিতে পারবেন না। তাহলে আপনাকে জব্দ করার জন্য তিনি কী করতে পারেন? একটি বড় উপায় হল আপনার উক্ত বন্ধুকে (যিনি আপনার বন্ধু না-ও হতে পারেন) একই পদের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দেয়া। তাহলে আপনার ভোট অবশ্যই কিছু ক'মে যাবে। এক্ষেত্রে আপনার প্রতিপক্ষের কৌশল হল fighting fire with fire, এবং এই কৌশলের ভিত্তি হল Divide and rule।

এই কৌশল শুধু এরূপ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, নেতৃত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ দেখা যায়। ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সময় বিভিন্ন দলের মধ্যে জোট গঠন, কাউকে কারো বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা—ইত্যাদি মূলত এই কৌশলেরই বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক।

www.pathagar.com

কৌশল ৬

অপরের শক্তিকে নিজের কাজে ব্যবহার করা

কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেককেই বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে অপরের যোগ্যতা, শক্তি, সুনাম ইত্যাদি নিজের কাজে ব্যবহার করতে হয়। এরূপ সহযোগিতা অর্জন করতে হয় কখনো বা ভালো সম্পর্কের ভিত্তিতে অনুরোধের মাধ্যমে, কখনো বা কৌশলে কোনো পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উপায়টিই কার্যকর কৌশল, প্রথমটি নয়। নিজের ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে অসহায় অবস্থায় অন্যের সাহায্য চাইলে তখন নেতৃত্বের মৃত্যু ঘটে। একথা সবারই জানা।

তাহলে কিভাবে অন্যের শক্তি ব্যবহার করা যায়? উপায় হল কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাময়িকভাবে কারো সাথে জোট গঠন করা বা কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। কিন্তু এই কাজটি এমনভাবে করতে হবে যেন নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমে পালনীয় দু'টি নীতি হল :

কেবল তখনই কারো সাথে কোনো চুক্তিকে আবদ্ধ হবেন যখন আপনাকে তার দরকার এবং যখন প্রস্তাবটি প্রথমে তার তরফ থেকেই আসবে।
প্রস্তাব পেয়ে প্রথমে "না" বলুন, তারপর আলোচনা শুরু করুন।

এই উপায় অবলম্বন করলে নিজের (এবং দলের) মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব। তৃতীয় কোনো শক্তির আবির্ভাব যদি আপনাদের উভয়ের জন্য একটি হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার মোকাবেলা করার জন্য, কিংবা দলীয় দাঙ্গায় উভয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে থাকলে তা এড়াবার জন্য এই ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যায়।

অনেক সময় শ্রেণী-সংঘাতের কবলে পড়লে টিকে থাকার প্রয়োজনে কিংবা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলেও জোট গঠনের প্রয়োজন হয়। শ্রেণী-সংঘাত বলতে যে শুধু মার্ক্সীয় আর্থ-সামাজিক শ্রেণীকে বুঝতে হবে, তা নয়। শ্রেণীকরণ হতে পারে আদর্শের ব্যবধানের কারণে, মতবাদের মৌলিক পার্থক্যের কারণে, সরকার গঠনের পদ্ধতিগত ব্যাপক পার্থক্যের কারণে, এবং এমনকি ধর্মীয়

www.pathagar.com

বিশ্বাসের অনমনীয় ব্যবধানের কারণে। আমরা বাহ্যিকভাবে শুধু পেশাগত এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনের সম্পর্কগত শ্রেণীভেদই সচেতনভাবে লক্ষ্য করি। এটি কার্ল মার্ক্সের একচেটিয়া ব্যাখ্যারই ফলশ্রুতি। কিন্তু, একটু আগে যেমন বলা হয়েছে, শ্রেণীভেদ আধুনিক যুগে আরো জটিল। এখন "ধর্মের" সাথে "অধর্মের" শ্রেণীভেদ, "ধর্মের" সাথে ভিন্ন ধর্মের শ্রেণীভেদ, নীতিগত মৌলিক পার্থক্যের কারণে শ্রেণীভেদ—ইত্যাদি অনেকটা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, শ্রেণী-সংগ্রামের এখন শুধু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ফলশ্রুতি নয়, এখন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক এবং আদর্শগত ব্যাপারও বটে। ফলে, উদাহরণ স্বরূপ, অনেকে লক্ষ্য না করলেও একথা সত্য যে, আওয়ামী লীগের সমর্থকদের এবং বি.এন.পি.-র সমর্থকদের মধ্যে—সার্বিক বিচারে—একটি জটিল (সরল নয়) মনস্তাত্ত্বিক শ্রেণী-সংগ্রাম লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণী-সংঘাত লক্ষ্য করা যায় জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের এবং তাবলীগ জামাতের অনুসারীদের মধ্যে। শ্রেণী-দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় বামপন্থীদের এবং মৌলবাদীদের মধ্যে। শ্রেণীর ধারণা, অতএব, এখন আরো ব্যাপক এবং অস্পষ্ট। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, একেক ক্ষেত্রে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের প্রাবল্য একেক রকমের। যেমন, জামায়াত এবং তাবলীগের মধ্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ববোধ যত প্রবল, জামায়াত এবং বামপন্থীদের মধ্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ববোধ তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। ফলে, কার্যত, জামায়াত-বামপন্থী শ্রেণী-সংঘাত দাঙ্গার আকার ধারণ করলে, জামায়াত এবং তাবলীগের শ্রেণী-দ্বন্দ্ববোধ কমতে থাকবে এবং তারা প্রয়োজনে একই শ্রেণীর মত আচরণ ক'রে বামদের মোকাবেলা করবে। ধন্যবাদ কার্ল মার্ক্স কে, তিনি মানব-সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে শ্রেণী-সংঘাতের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে প্রথম সক্রিয়ভাবে চিহ্নিত ক'রে আমাদেরকে সমাজ এবং রাজনীতির দিকে তাকাবার একটি নোতুন চোখ উপহার দিয়েছিলেন। তবে বাংলাদেশের মতো জটিল মনস্তত্ত্বের সমাজে শ্রেণীকে কার্ল মার্ক্সের কথা মতো শুধু অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপলেই চলবে না, আরেকটু এগিয়ে যেতে হবে। যাহোক, অন্য কোনোখানে এ ব্যাপারে আরেকটু মৌলিক পর্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। এখন আমরা শুধু এটুকু বলব যে, আপনি যদি দেখেন যে আপনার উপর আপনার শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আক্রমণ মূলত এরূপ কোনো শ্রেণী-সংঘাতের ফল, তাহলে সে-আক্রমণ শুধু আপনার জন্যই ক্ষতিকর নয়, আপনার শ্রেণীর অন্যান্য দল বা নেতার প্রতিও তা হুমকি স্বরূপ। এই হুমকি খুব ভয়াবহ হলে, অর্থাৎ তা কোনো আখেরি মীমাংসার দিকে পরিস্থিতিকে চালিত করতে চাইলে, তখন তার সম্মুখ মোকাবেলা ছাড়া কোনো পথ থাকে না। মনে রাখা দরকার, আঘাত যখন শ্রেণীর উপর আপতিত হয়, তখন ঐ শ্রেণীর সকল দলকেই তা পরিণামে নির্মূল করতে চাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রেণীর অন্তর্গত সবাই মিলে জোট গঠন করার দরকার হতে পারে। আপনার শ্রেণীর অন্তর্গত যে-কোনো দলই আপনার নিকটতম প্রতিবেশি, এবং একথা মনে রাখা দরকার যে :

www.pathagar.com

প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগলে আপনার ঘরটিও ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

এরূপ ক্ষেত্রে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রতিবেশির সাথে জোট বেঁধে চলা যেতে পারে। তবে জোট হওয়া উচিত সাময়িক—কেবল আঘাত ঠেকাবার জন্যই। নইলে জোটের শ্রেণী-চরিত্রের ধারায় মিশে গিয়ে স্বতন্ত্র একটি দল হিসেবে নিজস্ব স্বকীয়তা বিলীন হয়ে যেতে পারে। রাজনীতিতে তা কোনো না কোনো দলের জন্য মৃত্যুর নামান্তর। নিজের আলাদা বৈশিষ্ট্যকে সব সময় বজায় রাখা চাই।

জোট গঠনের বা চুক্তিবদ্ধ হবার বিশেষ প্রয়োজন হতে পারে ক্রস্‌ফায়ারে পড়লে। বিবদমান দুই বা ততোধিক গ্রুপের মধ্যে আকস্মিকভাবে প'ড়ে গেলে অনেক সময় নিজেকে নিরপেক্ষ ব'লে ঘোষণা করলেও কোনো কাজ না-ও হতে পারে। কারণ :

যে-ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত, তার চোখে পার্শ্ববর্তী কেউই নিরপেক্ষ নয়। তাছাড়া আঘাতের উদ্দেশ্য নিয়ে যে-ব্যক্তি হাতে অস্ত্র তুলে নেয়, সে একজন শত্রু খুঁজবেই—এমনকি প্রকৃত শত্রুকে হাতের নাগালে না পেলেও।

ফলে, এরূপ মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে বিবদমান কোনো একটি দলের পক্ষ না নিয়ে পারা যায় না। কারণ, তখন খুব সম্ভবত পক্ষ না নিলে উভয় পক্ষের আঘাতই সহ্য করতে হতে পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় দিক সুচিন্তিতভাবে বিবেচনা ক'রেই পক্ষ নিতে হয়। এই বিবেচনা একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। তা দলের নীতি ও কৌশল, সমর্থকদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, এবং তাৎক্ষণিক মুহূর্তের মিশ্র আলোকে নির্ধারিত হয়। সিদ্ধান্ত এমনভাবে নিতে হয় যেন দলের "ব্যক্তিত্ব" কলংকিত না হয়।

তবে যে-কারণেই জোট গঠন করুন বা চুক্তিবদ্ধ হোন না কেন, সব ক্ষেত্রেই :

মাঝ পথে মিলিত হোন।
(Meet them half-way.)

অর্থাৎ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে একত্র হোন। বিপন্ন অবস্থায় বা প্রয়োজনের সময়ে জোট গঠনকে শীত নির্বাপনের জন্য জ্বালানো আগুনের সাপেক্ষে কারো অবস্থানের সাথে তুলনা করা যায়। সে আগুনের বেশি কাছে গেলে পুড়ে মরার ভয়, আবার তা থেকে বেশি দূরে গেলে ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। জোট গঠনকারী মিত্রদলের সব শর্ত মেনে নেয়া ঠিক নয়। অর্থাৎ কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা চাই। এই দূরত্ব নীতির, উদ্দেশ্যের, কর্মকাণ্ডের। যেমন, জোটের কর্মসূচীতে যোগ দিতে হবে, তবে নিজস্ব দলীয় কর্মসূচিকে বন্ধ রাখা চলবে না। সবার সাধারণ (common) লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ

www.pathagar.com

করতে হবে ঠিকই, তবে তার মধ্য দিয়ে নিজের দলীয় লক্ষ্যের পাল্লা ভারী করার চেষ্টা করতে হবে। জোটের শক্তিকে কৌশলে নিজের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। সফলতার পর (যেমন নির্বাচনে সফলতা, সরকার গঠনে সফলতা, বা গণজাগরণ সৃষ্টির সফলতা) জোটের সার্বিক সফলতার প্রাসঙ্গিক অংশটুকুতে দলীয় কার্যক্রমের কৃতিত্ব আরোপ ক'রে জনগণের সামনে উক্ত জোটের সফলতায় নিজের দলের ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ, চলতে হবে এক সাথে, এক-যোগে, তবে নিজের পায়ে ভর ক'রে। ভিড়ের মধ্যেও নিজেকে স্পষ্ট ক'রে তুলতে হবে। সুতরাং, এক অর্থে, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে চুক্তি মানে এক ধারায় মিশে যাওয়ার জন্য একমত হওয়া নয়, একই লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তিতে পৃথকভাবে চলার জন্য একমত হওয়া (agree to differ)। অন্য কথায়, বন্ধু হবার জন্য চুক্তি নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে থাকার সাথে সাথে শত্রুতার দূরত্ব নিয়ে থাকার ঐকমত্য অর্জনের চুক্তি।

www.pathagar.com

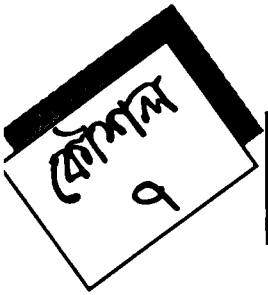

বদনাম এড়ানোর উপায়

বদনাম এড়াবার সবচেয়ে সহজ উপায় হল দোষ না করা—এ হল মহৎ ব্যক্তিদের উপদেশ। কিন্তু innocence is no protection—সরলতা কোনো আত্মরক্ষার কৌশল নয়। দোষ না করেও দোষের বোঝা অনেক সময় বইতে হয়। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একথা সত্য। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবার প্রবণতা নেতৃত্বের ভুবনে চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে। সুতরাং নাম থাকলেই বদনাম থাকবে। মহৎ ব্যক্তিদের কথা মতো বদনাম থেকে দূরে থাকতে হলে নামকে মুছে ফেলা ছাড়া কোনো পথ থাকে না। কিন্তু নাম মুছলেই তো নেতৃত্ব শেষ।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বরং উল্টোটাই সত্য : বদনামকে এড়িয়ে নয়, তাকে কৌশলে ম্যানেজ করার মাধ্যমেই নামকে ঘষে মেজে উজ্জ্বল করতে হবে। দোষ আপনি না করলেও যে-ব্যক্তি দোষ করবে হয়তো সে তা আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিবে, কিংবা অন্য কেউ তা সুযোগ বুঝে আপনার উপর আরোপ করবে।

বদনামের কাদা ছোড়াছুড়িও রীতিমত নেতৃত্বের একটি কৌশল। সুতরাং সবাই সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানে হোক তা প্রয়োগ করবেই। তার ফল কী দাঁড়াবে? যে-দোষ আপনার নয়, তার বোঝাও আপনাকে বইতে হতে পারে। অতএব, আপনাকে কৌশলের দিক থেকে এমনভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন আপনি নিজের ঘাড় ভাঙার আগে দোষ যার বোঝাটিও তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হন।

আবারও বলি : কাজ থাকলে ত্রুটি থাকতেই পারে। কাজের ভুবনে বসবাস করলে নিজের বা অপরের ত্রুটির মুখোমুখি হতেই হবে। নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে কাজের ভুবন। তাই এখানে ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বাভাবিক। তবে **ত্রুটির পানি যেন দোষের** সমুদ্রে না গড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই। আগুন থাকলে ধোঁয়া থাকবেই। প্রতিপক্ষ জনগণকে শুধু আপনার ধোঁয়ার কুণ্ডলীটির দিকে আকৃষ্ট করতে চাইবে। তখন বিমূঢ় হলে চলবে না। জনগণের জন্য যে আপনি আগুন জ্বেলেছেন, তা প্রমাণ করতে পারলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করা যাবে। তখন থেকে জনগণ বুঝতে শুরু করবে, ধোঁয়ার উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে আগুন জ্বালানো হয়েছে।

www.pathagar.com

নেতৃত্বের খেলাটি দর্শক-নির্ভর খেলা। অর্থাৎ এ খেলার মূল উদ্দেশ্য দর্শকের মনোরঞ্জন করা, গোলের সংখ্যা বাড়ানো নয়। ফলে অনেক খেলোয়াড় (অর্থাৎ নেতা) বল নিয়ে খেলার চেয়ে প্লেয়ার নিয়ে খেলা বেশি পছন্দ করে। আর তখনই শুরু হয় কাদা ছোড়াছুড়ি। সবচেয়ে ভালো হয় যদি গোটা দর্শকমণ্ডলী (অর্থাৎ জনগণ)কে নিয়েই খেলা যায়। পুরো গ্যালারিটাকেই খেলার মাঠে রূপান্তরিত করতে পারলে সে খেলায় জয়-পরাজয়ের চেয়ে প্রতিযোগিতাই মূল উপজীব্য হয়ে উঠবে। কিন্তু এ খেলা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ সুযোগ খুব কমই আসে। একথা সবারই জানা যে, কেবল সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল খেলাতেই দর্শকরা খেলোয়াড়দের চেয়েও বেশি আনন্দ পায়। সুতরাং খেলা ষোল আনা জমিয়ে তুলতে গেলে সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এবং এও সত্য যে কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তীর্ণ হতে গেলে নামটিকে ঝকঝকে রাখা চাই। অতএব নেমপ্লেটের উপর থেকে বদনামের মরিচাকে ঘষে-মেজে তুলে ফেলতে হবে।

প্রথমে দেখা যাক কত উপায়ে কারো উপর বদনামের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, অপরের ঘাড়ে দোষ চাপানোর সম্ভাব্য সব ধরনের উপায়ই নেতৃত্বের খেলায় প্রচলিত আছে। এগুলো হল :

- নিজে কোনো দোষ ক'রে ফেললে, এবং তার কারণ চাপা থেকে ফল প্রকাশিত হয়ে পড়লে, তার দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো;
- অন্যের ঘাড়ে চাপানোর উদ্দেশ্যে অলক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে এরূপ দোষ করা, এবং পরে তার ভার অন্যের ঘাড়ে চাপানো;
- তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা অবস্থা দ্বারা সৃষ্ট দোষ কারো ঘাড়ে চাপানো;
- কারো ঘাড়ে চাপানোর সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে কোনো দোষ করার সুযোগ দেয়া বা তা করার ক্ষেত্রে তাকে মৌন সম্মতি দেয়া;
- যার দোষ তার ঘাড়ে চাপানো;
- বিতর্কিত গুণকেও পরিকল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারা দোষ ব'লে ঘোষণা করা;
- ছোট-খাট উপেক্ষণীয় দোষ-ত্রুটিকেও কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে জনগণকে শোনানো;

www.pathagar.com

- কেউ একটি দোষ ক'রে ফেললে যুগ যুগ পরেও তাকে তার জন্য গালি দেয়া;

- কারো যাবতীয় দোষগুলিকে একত্রে জনগণের সামনে তুলে ধ'রে তার গুণগুলিকে পুরোপুরি ধামাচাপা দেয়া;

- কারো উল্লেখযোগ্য গুণকে অস্বীকার করা (যা তাকে দোষী করার চেয়েও তার উপর মারাত্মক আঘাত!);

- কারো সার্থকতা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে তার যোগ্যতাকে অস্বীকার ক'রে উক্ত সার্থকতার পেছনে পারিপার্শ্বিক অবস্থার অবদানকে বড় ক'রে দেখা;

- ব্যাখ্যার দৌরাত্ম্যে যে-কোনো সত্যকে মিথ্যা বানানোর চেষ্টা করা; ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে যে, অপবাদ মৃত্যুর মত সত্য। কেউ তা থামাতে পারে না। আকাশের বৃষ্টি কি কেউ থামাতে পারে? থামাবার চেষ্টা করার দরকারও তো নেই। বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করতেই পারাই যথেষ্ট। অন্তত ছাতা বা রেইনকোটের ব্যবহার তো কঠিন কোনো কাজ নয়।

তবে অপবাদের বৃষ্টি ঠেকানোর জন্য ছাতা যথেষ্ট নয়। সে বৃষ্টির একেকটি ফোঁটা হল একেকটি তীক্ষ্ণধার তীরের মত। ঠেকাবার জন্য ছাতা নয়, ঢালের প্রয়োজন। আর ছাতা ধরার চেয়ে ঢাল ধরা নিঃসন্দেহে বেশি জটিল কাজ। তবে নিজের কাজের দোষের তীর যদি নিজের দিকেই নিক্ষিপ্ত হয়, তাহলে ঢালেও মানায় না। তখন বর্ম পরতে হবে। তাতেও যদি . . . । অত ভয়ের কিছু নেই, দু'একটি তীরের ঘায়ে নেতৃত্বের মৃত্যু হয় না। তাছাড়া, নিন্দার তীর যদি না বিঁধিল বুকে, নেতার কী গুণ আছে বলুন?

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নেতার উপর আরোপিত অপবাদ মূলত দুই ধরনের :

- কোনো অপ্রিয় ঘটনার দোষ (যেমন—খুন, ভাংচুর, সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদি), এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনে অপারগতার দোষ।

উভয় প্রকার দোষের বোঝাই সমান ভারী। সুতরাং দু'দিকেই খেয়াল রাখতে হবে।

www.pathagar.com

কী কী ভাবে দোষ কারো উপর আরোপ করা হয়, তা আমরা দেখেছি। এগুলি থেকেই বুঝা যায় কী কী উপায়ে দোষমুক্ত হবার চেষ্টা করা যায়। ইদানিংকার ঘটনাবলী ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আরোপিত দোষ এড়ানোর চেষ্টা করা হয় প্রধানত দুটি উপায়ে :

- কথার (প্রচারণার) মাধ্যমে, এবং
- কাজের মাধ্যমে।

প্রচারণার মাধ্যমে দোষমুক্ত হবার প্রচেষ্টার আবার কয়েকটি উপায় আছে :

- দোষের অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে (অর্থাৎ প্রতিপক্ষ যাকে দোষ বলছেন, তা আদৌ কোনো দোষ নয়; বরং গুণ। সে-কাজের দ্বারা জনগণ বা দেশবাসী বা এলাকাবাসী উপকৃতই হবে, ক্ষতিগ্রস্ত নয়। এভাবে ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।)

- দোষের গন্ধ গায়ে না মাখা (অর্থাৎ, যা ঘটেছে তা দোষের বটে, তবে আমি/আমরা তার সাথে জড়িত নই। শুধু তাই নয়, আমরা জড়িত ব্যক্তিদের সমুচিত শাস্তি দাবি করি।)

- অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে (অর্থাৎ এ দোষ অমুক ব্যক্তির/দলের। কখনো কখনো প্রমাণ দেয়ারও চেষ্টা করা হয়।)

- অন্য কেউ দোষটি ঘাড়ে চাপাবার আগেই প্রকাশ্য সভায় ঘটনাটির নিন্দা করা এবং জড়িত ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের ক'রে তাদেরকে যথোচিত শাস্তি দেয়ার দাবি জানানো।

- দোষটি ব্যক্তি বা দলের উপর থেকে ঠেলে ফেলে পরিস্থিতির উপর আরোপ করা (দোষটি এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই, সবাই তা ইতিমধ্যে জেনেও ফেলেছে—এরূপ অবস্থায় এই কৌশল প্রয়োগ করা হয়।)

কথার বা প্রচারণার মাধ্যমে দোষ অস্বীকার করার এই উপায়গুলির মধ্যে প্রথম এবং শেষটি সচরাচর ব্যবহার করা হয় নিজের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনে অপারগতার দোষ এড়াবার জন্য।

www.pathagar.com

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রচারণার মাধ্যমে দোষ অস্বীকার করার ব্যাপারটি একমুখী নয়, দ্বিমুখী। কতকটা শিশুদের কাদা ছোড়াছুড়ি খেলার মত—যে একজনের দিকে কাদা ছুড়ছে, তার দিকেও আবার সমানভাবে কাদা ছোড়া হচ্ছে। এসব কিছু সম্ভব হয় এ কারণে যে, জনগণ নিশ্চিতভাবে জানতেই পারে না দোষটি আসলে কে করেছে।

কাজের মাধ্যমে দোষ এড়ানোর উপায় হল . . . ভালো কাজ করা?—হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে আরো আছে। নেতাদের বিরুদ্ধে যে-দোষগুলি বারো মাসই আরোপ করা হয়, সেগুলি হল চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাস, (যা থেকে অন্যান্য মারাত্মক অপরাধেরও জন্ম হয়)। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হল এই যে, এই বদনাম এক নেতাকে আরেক নেতার দেয়ার দরকার হয় না, তা সরাসরি জনগণই দিয়ে থাকে। তাই, জনগণের কাছে ভালো থাকার জন্য তারা ঠিক বিপরীত কাজটি ক'রে থাকেন। তারা মাদক-বিরোধী আন্দোলন, সন্ত্রাস-বিরোধী মোর্চা ইত্যাদি গ'ড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে অবশ্য পুলিশী ভূমিকার বদলে তারা প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেন। সভা-সমিতি, প্রচারণা, প্রতিবাদ মিছিল, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট অভিযোগ পেশ—ইত্যাকার কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে তারা এগিয়ে যান। অবশ্য কখনো কখনো সন্ত্রাসীদের আক্রমণও তাদেরকে সহ্য করতে হয়।

বলুন তো কেন এরূপ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয়? হয়তো বলবেন—সন্ত্রাস দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সাহায্য করার জন্য। ঠিক। তবে এটিই বড় কারণ নয়; বড় কারণ হল শূন্যতা পূরণ করার জন্য।

সন্ত্রাস যখন আমাদের সমাজে আছে, তখন তার বিরোধিতারও প্রয়োজন আছে। এই বিরোধিতার প্রয়োজন একটি পাওয়ার ভ্যাকিউয়াম বা ক্ষমতার শূন্যতা। এই শূন্যতা কোনো নেতা পূরণ না করলে অন্য কোনো নেতা তা পূরণ করবেন কিংবা জনগণের মধ্য থেকে নোতুন কোনো নেতার আবির্ভাব হবে। সৃষ্টি হবে একটি নোতুন প্রতিষ্ঠানের, নোতুন দায়িত্বের, নোতুন পদের এবং ক্ষমতার, নোতুন কর্মকাণ্ডের। অর্থাৎ, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় আরেকজন প্রতিযোগির আবির্ভাব ঘটবে কিংবা কোনো পুরনো প্রতিযোগির ক্ষমতা সম্প্রসারিত হবে। এ কারণে নেতাদেরকে এসব শূন্যতাও পূরণ করতে হয়। নইলে অবাঞ্ছিত লোকের আগমন ঘটবে যে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হল এই যে, যে-সব নেতা নিজেরাই বা নিজেদের লোকজন দ্বারা সন্ত্রাসী কাজকর্ম চালায়, তারাও একই কারণে এরূপ সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। নিজেদের কাজ ঢাকা দেয়ার জন্য এবং একই সাথে বিরোধী ভূমিকায় অন্য কারো অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ নষ্ট করার জন্য তারা আগেভাগেই এরূপ পদ সৃষ্টি ক'রে তা দখল ক'রে বসে থাকে। এসব নেতার তথাকথিত কর্মকাণ্ডের পরও সন্ত্রাস থাকে। নির্মূল হয় না। কেন? কারণ খুব সোজা। সন্ত্রাস না থাকলে তারা দমন করবে কী? দমন করার অজুহাত সৃষ্টি করাই তো তাদের আসল কৌশল। তাদের উদ্দেশ্য হল জনগণের "মঙ্গলের" জন্য কিছু একটি করা। কিন্তু জনগণ যদি ভালো থাকে, তাহলে? তাহলে কোনো উপায়ে তাদেরকে অমঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়ে তারা আবার উদ্ধারের কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামে। গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা আর কি!

www.pathagar.com

সাবধান! এই মেকি নেতৃত্ব জনগণ অচিরেই বুঝে ফেলে। তাছাড়া না-ভাঙ্গা কোনো কিছুকে মেরামত করতে যাওয়া ঠিক নয়। তাতে ভাঙ্গার বদনামটি আপনার ঘাড়েই পড়বে। তবে উক্ত শূন্যতার সৃষ্টি হলে তা পূরণ করা উচিত।

তবে বদনাম এড়াবার সবচেয়ে বড় উপায় হল জয়ী হওয়া। ইচ্ছা থাকলে এবং বিচক্ষণভাবে চলতে পারলে সব সময়ই জয়ী হওয়া যায়।

যুদ্ধে হেরে গেলে নৈতিকভাবে জয়ী হোন।
নৈতিকভাবে হারলে যুদ্ধে জয়ী হোন।

এবং এরূপ জয় ফলাও ক'রে প্রচার করাও চাই। জনগণ সর্বদা জয়লাভকারীর পক্ষে।

অনেক সময় সহনশীলতা অবলম্বন করা সবচেয়ে ভালো। মাছ না পেয়ে যদি কেউ ছিপ কামড়ায় তো কামড়াক। মাছ তো আপনার হাতে। সফলতাই সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ। সুতরাং কাদা ছুড়াছুড়ি থেকে কখনো কখনো দূরে থাকা ভাল। এ প্রসঙ্গে চার্চিলের একটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে, "খারাপ কথা মুখে প্রকাশ না ক'রে কেউ যদি তা গিলে ফেলে, তাহলে কারো পেট খারাপ হয় না।" অনেক সময় নিন্দা ছুড়াছুড়ি থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন আছে বৈ কি।

কথার চেয়ে কাজই জোরে কথা বলে। সুতরাং জনগণকে প্রকৃত কাজ দেখাতে পারা চাই। আপনার উপর চাপিয়ে দেয়া কোনো বদনামই বদনাম নয়, যদি জনগণ তা বিশ্বাস না করে। একইভাবে, নিজের কিছু কিছু ত্রুটি স্বীকার করলেও জনগণের কাছে অনেক সময় বেশি বিশ্বাসযোগ্য হওয়া যায় (অধ্যায়-৮ এর সূত্র-৪ দেখুন)।

পরিশেষে আরেকটি চতুর কৌশলের কথা। যে-দোষ নিজের আছে, অন্যের মধ্যে ঠিক সেই দোষটি ধরতে যাওয়ার চেয়ে বড় বোকামি আর নেই। থুথু উপরের দিকে ফেললে নিজের মুখেই লাগে। যারা কাচের ঘরে বসবাস করে, ঢিল ছুড়াছুড়ি তাদেরকে সাজে না।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৬

পাবলিক মনস্তত্ত্ব

www.pathagar.com

কোনো একটি বিশেষ মানুষকে জানার চেয়ে গোটা মানব জাতিকে জানা অধিকতর সহজ।

—La Rochefoucauld, *Maxims*

আসমান জমিনের অনেক কিছুই মানুষ জানতে পেরেছে, প্রতিনিয়ত আরো অনেক তথ্য জানতে পারছেও। গোটা সৃষ্টি রহস্যের তুলনায় সে জ্ঞান নিতান্ত সামান্য হলেও একথা সত্য যে, যেটুকু জানা যাচ্ছে, সেটুকু মুটামুটি সঠিকভাবে জানা যাচ্ছে, তার ভিত্তিতে অনেক কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা যাচ্ছে, এবং যা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু জীব-জগৎ সহ মানব জাতির প্রতিটি সদস্যের বেলায় বিজ্ঞান যা জেনেছে তা অত্যন্ত নগণ্য। "প্রতিটি জীবের মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।" আর মহাবিশ্বের জটিলতম এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি মানুষের কথা তো বলাই বাহুল্য। মানুষের মন এবং আচরণের ব্যাপারে কিছু কিছু বিষয় জানা গেলেও তার উপর নির্ভর ক'রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। ফলে, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি আজ যে ধরনের আচরণ করেছে, কাল সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি উক্ত একই আচরণ করবে কি না, তা নির্দিষ্ট ক'রে বলা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, একই অবস্থায় একেক জন একেক রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত ক'রে থাকে। সুতরাং মানুষের মনকে ব্যবহারিক সফলতার সাথে জানা এক কথায় এখনও সম্ভব হয়নি, কিছু কিছু চরম (extreme) ক্ষেত্রে ছাড়া। কিন্তু একটি বিশেষ মানুষ সম্বন্ধে জানার চেয়ে এক-গাদা মানুষের সম্মিলিত আচরণ সম্বন্ধে জানা অনেকটা সহজ। আর এটাই আমাদের ভরসা।

জনমনের খুঁটিনাটি সব দিক আমরা ঘাটতে যাব না। এমন কি এও আমরা বলব না যে এই বইতে গণমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যে পর্যবেক্ষণজাত জ্ঞান অর্জন করব তা সত্য হতে বাধ্য। শুধু এটুকু বলা যায় যে, অনেক মানুষ নিয়ে যাদেরকে কারবার করতে হয়, তাদেরকে মানব মন সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে সম্বল ক'রে এগিয়ে যেতে হয়, এবং এ কারণে, ঐ সব জ্ঞানের উপর সাময়িকভাবে আস্থা রেখে কাজ ক'রে যেতে হয়। এবং পরবর্তীতে আরো কোনো কার্যকর ধারণার বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত জ্ঞানকে ঝালাই ক'রে নিতে হয়। এই বইতে গণমনের যে দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলি এই অর্থে কার্যকর; তবে এমনটি আদৌ নয় যে সেগুলি সত্য হতে বাধ্য। যুগ যুগ ধ'রে মানুষ নেতৃত্বের বিষয়ে যে-সব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, এবং তাদের মধ্যে যেগুলিকে বারবার ব্যক্ত হতে দেখা গেছে, সেগুলিকে আপাততভাবে সত্য ধরে নিলে একথা বলা যায় যে, ভবিষ্যতেও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে মানুষের সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়া একই রকম হতে পারে। এই বইতে মানব মন সম্পর্কে এমন কিছু সাধারণীকৃত (generalized) মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এ কারণে এসব পর্যবেক্ষণজাত মন্তব্য নেতার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে সহায়ক হবে ব'লে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

জনতা আবেগপ্রবণ নাকি যুক্তিশীল?

জনতা রাজনীতি এবং নেতৃত্বের প্রতি যে-আচরণ করে তার ভিত্তি কী?—যুক্তি না কি আবেগ? পুরোপুরি সঠিকভাবে জানা সম্ভব না হলেও এই প্রশ্নের ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন উত্তর নেতাদেরকে জানতেই হয়।

আবেগ ছাড়া মানুষ হয় না; মানুষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আবেগের আবহাওয়ার মধ্যেই সংঘটিত হয়। আবার যুক্তি ছাড়াও মানুষ হয় না, তা হলে বস্তুজগতের সাথে মানুষের প্রাত্যহিক নিয়মানুগ সম্পর্ক ব্যাহত হত। ব্যক্তি-মানুষের ক্ষেত্রে একথা পরম সত্য। জনতার ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য, তবে সেক্ষেত্রে যুক্তির উপাদানকে কম এবং আবেগের উপাদানকে বেশি ব'লে মনে হয়। সম্পূর্ণভাবে আবেগপ্রবণ বা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবাদী—এই দু'য়ের কোনো একটি চরমে জনতার অবস্থান নয়। বাস্তবতাকে "নিরপেক্ষভাবে" বিচার-বিশ্লেষণ করলে একথা বুঝা যায়।

মানুষের অনেক যুক্তি নিছক আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং অনেক আবেগ যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ আবেগ আছে, একই সাথে আছে যুক্তি। এ কারণে শুধু আবেগ (emotion) বা শুধু যুক্তি (logic/reason) দ্বারা জনতার আচরণকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই, আলোচনার সুবিধার্থে আমরা দু'টি পদগুচ্ছ ব্যবহার করব :

আবেগনির্ভর যুক্তি (emotional logic) এবং,
যুক্তিনির্ভর আবেগ (logical emotion)।

এই পদগুচ্ছ দুটি দ্বারা জনতার দুটি মানসিক অবস্থাকে বুঝানো হচ্ছে। উভয়ই আবেগ এবং যুক্তির মিশ্র অবস্থা। একটি হল যুক্তি যা আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত; অন্যটি হল আবেগ যা যুক্তির দ্বারা পরিশোধিত।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা আবারও বলে নেয়া দরকার। দুয়ে আর দুয়ে চার—একথা কোনো বিশেষ ব্যক্তি যেমন সত্য ব'লে জানে, তেমনি জানে জনতাও। এ হল খাঁটি যুক্তি। এরূপ ক্ষেত্রে হিসাবের জন্য সবাই একই গাণিতিক পদ্ধতি (যুক্তি) ব্যবহার করবে, সন্দেহ নেই, তবে দুইকে সবাই দুই হিসেবে দেখতে পাবে না; কেউ, ধরা যাক, বাস্তবতাটিকে দেখল তিন আর দুই হিসেবে, আবার কেউবা দেখল তিন আর তিন, যার ফলে একজন যোগ ক'রে পেল পাঁচ, আরেক জন ছয়। যোগ করার ক্ষেত্রে সবার যুক্তি একই, কিন্তু "দেখার" ক্ষেত্রে একেক জন একেক রকমের। এখানে, এই দেখার পেছনে কাজ করে আবেগ, আর যোগের পেছনে যুক্তি। এই যোগের যে ফল হবে, তাকে আমরা বলতে পারি আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তি। অন্তত নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একথা সত্য।

বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ ক'রে বুঝা যায় যে :

www.pathagar.com

ক্ষমতার সম্পর্ক অত্যন্তভাবে আবেগ নির্ভর
(Power relationships are highly emotional)

অর্থাৎ জনতা সচরাচর নেতার প্রতি আবেগনির্ভর মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু এই আবেগকে পূর্ববর্ণিত দুই শাখায় ভাগ করা যায়। এ কারণে আমরা এখন উক্ত দুই ধরনের মিশ্র-আবেগ বা মিশ্র-যুক্তির সাথে পরিচিত হব।

আমরা কাউকে দেখতে ভালো লাগে ব'লে ভালোবাসি, আবার কাউকে আমরা ভালোবাসি ব'লে তাকে আমাদের চোখে সুন্দর দেখায়। কিছু কিছু ব্যক্তিকে বা জিনিসকে যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভালোবাসতে হয়; অন্তত নিজকে বুঝাবার প্রয়োজন হয় যে তাকে ভালোবাসা উচিত। এই যুক্তির ফল হল ভালোবাসা। এখানে যুক্তিকে আবেগ দ্বারা আবৃত ক'রে তাকে এক প্রকার মিশ্র আবেগে পরিণত করার প্রবণতা বর্তমান। এ হল যুক্তিনির্ভর আবেগ। অর্থাৎ এক প্রকারের আবেগ। এই প্রকারের আবেগের বশীভূত হয়ে গেলে উক্ত আবেগের পক্ষে যুক্তিও দাঁড় করানো হয়। এ পর্যায়ে ব্যক্তির মনোভাব হয় এরূপ : আমি তাকে ভালোবাসি, সুতরাং সে সুন্দরী না হয়ে পারে না। এ হল আবেগনির্ভর যুক্তি। অর্থাৎ এক প্রকারের যুক্তি।

নেতার বা দলের প্রতিও জনতার এরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে যুক্তিসঙ্গত কারণে একজন নেতাকে সমর্থন করে। আবার কেউ কেউ অজ্ঞাত কারণে (যা তাদের নিজেদের কাছে অজ্ঞাত) বা স্বার্থগত কারণে যা যুক্তিসঙ্গতও হতে পারে) বা পারিবারিক যোগসূত্রের কারণে বা কোনো ভাবে কোনো আবেগের কবলে প'ড়ে কোনো নেতাকে সমর্থন করে। এবং তাকে সমর্থন করে ব'লেই তার অধিকাংশ কার্যকলাপকে তাদের কাছে যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয়, এমনকি তাকে সমর্থন করার ঘটনাটিকেও যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয়। অবশ্য আমাদের দেশে এমনও অনেক সমর্থক আছে যারা কোনো দল বা নেতাকে সমর্থন করে প্রধানত অন্য কাউকে ঘৃণা করে ব'লেই। অনেক বি.এন.পি. সমর্থককে পাওয়া যায় যারা উক্ত দলকে সমর্থন করে এ কারণে নয় যে তারা তাকে পুরোপুরি পছন্দ করে, বরং এ কারণে যে তারা আওয়ামী লীগকে ঘৃণা করে। ঠিক আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যেও এরূপ কিছু সমর্থক পাওয়া যায়, যদিও অপেক্ষাকৃত কম। এরূপ লোকের সংখ্যা কোনো দলে যত বেশি, ভবিষ্যতে ঐ দলের দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও তত বেশি। কারণ, উক্ত সমর্থকরা তাদের পছন্দসই দল বা নেতা পেয়ে গেলে তখন তারই পক্ষ নেবে; তখন তারা পছন্দ মত দল/নেতাও পাবে, আবার যে-দলকে একেবারে অপছন্দ করে তার বিরুদ্ধেও চেতনার দিক থেকে সক্রিয় থাকবার সুযোগ বজায় রাখতে পারবে। যাহোক, এরূপ মনোভাবের পেছনেও আবেগনির্ভর যুক্তি কিংবা যুক্তিনির্ভর আবেগ কাজ করে।

অপরপক্ষে, জনতা যাকে অপছন্দ করে, তার ভালো কাজ বা কথাকেও তাদের কাছে খারাপ ব'লে মনে হয়। আবেগের কাছে এখানে যুক্তি হার মানে। তারা তখন যুক্তি দিয়ে নিজেদেরকে (এবং অপরকেও) বুঝাতে চেষ্টা করে যে উক্ত "ভালো" কাজ আসলে ভালো নয়। এরূপ যুক্তি আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

এসব ক্ষেত্রে, প্রশ্ন উঠতে পারে, বড় সমস্যা কোনটি?—আবেগ নাকি যুক্তি? যারা আবেগপ্রবণ, তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হল যুক্তি। কারণ, সচরাচর তারা যুক্তি-বিচারকে প্রয়োগ করে আবেগকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এ কারণে নেতৃত্বের সফল প্রচারণায় আবেগ এবং যুক্তি উভয়কে মিশ্রিত করা হয়। শুধু যুক্তি বা শুধু আবেগ খুব কম ক্ষেত্রেই মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা সচরাচর যুক্তির প্রতি এবং অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত লোকেরা সচরাচর আবেগের প্রতি বেশি নমনীয়। এই তথ্যকে সুচিন্তিতভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। অর্থাৎ, কোনো ক্ষেত্রে নেতাকে বেশি আবেদন সৃষ্টি করতে হয় জনতার আবেগের প্রতি, কোনো ক্ষেত্রে যুক্তির প্রতি।

মানুষের আবেগের সুযোগ নেয়া যতটা সহজ, তার যুক্তির সুযোগ নেয়া ততটা সহজ নয়। আপাতভাবে যুক্তির কোনো শেষ নেই; প্রত্যেকেরই নিজ নিজ যুক্তি আছে যার অনেকখানি আবেগ থেকে আসে। ফলে যুক্তি দ্বারা কাউকে আক্রমণ করলে তার আবেগই নিজেকে রক্ষা করার জন্য **ব্যক্তিকেন্দ্রিক যুক্তির** সৃষ্টি করে। ফলে তাকে যুক্তি দিয়ে বশে আনা খুব দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু কারো আবেগ বা যুক্তির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলে তার মধ্যে উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তির চেয়ে আবেগের উদ্রেক হয় বেশি। তখন তাকে সহজে বশে আনা যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, জনতার মন পেতে হলে এই কৌশলগুলি কাজ দিতে পারে :

- যারা সমর্থক তাদের আবেগকে জাগ্রত রেখে তাদেরকে ধ'রে রাখা এবং যুক্তিকে তৃপ্ত ক'রে তাদের সমর্থনকে আরো শক্তিশালী করা, এবং
- যারা প্রতিপক্ষের সমর্থক তাদের আবেগকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং সম্মান দেখিয়ে যুক্তিকে সূক্ষ্মভাবে খণ্ডণ করা।

জনতা কারো শত্রু নয়। প্রত্যেক নেতার জন্যই একমাত্র জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। সুতরাং জনগণের আবেগের বিরোধিতা ক'রে তাদের শত্রুতে পরিণত হবার মত বড় বোকামি আর হতে পারে না। মানুষের আবেগকে অধিকার করতে হলে তার উক্ত আবেগকেই সম্মান দিতে হবে।

মানুষের আবেগকে অধিকার করার সবচেয়ে বড় উপায় হল তাকে তার আবেগের পক্ষে পরিশ্রম করার বা ত্যাগ স্বীকার করার সুযোগ দেয়া। আমরা যখন কোনো কিছু কাউকে করতে দেখি, তখন এক মানুষ, আর যখন তা নিজেরা করি, তখন অন্য মানুষ। এ করণেই আমরা যখন শুধু দর্শক বা মৌখিক সমর্থক বা সমালোচক, তখন আমাদের আবেগের দৃঢ়তা যতটুকু থাকে, তার চেয়ে আমরা যখন খেলোয়াড় বা কর্মী, তখন আমাদের আবেগের দৃঢ়তা থাকে আরো বেশি। কারণ হল, আমাদের সরাসরি কাজের অভিজ্ঞতা অনুভূতিতে এবং আবেগে পরিণত হয়। পরবর্তীতে উক্ত আবেগকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করলে তা আরো মজবুত হয়। এ কারণে যে দল বা নেতা তার সমর্থকদেরকে

www.pathagar.com

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যোগদান নিশ্চিত করতে পারে, সে দল বা নেতা উক্ত জনতাকে সক্রিয়তার দিক থেকে প্রায় কর্মীর পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে। যে-দলের অধিকাংশ সমর্থকই সক্রিয় কর্মী, তার শক্তি যে কত হতে পারে তা চিন্তা করলেই বুঝা যায়।

সুতরাং ভেবে-চিন্তে কৌশল প্রয়োগ করলে সত্যিকারের সফলতা অর্জন করা যায়। তবে একটি কথা অবশ্যই বলার প্রয়োজন বোধ করছি : কৌশল মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হলে পরিণামে তা তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। সত্যিকারের আবেদন জনমনে জাগাতে হলে যাবতীয় ঘঠনাবলীকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কৌশলের কাজ কিন্তু মিথ্যাকে সত্য বানানো নয়, সত্যকেও মিথ্যা বানানো নয়; কৌশলের কাজ হল সত্য এবং বাস্তবতার মধ্যে দূরত্ব কমানো। মেকি উদ্দেশ্যে কৌশল প্রয়োগ করলে বড় জোর দু'দিন ভালো থাকা যায়, তারপর নয়। মানুষের আবেগকে আক্রমণ করার জন্য আমরা কিছু নেতার অশ্রুসিক্ত মুখও দেখেছি, যা দেখে সত্যি সত্যিই অনেক সাধারণ সরল মানুষ ছোঁয়াচে আবেগে আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা পরবর্তীতে উক্ত কান্নাকে মায়াকান্না হিসেবে মনে করল, তারা ঐ সব নেতার প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণ এবং বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। আমাদের দেশেই এরূপ বহু উদাহরণ আমরা দেখেছি, দেখছিও।

জনতার মনের আরেকটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তারা আসলে কী চায় তা তারা ভালোভাবে জানে না, তবে তারা খুব ভালোভাবেই জানে তারা **কী চায় না**। এ কারণে কোনো নেতার ভালো কোনো কাজের প্রতিদানে তার জন্য "ধন্যবাদ মিছিল" বের না হলেও, উক্ত নেতার কোনো আপাত-ক্ষতিকর কাজের প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ গাদা গাদা "প্রতিবাদ মিছিল" বের হয়। সুতরাং নেতার উচিত তিনি যে-"শ্রেণীর" জনগণের সমর্থন আশা করেন, অন্তত তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো কাজ না করা, তাদের পক্ষে চোখ-ধাঁধাঁনো ভালো কাজ করা সম্ভব না হলেও। অর্থাৎ কী করা উচিত তা নির্ধারণ করার আগে নেতার উচিত তার পক্ষে *কী করা উচিত নয়* তা চিহ্নিত ক'রে বিস্তারিতভাবে কাগজে-কলমে লিখে রাখা।

জনতার মনের আরেকটি জটিল বৈশিষ্ট্য হল জড়তা (inertia); অর্থাৎ :

> ***জনগণ সহজে তাদের মন পাল্টাতে চায় না : যে ব্যক্তি যাকে সমর্থন করে, সে ব্যক্তি সাধারণত তাকেই সমর্থন ক'রে যেতে চায়, এবং এ কারণে সে যাকে সমর্থন করে না, তাকে সচরাচর সমর্থন করতে চায় না।***

একথা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তবে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে একথা সত্য। এই বাস্তবতা কোনো নেতার জন্য একই সাথে একটি সুসংবাদ এবং দুঃসংবাদ : সুসংবাদ এ কারণে যে, একথা সত্য হলে তার সমর্থকদের অধিকাংশও সাধারণত তার উপর সমর্থন বহাল রাখতে চাইবে; এবং দুঃসংবাদ এই কারণে যে, একথা যদি সত্য হয়, তাহলে এই মুহূর্তে যারা তার সমর্থক নয়, তাদের সমর্থন পাওয়াও

www.pathagar.com

তার পক্ষে সহজ হবে না। তবে একথা সত্য প্রধানত জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যেখানে জনগণের সাথে নেতার দূরত্ব অত্যন্ত বেশি।

তাহলে কি জনতার মন জয় করার কোনো উপায় নেই?

অবশ্যই আছে। মনে রাখতে হবে যে মানুষ তার মন পাল্টাতে চায় না একটি বিশেষ সীমার মধ্যে থাকার উদ্দেশ্যে। সব কিছুরই একটি গ্রহণযোগ্য সীমা আছে। এই সীমা একেক ব্যক্তির কাছে একেক মাপের। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, মানুষের অপছন্দের যেমন সীমা আছে, তেমনি আছে পছন্দের। আমাদের পছন্দসই কোনো বিষয় যখন ছোট খাট ত্রুটি প্রকাশ করে, তখনও আমরা তার উপর থেকে আমাদের পছন্দ তুলে নেই না। কিন্তু তা যখন ত্রুটিতে আমাদের গ্রহণযোগ্যতার সীমা অতিক্রম করে, তখন আমরা তাকে অপছন্দ করতে শুরু করি। একইভাবে, কোনো কিছুকে আমরা একটি বিশেষ মুহূর্তে অপছন্দ করি এ কারণে যে তা আমাদের পছন্দ-অপছন্দের মধ্যকার সীমা লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু তা যখন তার ত্রুটিকে কমিয়ে এনে আমাদের সীমার মধ্যে আসে, তখন তাকে আমরা পছন্দ করতে শুরু করি; কিংবা আমাদের পছন্দের বিষয়টি যখন অপছন্দের বিষয়টির চেয়ে সীমা বেশি লঙ্ঘন করে, তখন আমরা অপছন্দের জিনিসটিকে পছন্দ করতে শুরু করি। ঠিক এই কারণেই উক্ত কথা সত্য হওয়া সত্ত্বেও মানুষ মত পরিবর্তন করে। মানুষের পছন্দ অপছন্দের এই সব সীমারেখাকে চেষ্টা ক'রে কমানো বা বাড়ানো যায়। যেহেতু কারো প্রতি মানুষের মনোভাব নির্ধারিত হয় তার উপর ভুল ধারণা, তার সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞানের অভাব, তার প্রতি এক-চোখা মনোভাব ইত্যাদি দ্বারা, সেহেতু কাজ এবং প্রচারণার মাধ্যমে এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ ক'রে মানুষের মনকে জয় করা যায়।

www.pathagar.com

জনতা কাকে সমর্থন করবে?

একটু আগে আমরা সংক্ষেপে দেখেছি জনগণ কখন কোনো নেতার উপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে অন্য কাউকে তা উপহার দেয়। কিন্তু এ বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে জনগণ কিভাবে ঠিক করে যে তাদের কাকে সমর্থন করা উচিত। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। তাছাড়া এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে জনমন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালাতে হবে; শুধু ইতিহাস ঘেটে এসব মৌলিক ব্যাপারে কোনো সন্তোষজনক সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তেমন ব্যাপক কর্মসূচী পরিচালনা করা এই লেখকের পক্ষে আর্থিক কারণে তো বটেই, উপরন্তু জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেও দুঃসাধ্য। তবে স্বল্প পরিসরে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যে জবাব পাওয়া গেছে তা এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপ এবং সরল ভাষায় বর্ণনা করার চেষ্টা করা হবে, যেহেতু বিষয়টির বিস্তারিত বিশ্লেষণের জায়গা এই বইতে নেই।

আমাদের দেশের মানুষ সচরাচর কয়েকটি মানদণ্ড দ্বারা নির্ধারণ করে কোন নেতাকে বা দলকে তারা সমর্থন করবে। তারা নেতা বা দল নির্বাচন করে প্রধানত :

ব্যক্তিত্বপ্রীতি দ্বারা তাড়িত হয়ে;
মতবাদগত মিল দ্বারা;
স্বজনপ্রীতি দ্বারা তাড়িত হয়ে;
স্থানগত সান্নিধ্যের দ্বারা;
আর্থিক স্বার্থোদ্ধারের জন্য;
ধর্মবোধ দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে; এবং
পেশাগত ঐক্যের দ্বারা।

মূলত এই মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সবার মধ্যেই বিদ্যমান। তবুও সবাই একই নেতাকে বা নীতিকে (দলকে) সমর্থন করে না কেন? এ প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত জটিল। তবে অত্যন্ত মৌলিক এবং সরল পর্যায়ের কিছু কারণ আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

প্রত্যেকের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আছে বটে, তবে একেক ব্যক্তির মধ্যে একেকটি বৈশিষ্ট্যের প্রবলতা বেশি, যা সময় শিক্ষা অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ইত্যাদির সাথে বদলাতে পারে।

আমরা প্রথমত "পেশাগত ঐক্য" এবং "আর্থিক স্বার্থ" এই দুটি বিষয়কে বাদ দিয়ে বাকি পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। ধরা যাক ব্যক্তি (A)-এর মধ্যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। বিষয়টিকে এভাবে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায় :

www.pathagar.com

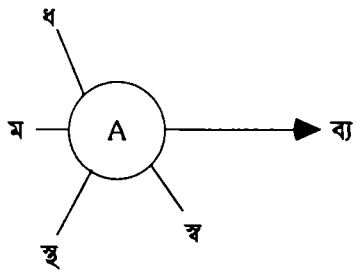

সংকেত :

ধ : ধর্মবোধ
ব্য : ব্যক্তিত্বপ্রীতি
ম : মতবাদগত মিল
স্থ : স্থানিক সান্নিধ্য বা অঞ্চলপ্রীতি
স্ব : স্বজনপ্রীতি

ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে (A)-এর মধ্যে সবচেয়ে প্রবল হল ব্যক্তিপ্রীতি। ধরা যাক সে বঙ্গবন্ধুর বা শহীদ জিয়ার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ব'লেই আওয়ামী লীগের বা বি.এন.পি.-র সমর্থক। তার মধ্যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা সত্ত্বেও সে অন্তত রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বপ্রীতি দ্বারা তাড়িত। এ হল নেতৃপ্রীতি, দলপ্রীতি বা পার্টীপ্রীতি নয়। এ কারণে উক্ত দলে উক্ত নেতা না থাকলে সে ঐ দলকে আর সমর্থন করতে চাইবে না। কিন্তু দলটি যদি হয় উক্ত নেতারই প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁর মতবাদ বা আদর্শ হয় সে দলের চালিকা শক্তি বা নীতিমালা, তাহলে উক্ত নেতার অবর্তমানেও ব্যক্তি (A) তাঁর দলকে সমর্থন করতে চাইবে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বপ্রীতির উত্তরণ ঘটে মতবাদপ্রীতিতে, যা অপেক্ষাকৃত বেশি স্থায়ী।

আবার ধরা যাক তার মধ্যে ধর্মপ্রীতিও বেশ প্রবল (উপরের চিত্রে যেমন দেখা যাচ্ছে)। তাহলে সে এখন কী করবে? ধর্মকে সামনে রেখে যে-নেতা বা যে-দল রাজনীতি করছে তাকে সমর্থন করবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে যে, ধর্মবোধ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে প্রবল, অনেক প্রবল। তবে তাদের অধিকাংশই ধর্মের অনুপ্রেরণা দ্বারা তাড়িত হয়ে তাদের রাজনৈতিক গন্তব্য নির্ধারণ করে না। অধিকাংশ মানুষ ধর্মবোধকে তাদের নিজস্ব সত্তার আবশ্যিক একটি বোধ ব'লে মনে করে। এ কারণে ধর্মবোধ একটি "গুপ্তবোধ"। এ প্রধানত তখনই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যখন কেউ তাতে আঘাত করে। আঘাত পেলে এই গুপ্তবোধটি জেগে উঠে অন্যান্য বোধকে অতিক্রম ক'রে যায়, এবং তখন ব্যক্তি তার ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা খুঁজে

www.pathagar.com

পাবার জন্য ধর্মকে ব্যাপক সামাজিক শক্তির ভিত্তির উপর স্থাপন করতে চায়। ফলে সে ধর্মের দ্বারা তার রাজনৈতিক গতি নির্ধারণ করে। ধর্মের উপর আঘাত না পড়লে বা তার প্রতি কেউ নাক না শিটকালে মানুষ স্বভাবত তার ধর্মবোধকে রাজনীতির ভূবনে প্রকাশ করে না, গুপ্ত রাখতে চায়।

ধর্মের বোধ হল মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক প্রশান্তিবোধ। তাকে মানুষ শান্তির মধ্যে উপলব্ধি করতে চায়। এ কারণে ধর্মীয় তৃপ্তি অবাধে এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে মেটাতে পারলে মানুষ তাতেই বেশি আনন্দ পায়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা কখনো কখনো এমন হয়ে যেতে পারে যখন সে ধর্মরক্ষাকে আত্মরক্ষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করে। আর ধর্ম তখনই রাজনৈতিক অঙ্গনে উঠে আসে।

পাশাপাশি একাধিক ধর্মের অবস্থানও ধর্মবোধকে প্রবলতর করতে পারে, এমনকি তা রীতিমত সাম্প্রদায়িকতাবাদে রূপ নিতে পারে। পরিস্থিতির উস্কানি, নিজের এবং অন্যের ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা, ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অপারগতা ইত্যাদি কারণে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবুও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ধর্ম যদি যথাযথ নিরাপত্তা পায় (এবং শুধু তাই নয়, আন্তরিক উৎসাহও পায়), তাহলে তা সচরাচর রাজনীতির অঙ্গন থেকে দূরে থাকতে চায়।

তবে বিভিন্ন কারণে যাদের মনে ধর্মবোধ আর সামাজিক রাজনৈতিক চেতনা প্রবলতা লাভ ক'রে একে অপরের সাথে এক হয়ে মিশে গেছে, তারা ধর্মকেই সকল রাজনৈতিক তথা সামাজিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হিসেবে মনে করে।

আমরা আবারও (A)-এর মনের "চেতনার মানচিত্রে" ফিরে যাই। দেখা যাচ্ছে যে তার মধ্যে স্থানপ্রীতি বেশ প্রবল, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে যা থাকে। এ অবস্থায় সে কী করবে? তার ব্যক্তিত্বপ্রীতির কাছে নতি স্বীকার করবে, নাকি স্থানপ্রীতির কাছে? সচরাচর দেখা যায়, সে তার প্রিয় ব্যক্তিত্বের বা দলের সমর্থক কোনো নেতা যদি তার নিজের অঞ্চলে থাকে, তাহলে তাকেই সমর্থন করতে চাইবে। তবে ঐ দল যদি তার অঞ্চলে তেমন প্রাধান্য না পায়, এবং ঐ দল সমর্থন করার কারণে বা অন্য কোনো কারণে যদি তার সামাজিক মর্যাদা বা জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে, এবং স্থানীয় কোনো জোটের সাথে সম্পৃক্ত থেকে বা ঐ স্থানে যে-ব্যক্তি বা যে-দল আইনানুগভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে, তাকে সাময়িকভাবে সমর্থন ক'রে সে যদি ঐ ঝুঁকি এড়াতে পারে ব'লে মনে করে, তাহলে সে আপাতত তাই করতে চাইবে। এই সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবতা থেকে নেয়া; যদি লেখকের পর্যবেক্ষণে এবং ব্যাখ্যায় কোনো ভুল না থাকে, তাহলে এটাই হল বাস্তবতা।

এভাবে যার মধ্যে যে-বৈশিষ্ট্যটি প্রবল, সে সচরাচর তা অনুসারে নেতা বা দল বেছে নেয়।

মতাদর্শগত মৌলিক পার্থক্য মানুষকে গোড়া থেকে আলাদা ক'রে দেয়। অধিকাংশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বিষয়টিই তাদের রাজনৈতিক সমর্থনকে সবচেয়ে আগে নির্ধারণ

www.pathagar.com

করে। যেমন কমিউনিজমের কথাই ধরা যাক। মহান নেতা কার্ল মার্ক্স এবং লেনিনের কথা সাধারণ মানুষকে মুটামুটি বিস্তারিতভাবে বেশ কিছু লোককে শুনিয়ে দেখেছি। তাদের মতাদর্শের ব্যাপারে তাদের প্রথম আপত্তি হল তাদের "ধর্মহীনতা" এবং ধর্মবিরুদ্ধতা। তাদেরও যে ধর্ম ছিল তা তাদেরকে বললে তারা বলে যে, সে-ধর্ম এক ধরনের "আহনী-ধর্ম" বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম; তা বস্তুর ধর্মের মত, মানুষের হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার নেই। ধর্মের জন্য মানুষের মনে আলাদা জায়গা চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে—সে ধর্ম যা-ই হোক। ধর্মভীরু জনগণের ধর্মের ব্যাপারে শুধু নিরপেক্ষ থাকলেই তারা খুশি নয়, সে ধর্মকে স্বীকৃতি দিতে হবে, রীতিমত সম্মান দিতে হবে। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি, অনেক জানা-শোনা লোক কমিউনিজমের কয়েক জন নেতার ভূয়সী প্রশংসা করেছে; শুধু তাই নয়, তারা বলেছে যে তারা নেতা হিসেবে মার্ক্স এবং লেনিনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তবুও তারা কমিউনিজমের সমর্থক নয়। তাঁদের ব্যক্তিত্বে তারা মুগ্ধ, তাঁদের চিন্তা দ্বারাও তারা প্রভাবিত। অথচ তাঁদেরকে রাজনৈতিক সমর্থন দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ হল ধর্মের প্রতি কমিউনিজমের অনীহা। কমিউনিজমের এই সমস্যা অনুধাবন করে নোবেল বিজয়ী কমিউনিস্টপন্থী নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ' তার ৭০তম জন্মবার্ষিকীতে বলেছিলেন, "আমাদেরকে ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে।"

কমিউনিজমের প্রতি এদেশের মানুষের দ্বিতীয় প্রধান আপত্তি হল সব কিছুর রাষ্ট্রীয় মালিকানা। একে মানুষ ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর সরাসরি সবচেয়ে বড় হস্তক্ষেপ ব'লে মনে করে।

যাহোক, এসব সমস্যার কারণে, ব্যক্তিত্বকে ভালো লাগলেও এদেশের মানুষের কাছে কমিউনিজমের "নীতি" ভালো লাগেনি। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, মতাদর্শগত মৌলিক পার্থক্য মানুষকে গোড়া থেকেই পৃথক ক'রে দেয়। তখন এভাবে পৃথগীকৃত জনগণের এক শ্রেণীর সাথে অন্য শ্রেণী সামাজিকভাবে তাল মিলিয়ে চললেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুব বেছে বেছে চলে, যা শেক্সপীয়রের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করা চলে :

> "আমি তোমার সাথে কেনাকাটা করব, আলাপ করব, চলা-ফেরা করব; কিন্তু আমি তোমার সাথে খাওয়া-দাওয়া করব না, অনুষ্ঠানে মজবো না, প্রার্থনা করব না।"
>
> — শাইলক, *মার্চেন্ট অব ভেনিস*

এই মনোভাব আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায়।

কিন্তু, উদাহরণস্বরূপ, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনগণের সামনে যখন গণতন্ত্র লালনকারী একাধিক দল বর্তমান থাকে, তখন তারা দল বেছে নেয় প্রধানত নেতাপ্রীতির ভিত্তিতে, কিংবা কোনো দলের বিশেষ কোনো নীতির প্রতি ঘোর অপ্রীতির ভিত্তিতে, যা আমরা

www.pathagar.com

আগেই কিছুটা আলোচনা করেছি। তবে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে অঞ্চলপ্রীতি, নেতাপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি ফ্যাক্টরগুলি বেশ কার্যকর থাকে।

অঞ্চলপ্রীতির স্বরূপ খুব সরল। অধিকাংশ মানুষই নিজ নিজ অঞ্চলের সমৃদ্ধি কামনা করে। মেডিকেল কলেজটি, বা ব্রিজটি, বা প্রস্তাবিত হাসপাতালটি ঐ অঞ্চলে না হয়ে আমার গ্রামে বা অঞ্চলে হোক—এটাই অধিকাংশ লোকের কামনা। এ ধরনের অভাব দীর্ঘকাল ধ'রে জনগণ অনুভব করতে থাকলে, তাদেরকে কোনো নেতা যদি ঐ অভাবকে ইস্যু ক'রে আন্দোলনে আহ্বান করে, তাহলে তারা তাতে আগ্রহের সাথে সাড়া দেয়। দুই অঞ্চলের মধ্যে যখন কোনো খেলা হয়, তখন প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবেই প্রত্যেকে যার যার অঞ্চলের দলকে সমর্থন করে। এভাবে প্রতিযোগিতার মুহূর্তে অঞ্চলপ্রীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আঞ্চলিক পর্যায়ের নির্বাচনে দুই গ্রাম বা মহল্লা থেকে একই পদের জন্য দুজন ব্যক্তি প্রার্থী হলে, একই কারণে, অঞ্চলপ্রীতির আশীর্বাদে প্রত্যেকেই কিছু বিশেষ ভোট পাবে, যা সে অন্য গ্রামের বা মহল্লার প্রার্থী হলে পেত না।

মতবাদপ্রীতি বা জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিত্বপ্রীতি সচরাচর অঞ্চলপ্রীতিকে অতিক্রম করে যায়। সেক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের "অবহেলিত" অঞ্চলের পক্ষে সংগ্রাম করলেও তা সচরাচর করতে চায় উক্ত নেতারই অধীনে যাকে তারা সমর্থন করে। আর যদি উক্ত নেতা বা দলই ক্ষমতাসীন থাকেন, তাহলে তারা সচরাচর সংগ্রামের বদলে "দাবি" জানায়। অবশ্য দাবি পূরণ না হলে বা পূরণের আশ্বাস না দেয়া হলে তখন একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়, যা প্রতিপক্ষ এসে পূরণ করতে চায়।

কিন্তু দুদিন আন্দোলন ক'রেই যদি কারো দাবি পূরণ হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে দাবি পূরণ করার মূল উদ্দেশ্য (সংগ্রামের সার্থকতা জনগণকে অনুভব করতে সুযোগ দেয়া, তাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করা, ইত্যাদি) সফল হয় না। আবার "ন্যায্য" দাবির প্রতি অনির্দিষ্টকালের জন্য উদাসীন থাকলেও সমর্থন চ'লে যাবে অন্য কোনো নেতা বা দলের প্রতি। অতএব, কোনো দাবির প্রতি কতদিন উদাসীন থাকতে হবে, প্রতিজ্ঞার মূল্যে দেখিয়ে তাকে কতদিন ঝুলিয়ে রাখতে হবে, এবং কিভাবে তা পূরণ করতে হবে—ধীরে ধীরে নাকি এক সাথে—তা নির্ভর করে ঐ দাবির গুরুত্বের উপর। এরূপ করতেই হয়, কারণ পাবলিক মনস্তত্ত্ব এরকমই। নেপোলিয়ন এমনকি কোনো সমস্যার প্রতিও এক প্রকার "মাপা উদাসীনতা" দেখাতেন। তিনি কোনো অঞ্চল থেকে কোনো চিঠি পেলে তা তিন দিন পর্যন্ত খুলতেন না, এই আশায় যে হয়তো সমস্যাটি এর মধ্যেই সমাধান হয়ে যাবে। জনগণ সম্পর্কিত অনেক টুকরো সমস্যা আপনা থেকেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। কিন্তু বেশি দিন কোনো সমস্যা স্থায়িত্ব লাভ করলে তার প্রতি আর উদাসীনতা দেখানো চলে না।

অবশ্য অঞ্চলপ্রীতি সম্প্রদায়িকতার রূপও নিতে পারে। কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেদের অধিকাংশই যদি একটি অঞ্চল জুড়ে থাকে, তাহলে তাদের অঞ্চলপ্রীতি আর সম্প্রদায়িকতা মিলেমিশে একাকার হয়ে অনেক সময় বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসে পরিণত হতে পারে। উল্লেখ্য, সামাজিক রীতি-নীতিগত মৌলিক পার্থক্যও কোনো ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন ক'রে তুলতে পারে, বর্ণগত

www.pathagar.com

জন্মগত বা ধর্মগত পার্থক্য তো দূরের কথা। সম্প্রদায়প্রীতি (Ethnicity) মানুষের স্বভাব। এই সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলির মধ্যে একটি হল divide and rule : তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে কৌশলে ছড়িয়ে দেয়া, কিংবা একই অঞ্চলে তাদেরকে থাকতে দিয়ে তাদের মধ্যে বাহ্যিক সামাজিক রীতি-নীতি মূল্যবোধ মতবাদ ইত্যাদির বীজ রোপণ করা।

মানুষ তার নিজের পেশাকে সমাজে স্বীকৃত অবস্থায় দেখতে চায়। এ কারণে, সচরাচর নিম্ন সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন পেশার কর্মীরা, উক্ত উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের পেশাগত নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য, একই পেশার অন্যান্য কর্মীদের সাথে নিরাপত্তামূলক এবং উন্নয়নমূলক জোট গঠন করতে গিয়ে এক প্রকার গভীর "সামাজিক আত্মীয়তার" বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একে আমরা বলতে পারি পেশাপ্রীতি। এই পেশাপ্রীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ সচরাচর তার নিজের পেশার মধ্য থেকে উদ্ভূত কোনো নেতাকে সমর্থন করতে চায়। অবশ্য মানুষের এই মনোভাব সচরাচর নেতৃত্বের আঞ্চলিক পর্যায়ে বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেশি স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। এ কারণে, কোনো নেতা বা দল "বাইরে" থেকে এসব জনগণের মন জয় করার চেষ্টা ক'রে বেশি ফল পায় না। ফলে, তাকে এরূপ পেশার গণ্ডির মধ্যে তাদেরই একজনকে নেতা হিসেবে সামনে রেখে ঐ নেতাকে জয় করার মাধ্যমে ঐ পেশার অন্যান্য লোকেদের মন জয় করার প্রয়োজন হয়। এই সত্য সবারই জানা, যার কারণে, উদাহরণ স্বরূপ, আমরা সার্বিক অর্থে "আওয়ামী লীগ" ব'লে যা বুঝি, তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রতি পেশার সংকীর্ণ অঙ্গনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাম নিয়ে। যেমন :

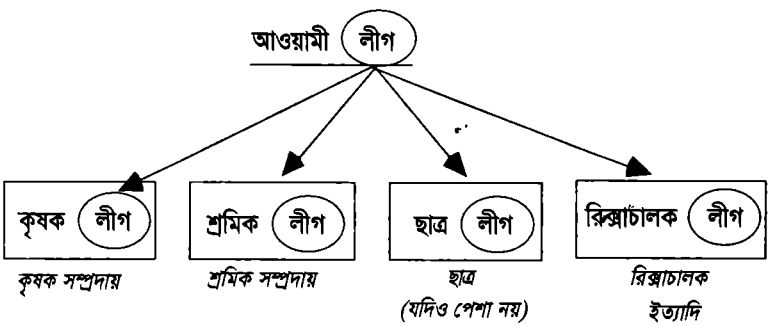

ছাত্রলীগ, যুবলীগ ইত্যাদি মূলত মানুষের বয়সের পর্যায়গত মানসিক সংকীর্ণতার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সৃষ্ট হয়েছে। সচরাচর যুবকরা যুবককে এবং ছাত্ররা ছাত্রকে সমর্থন করতে চায়। বৃদ্ধকেও, একই কারণে, একবার ছিল-মোহর দিয়ে মার্কা মেরে দিলে, শুধু

www.pathagar.com

বৃদ্ধরা ছাড়া আর কেউ সমর্থন করবে না। তাছাড়া সম্ভবত বৃদ্ধদেরকে ঠেলে পরপারে পাঠানোর জন্যই আমরা সবাই বেশি ব্যস্ত, যার কারণে আমরা এখনও পর্যন্ত "বৃদ্ধলীগ" নামের কোনো বিভাজন পাইনি। অবশ্য বর্তমানে ভিক্ষুকদেরও "পেশাগত (?)" জোট গঠিত হয়েছে। ক্রমে ক্রমে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাদেরকে রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে সামাজিক মর্যাদাও দিতে হতে পারে। আর কিছু না হোক, তাদের শক্তিকে "ব্যবহার" করার জন্য তাদেরকে "মদদ্" দেয়ার মত নেতারও আবির্ভাব হতে পারে। ফলে, বিভাজনের সূত্র আমাদেরকে এই হুঁশিয়ারি দিচ্ছে যে, ভবিষ্যতে হয়তো এ ধরণের উপ-দলও আমাদের সামনে জন্মলাভ করতে পারে : জাতীয়তাবাদী বৃদ্ধ দল/ আওয়ামী বৃদ্ধ লীগ, জাতীয়তাবাদী ভিক্ষুক দল/ আওয়ামী ভিক্ষুক লীগ, নির্যাতিত নারী দল/ লীগ, পিতৃ পরিচয়হীন পথকলি/ টোকাই পার্টি, সাহিত্যিক লীগ, কবি দল, এইচ, এস, সি/ এস, এস, সি ছাত্রলীগ/ছাত্রদল, মধ্যবিত্ত গণ পার্টির জাতীয় গৃহিনী পার্টী, বাংলাদেশ মডেল ইউনিয়ন . . . ইত্যাদি ইত্যাদি। শেখার বিষয় হল এই যে, এরূপ বিভাজন সেগুলি না হলেও বাংলাদেশে এখনই আছে—পুরোপুরি আছে—এবং প্রত্যেকের গ্রুপের রাজনৈতিক মূল্যও আছে; শুধু যা নেই তা হল উক্ত লেবেলগুলো। মানুষের এই "বিভাজন প্রবণতা" কে কিভাবে কাজে লাগাতে হয় তা সবার জানা; তবুও অধ্যায়-৮ এর সূত্র-৩ এ নিয়ে আমরা আরেকটু স্পষ্টভাবে আলোচনা করব।

জনগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার জন্যও কোনো দলকে সমর্থন করে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি শ্রেণীচরিত্র থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেকে কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনগণের সমর্থন বেশি পায়। এর কারণ হল ক্ষমতায় গেলে অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ সেক্টরে বিশেষ নীতি অনুসরণ ক'রে দেশ পরিচালনা করা হবে—দলটির এই নীতিগত ঘোষণা। এসব ঘোষণা থেকে জনগণ সহজে বুঝে নেয় ঐ দল ক্ষমতায় গেলে কোন কোন পেশার লোকেরা বেশি সুযোগ সুবিধা পাবে। ফলে দলটি সম্ভাব্য সুবিধা ভোগীদের মধ্যে অনেকের সমর্থন লাভ করে। এ হল মূলত কোনো দলের বাজেট নীতির ফল।

কিন্তু ব্যাপক অর্থে এরূপ অর্থনৈতিক বা উন্নয়নধর্মী নীতি গ্রাম পর্যায়ের মানুষের মধ্যে তেমন উদ্দীপনা জাগাতে পারে না। তারা না বোঝে অর্থনীতি, না বোঝে জাতীয় উন্নয়ন। তারা শুধু বোঝে কৃষির ক্ষেত্রে তারা কী সুবিধা পেল বা পাবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম কোন পর্যায়ে অবস্থান করল তাই। শুধু তাই নয়, কোন দল ক্ষমতায় গেলে এসব ক্ষেত্রে কোন নীতি গ্রহণ করবে তা তারা সহজে বুঝতে পারে না, শুনেও অতটা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ ভিতের উপর দূরদৃষ্টিকে দাঁড় করায়। যেমন, তাদের ভাষায়, "শেখ সাহেবের আমলে লবনের দাম কত ছিল তা তো আমরা জানি। সুতরাং আওয়ামী লীগকে আর ভোট?" "জিয়ার আমলে চাল খেতে পারতাম না, আটা খেতে হত। বি. এন. পি.-কে আর ভোট দেয়া যাবে না।" অর্থাৎ তারা কেন ভোট দিবে তা তেমন স্পষ্টভাবে না জানলেও, ভোট কেন দিবে না তা খুব ভালোভাবে জানে। তাদের যুক্তি নেতিবাচক : বেছে বেছে গ্রহণ করার চেয়ে বেছে বেছে বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে তারা বেশি জুত পায়।

www.pathagar.com

অবশ্য বর্তমানে অবস্থা একেবারে এতটা হাস্যকর নয়। সৌভাগ্যের (?) বিষয় এই যে, এসব মানদণ্ড দ্বারা এখন আর জনগণ কাকে ভোট দিতে হবে তা ঠিক করে না। জনগণের মধ্যে এখন দুটি প্রীতি বেশি কার্যকর—দলপ্রীতি এবং ব্যক্তিত্বপ্রীতি।

তবে, বিশেষ ক'রে আঞ্চলিক পর্যায়ের নির্বাচনে, এবং কখনো কখনো সংসদীয় নির্বাচনেও, জনগণকে কেউ কেউ কাঁচা টাকা খাওয়ায়। জনগণ এত সৎ নয় যে ভোটের বিনিময়ে টাকা খাবে না; আবার জনগণ এত বোকা নয় যে যার টাকা খাবে তাকেই ভোট দেবে। মানুষ মনে করে, রাজনীতির সাথে শুধু তাদের পেট জড়িত নয় যে শুধু পয়সা পেলে তৃপ্তি আসবে; তারা মনে করে, রাজনীতির সাথে তাদের গোটা জাতীয় ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদা এবং আরো অনেক কিছু জড়িত। এ কারণে, একেবারে নিঃস্ব এবং ব্যক্তিত্বহীন কিছু মানুষ ছাড়া টাকা খেয়ে কেউ ভোট দেয় না। এমনকি টাকার বিনিময়ে যারা কারো পক্ষে প্রচার চালায়, তারাও সবাই তাকে ভোট দেয় কি না সন্দেহ। টাকা শুধু মানুষের শ্রম কিনতে পারে, মন নয়।

তবে টাকা খেয়ে ভোট দেয়ার প্রবণতা লোকাল নির্বাচনে যত, জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে আদৌ ততটা নয়।

পাবলিক মনস্তত্ত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, কিছু কিছু জনগণ কোনো নেতার বা দলের কর্মী-বহর দেখে তার পক্ষে জনসমর্থন কেমন বা উক্ত নেতা বা দল কত জনপ্রিয় তা মাপতে চায়। অর্থাৎ, তারা মনে করে, যে-দলের কর্মীসংখ্যা যত বেশি, সে দল তত জনপ্রিয়। জনগণের মনস্তত্ত্বের এই দিকটি নেতাদের ভালোভাবে জানা আছে, যার কারণে তারা যথাসময়ে "গণপ্রদর্শনী"র আয়োজন করেন।

সত্য যে, কর্মীসংখ্যার সাথে সমর্থকের সংখ্যার বা জনপ্রিয়তার সম্পর্ক আছে। তবে জনগণের বেশ কিছু অংশ এই ধারনায় বিশ্বাস করে না। তবে, নিঃসন্দেহে, প্রচার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। সাংগঠনিক তৎপরতা এবং কর্মীদের আন্তরিক সক্রিয়তা জনগণকে মুগ্ধ করে। এ কারণে কর্মীসংখ্যার এবং "গণপ্রদর্শনের" সাথে দলের বা নেতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির একটি যোগসূত্র আছে।

তবে এ প্রসঙ্গে জনগণের মনস্তত্ত্বের আরেকটি বিশেষ দিক উল্লেখ কারার মত। বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন না হলে জনগণ জানে না তাদেরকে কী করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে কেবল "বাতাস কোন দিকে বয়" তা বুঝেই অনেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এ কারণে নির্বাচনের কয়েক মাস আগে বিশেষজ্ঞরা নির্বাচনের ফল সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বানী করেন, তা নির্বাচনের পর ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আসলে নির্বাচন যত কাছাকাছি আসতে থাকে, মানুষ তত আবেগপ্রবণ এবং অনুকরণপ্রিয় হতে থাকে। অনেকে, উদাহরণ স্বরূপ, তাদের "মূল্যবান ভোটকে" "নষ্ট" হতে না দেয়ার উদ্দেশ্যে ঠিক ভোটের আগের দিন বা ভোটের দিন তাকেই ভোট দেবে ব'লে টিক করে যার পক্ষে ভোট বেশি পড়বে ব'লে তারা মনে করে। ভোটের সময় জনগণ নিজেদের মতামতের চেয়ে ব্যালটটিকে বেশি মূল্যবান মনে করে। মানুষের এই "ব্যালটপ্রীতি" অনেকাংশে

www.pathagar.com

ভবিষ্যদ্বাণীর উর্ধ্বে। অতএব এ কারণেও কোনো নেতার বা দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক "গণপ্রদর্শনীর" প্রয়োজন আছে।

লোকাল পলিটিক্সে স্বজনপ্রীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এসব ক্ষেত্রে জনগণ সচরাচর তাকে সমর্থন করতে বা ভোট দিতে চায় যার সাথে তাদের রক্তের সম্পর্ক আছে বা যে তাদের সাথে কোনো ভাবে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। আত্মীয়তার এই টান ভোটারকে বা সমর্থককে অনেক দূর (অর্থাৎ আত্মীয়তার দূরত্ব) থেকেও টেনে আনতে পারে।

পরিশেষে আবারও বলতেই হয়, জনতার মনস্তত্ত্ব এক জটিল এবং পরিবর্তনশীল যে এই ক্ষুদ্র পরিসরে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এবং বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবে এই বইয়ের বিভিন্ন কৌশলের আলোচনাতেও মূলত জনতার মানসিক অন্যান্য দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যা এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে পড়লে আলোচনাকে আরো অর্থপূর্ণ মনে হতে পারে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৭

দল পরিচালনা এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ কর্মী ব্যবস্থাপনা

www.pathagar.com

জনতার নেতৃত্ব দেয়া আর এক গ্রুপ নেতা-কর্মী পরিচালনা, এক কথা নয়। এ দুয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এ কারণে জনগণকে যে-কৌশলে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করতে হয়, কর্মীদের কাজের স্পৃহা (motivation) এবং মনোবল (morale) বৃদ্ধি করার কাজে সে কৌশল প্রয়োগ করা যায় না। জনগণ কর্মীদেরকে নেতারই অখণ্ড অংশ ব'লে মনে করে। ফলে, কর্মীদের যে-কোনো কাজকে তারা নেতার সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি ব'লে মনে করে। এ কারণে কর্মীদেরকে হতে হয় প্রশিক্ষিত।

কর্মীরা একটি প্রাতিষ্ঠানিক (এখানে দল বা সুসংবদ্ধ গ্রুপ হল একটি প্রতিষ্ঠান) কাঠামোর মধ্যে কাজ করে। ফলে তাদের মধ্যেও পাওয়ার পলিটিক্স বা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। তাদের যাবতীয় আচার-আচরণের প্রধান দায়-দায়িত্ব যেহেতু নেতাকে বহন করতে হয়, সেহেতু তাদের কেউ কেউ স্বভাবগত বা উদ্দেশ্যগত কারণে বা বাহ্যিক উস্কানি পেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বহীন আচরণ ক'রে ফেলতে পারে, যার কারণে জনতার সামনে নেতার বা দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে। সত্য কথা যে :

জনগণ হল নেতার সর্বময় ক্ষমতার উৎস, কিন্তু কর্মীরা হল তার ক্ষমতার মূল হাতিয়ার। হাতিয়ারের ভুল বা অসাবধানতাজনিত ব্যবহার দলের এবং নেতৃত্বের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

তাছাড়া হাতিয়ার বে-হাত হয়েও যেতে পারে। আবার কর্মীদের কর্মোস্পৃহার এবং মনোবলের সাথে তাদের সামাজিক মর্যাদা, প্রত্যক্ষ আর্থিক স্বার্থ, এবং সমাজে প্রভাবশালী ব'লে চিহ্নিত হবার বাসনা জড়িত। তাদের এসব প্রয়োজন মেটাতে না পারলে জনগণের দেয়া ক্ষমতা ঠিকমত কাজে লাগানো যাবে না। আবার তাদের শেষ দুটি প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তাদেরকে জনগণের দেয়া ক্ষমতা জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অনুমতি দিলে (যা অনেকেই দিয়ে থাকে বৈ কি) দূর ভবিষ্যতে (long term-এ) ক্ষমতা হারাতেও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি কতদিন নেতা হিসেবে টিকে থাকবেন তা নির্ভর করবে দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কতটা তৎপর তার উপর।

কর্মীদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা হল এক অংশে ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনা। সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক দায়িত্ব দেয়া, কাজ তদারকি করা, প্রশিক্ষণ দেয়া, দলের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা—ইত্যাদি হল ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত। ধ'রে নেয়া হচ্ছে যে পাঠক এসব বিষয় এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। এ কারণে কর্মী পরিচালনার যে-সব দিকের সাথে প্রধানত রাজনৈতিক উপাদান বেশি জড়িত, এই বইতে সে সব দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই দিকগুলি মূলত বেশি পরিমাণে নেতাসুলভ বিচক্ষণতা দাবি করে ব'লে এগুলিকে প্রাধান্য দেয়া হল। মূলত এই কৌশলগুলিতেই রয়েছে দল পরিচালনার গূঢ় পলিটিক্স যা কেবল উচ্চশিক্ষিত এবং বিচক্ষণ নেতারাই সফলভাবে প্রয়োগ ক'রে থাকেন।

www.pathagar.com

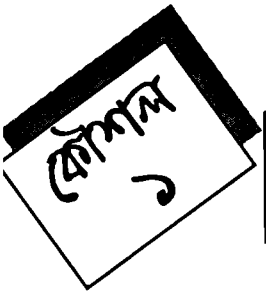

আনুগত্যের দ্বারা নেতৃত্ব দান (Leading by following)

এটি মূলত নেতৃত্বের কোনো কৌশল নয়, এ হল কর্মী ব্যবস্থাপনার এবং প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের আবশ্যকীয় মূলনীতি। এই নীতিকে অস্বীকার করলে কখনোই অন্যের আনুগত্য লাভ করা সম্ভব নয়; কোনো দিন তা সম্ভব হয়ওনি। অন্যান্য অনেক কৌশলকে অবজ্ঞা ক'রে কেবল এই নীতিতে অটল থাকলেও নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব, এবং, বিপরীতক্রমে, এ কথা অকাট্য সত্য যে, এই নীতিটিকে লঙ্ঘন ক'রে বাকি সবগুলি কৌশল অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও এমনকি অল্প সময়ের জন্যও নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখা যায় না।

নীতিটির মূল কথা হল : আপনি যদি চান যে আপনার অধীনস্থ কর্মীরা আপনার অনুগত থাক, তাহলে আপনাকেও আপনি যার অধীন তার নিকট পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

শুধু তাই নয়, তা প্রকাশ্যেই করতে হবে। অর্থাৎ, আপনার অনুগতরা যেন জানে যে আপনি আপনার বসের (boss) প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

শুধু তাই নয়, বসের অবর্তমানে অধীনস্থ কর্মীদেরকে জানাতেও হবে যে আপনি তাকে অত্যন্ত সম্মান করেন। এবং ভালোবাসেন।

শুধু তাই নয়, আপনার অধীনস্থদের সামনেও যদি আপনার বস্ আপনাকে কখনো কোনো কারণে তিরস্কার করেন (সচরাচর তিনি হয়তো তা করবেন না), তাহলে ঐ সময়ে তার কটূবাক্য শাস্ত্রবাণীর মত শিরোধার্য ব'লে গ্রহণ করুন। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এবং সহজভাবে পরিস্থিতিকে গ্রহণ করুন।

শুধু তাই নয়, এরূপ ঘটনার পরও তার অবর্তমানে কর্মীদের সামনে তার নিন্দা করবেন না, কিংবা তাদেরকে বুঝাতে যাবেন না যে বস্ আপনাকে শাসিয়ে বোকামির পরিচয় দিয়েছেন।

বরং উল্টোটিই বলুন। বলুন যে বস্ ঠিকই বলেছিলেন। আপনার ভুল থাকলে তা হাসিমুখে কর্মীদের সামনে স্বীকার করুন এবং বস্ আপনার ভুলটি ধরিয়ে দিয়েছেন ব'লে কর্মীদের সামনে তার নামে ধন্যবাদ প্রচার করুন।

www.pathagar.com

এবং ভুল যদি বস্ ক'রে থাকেন, তাহলেও কর্মীদের সামনে তা তার উপর চাপাবেন না। বরং দোষটি পরিস্থিতির উপর আরোপ করুন। কিংবা একথা বলুন যে বসের কানে ভুল সংবাদ পৌঁছে দেয়া হয়েছে ব'লে তিনি অবস্থার ভুল মূল্যায়ন করেছেন। সেরূপ সংবাদ শুনে যা করা উচিত তিনি তাই করেছেন। তিনি পদ্ধতিগতভাবে এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে নির্দোষ।

শুধু তাই নয়, কর্মীদের সামনে আপনার সাথে যদি আপনার বসের এরূপ কোনো বিব্রতকর সাক্ষাৎ হয়, তাহলে পরবর্তীতে বসের অবর্তমানে কর্মীদের সামনে এমন কোনো ভাব প্রকাশ করবেন না যাতে বুঝা যায় যে আপনি তার ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন। তাতে নিজের ক্ষুদ্রত্বই প্রকাশ পাবে।

বিপরীতক্রমে, উদার মনে পরিস্থিতিকে গ্রহণ করুন। বসের প্রতি আপনার ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে নিজের উদারতার পরিচয় দিন। আপনার যে-কোনো শুধরানো ভুল আপনার জন্য একটি শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা।

নেতৃত্ব যেমন শেখার জিনিস, তেমনি আনুগত্যও শেখার জিনিস। অনুগতরা নেতার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ ক'রেই তার প্রতি কেমন আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে তা শিখে নেয়। তাদের যা আছে তারা আপনাকে তাই দিবে এমনটি নয়, বরং আপনার যা প্রাপ্য তারা আপনাকে তাই দিবে। আপনি যা করবেন, তারা তাই করতে চাইবে, আপনি তাদেরকে যা করতে বলবেন, তা নয়। তবে আপনার কথা আর কাজ যদি এক হয়, তাহলে আপনি যা বলবেন, তারা তাই করবে, কারণ তারা আপনাকে তাই করতে দেখেছে। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও"—একমাত্র এই নীতিই ফল দিতে পারে।

আপনার বসের যে-যে বৈশিষ্ট্যকে আপনি শ্রদ্ধা করেন, আপনার কর্মীরা আপনার সেসব বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করবে।

একই কথা উল্টো ক'রে বলা যায়, আপনার যে-যে বৈশিষ্ট্যকে আপনার কর্মীরা শ্রদ্ধা করুক ব'লে আপনি কামনা করেন, আপনাকেও আপনার বসের সেসব বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে।

"আমাকে শ্রদ্ধা কর, আমি শ্রদ্ধার পাত্র"—একথা ব'লে কর্মীদের কাছ থেকে জীবনে কখনও শ্রদ্ধা পাওয়া সম্ভব নয়। বরং "আমি শ্রদ্ধাবানকে শ্রদ্ধা করি"—একথা ব'লে, এবং কাজের মাধ্যমে তার সত্যতা যাচাই ক'রে, প্রকৃত শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। শ্রদ্ধা বা আনুগত্য পাবার ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই।

অবশ্য কোনো বস্‌কে যদি আপনার ঘৃণা করতেই হয়, বা কখনো তার বিরোধিতা করতেই হয়, তাহলে তার আগে অন্য কোনো শ্রদ্ধার পাত্রকে খুঁজে বের করুন। তারপর যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে তার বিরোধিতা করুন, এবং একই সাথে অন্য কারো প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করুন। আনুগত্য ছাড়া বিরোধিতা সম্ভব নয়; বিরোধিতা ছাড়াও সম্ভব নয় আনুগত্য। আপনার দেখাদেখি আপনার অধীনস্থ নেতা-কর্মীরা কারো বিরোধিতা করবে অন্য কারো প্রতি আনুগত্য দেখাবার জন্যই। সুতরাং কার আনুগত্য স্বীকার

www.pathagar.com

করতে হবে তা আগে ঠিক না ক'রে কখনই কারো বিরোধিতা করা উচিত নয়। তাহলে আপনার আনুগত্যও কেউ স্বীকার করবে না। মনে রাখা দরকার, আমরা কাউকে ঘৃণা করি অন্য কাউকে ভালোবাসি ব'লে। এবং কাউকে ভালোবাসার প্রয়োজনেই আমাদেরকে অন্য কাউকে ঘৃণা করতে হয়। আমরা কারো উপর নিষ্ঠুর হই অন্য কারো উপর সদয় হবার জন্য। এবং কারো উপর সদয় হতে গেলে আমাদেরকে অন্য কারো উপর নিষ্ঠুর হতে হয়।

অর্থাৎ, ঘৃণাহীন ভালোবাসা মজবুত নয়; ভালোবাসাহীন ঘৃণা তীব্র নয়, অর্থপূর্ণ নয়।

শুধু নিষ্ঠুরতা ব'লে কিছু নেই দয়া ছাড়া। শুধু দয়ার কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই নিষ্ঠুরতা ছাড়া।

সুতরাং পুনরাবৃত্তি করা যাক : আনুগত্য ছাড়া বিরোধিতা অকেজো। বিরোধিতা (শত্রুর বা প্রতিযোগির বিরোধিতা; অধ্যায়-৮ এর সূত্র-১ দ্রষ্টব্য) ছাড়া আনুগত্য লক্ষ্যহীন।

এবং নেতৃত্ব ও আনুগত্য একে অপরের পরিপূরক। কেবল অনুগত হলেই নেতা হওয়া যায়; নেতা হতে হলে অনুগত হতে হয়।

মোদ্দা কথা, আপনি আপনার বস্‌কে নিন্দা করবেন, আপনার কর্মীরাও আপনার নিন্দা করবে। আপনি তাকে শ্রদ্ধা করবেন, আপনাকেও তারা শ্রদ্ধা করবে।

মহান সংসদের কার্যক্রম চলাকালে বিটিভি-তে নেতাদের ব্যবহারিক দিক যারা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, বিরোধী দল যতই বিরোধিতা করুক, রাজপথে তারা যতই বিক্ষোভ প্রদর্শন বা তোলপাড় সৃষ্টি করুক, তারা মাননীয় স্পীকারসহ অন্যান্য সকল পদস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতি যথোচিত বিনয়, আনুগত্য, এবং সম্মান প্রদর্শন করেন।

কারণ কী? ভয়ে?

না।

যে-বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলকেই ভয় পায় না, তারা আবার একটিমাত্র ব্যক্তিকে ভয় কেন পাবে।

ভয় থেকে শ্রদ্ধা আসে না। কেবল শ্রদ্ধার সেকেলে ব্যাখ্যাতেই ভয়কে শ্রদ্ধার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভুল ব্যাখ্যা।

শ্রদ্ধাবোধ আসে মর্যাদাবোধ থেকে। দলের সাথে মর্যাদাবোধ জড়িত না থাকলেও পদের সাথে মর্যাদাবোধ জড়িত। পদ হল মর্যাদারই প্রতীক।

পদের সাথে (ভয় দেখানোর) ক্ষমতা জড়িত ব'লেই যে আমরা তাকে (পদাধিকারীকে) শ্রদ্ধা করি, তা নয়। পদ মানেই মর্যাদা। দুষ্ট লোকের অবাধ্যতা থেকে মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্যই পদাধিকারীকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ক্ষমতা *পদ* রক্ষার হাতিয়ার নয়, *পদমর্যাদা* রক্ষার হাতিয়ার।

www.pathagar.com

অতএব, উদাহরণস্বরূপ, সংসদের মাননীয় স্পীকারকে সবাই সম্মান করেন নিজেদেরকে সম্মানিত করার জন্য। একমাত্র গুণীই জানেন গুণীর কদর। এবং তা তিনি জানেন এ কারণে যে তিনি গুণী।

স্পীকারের পদটিই আসল। ব্যক্তিটি সেই পদের রক্ষকমাত্র। এ কারণে স্বয়ং ব্যক্তি-স্পীকারই তার নিজের পদকে সম্মান করেন। এটি তার পবিত্র দায়িত্ব। পদকে কলংকিত করার অধিকার কারো নেই; পদাধিকারী ব্যক্তিরও তা নেই।

সুতরাং পদ হল নৈর্ব্যক্তিক। তাকে সম্মান দেখাতেই হবে। আজ যে-ব্যক্তি উক্ত পদের অবমাননা করবে, কাল সে নিজেই যদি উক্ত পদে আসীন হয়, তাহলে পদ তাকে ক্ষমতা দিলেও মর্যাদাটুকু দিবে না। আর, আমরা আগেই কোনো এক অধ্যায়ে জেনেছি, মর্যাদাহীন ক্ষমতা তিলে তিলে ক্ষয় পেতে থাকে। ফলে, অন্য সবাই তখন ঐ ব্যক্তিকে অশ্রদ্ধা করবে।

মানুষ পদকে রক্ষা করতে চায়। এজন্য সে প্রয়োজন হলে পদাধিকারীকেও পদচ্যুত করতে দ্বিধা করে না।

পদ হল মানুষের সৃষ্টি করা ঈশ্বর। সে-জন্য সে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে ভালোবাসে। নিজের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করার এ হল মানবীয় ধর্ম। আর যাই করুক, মানুষ এ ধর্ম লঙ্ঘন করতে পছন্দ করে না।

পদ শাশ্বত। পদ অক্ষয়। পদের কোনো বিনাশ নেই। অপরপক্ষে পদাধিকারী অস্থায়ী। (কিন্তু যতক্ষণ কেউ কোনো পদে আসীন আছেন, ততক্ষণ তার সাথে পদের পার্থক্য সামান্যই।) পদের এই অবিনশ্বরতাই ক্ষমতার শূন্যতাতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে।

সুতরাং আপনি নিজের পদকে যতটুকু শ্রদ্ধা করবেন, সে-পদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকার আপনার ততটুকু। আর নিজের পদকে শ্রদ্ধা করা মানে উর্ধ্বতন পদকেও শ্রদ্ধা করা। তা না করলে আপনার অধীনস্থরা পদকে অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে আপনার স্থলে অন্য কাউকে কল্পনা করবে। কারণ, ক্ষমতার শূন্যতা তত্ত্ব অনুসারে :

পদ কখনো শূন্য থাকতে চায় না।

সুতরাং নিজেকে মর্যাদাবান নেতা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য অন্যান্য মর্যাদাবান বস্‌কে মর্যাদা দিতেই হবে। আনুষ্ঠানিকভাবেই এই মর্যাদা জ্ঞাপন করা চাই। ভাবছেন কিভাবে? চিন্তা করলেই অনেক উপায় বের করা যাবে।

মনে রাখতে হবে : পদের সৃষ্টি আছে, তবে বিনাশ নেই। কেবল আছে পরিবর্তন। একটি পদ ভেঙে অন্য একটি গঠন করা সম্ভব। তবে সিস্টেম বা তন্ত্র যতদিন আছে, ততদিন তার মধ্যে পদ অবিনশ্বর। এই সত্য শক্তির নিত্যতা সূত্রের চেয়েও বেশি বিস্ময়কর।

www.pathagar.com

এবং পদ মানুষের সৃষ্টি। তবে মানুষ ক্ষণজীবী হলেও পদ চিরজীবী। পদই মানুষের একমাত্র সৃষ্টি যার কাছে মানুষ নিজেই মাথা নত করে। নিজের সৃষ্টিকে মানুষ শ্রদ্ধা করতে ভালোবাসে।

শুধু তাই নয়, একবার সৃষ্টি করার পর পদের কাছে মাথা নত না-করার অধিকার মানুষের নেই।

সারাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সাক্ষ্য নিয়ে উপলব্ধি করেছি :

মানুষ পদ সৃষ্টি করে।
পদ সৃষ্টি করে মর্যাদা।
মর্যাদা সৃষ্টি করে আনুগত্য।
আনুগত্য সৃষ্টি করে ক্ষমতা।

তাহলে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, ক্ষমতা বাড়াবার পরম উপায় হল নিজের পদের মর্যাদা বাড়ানো। নিজের পদের প্রতি নিজের আনুগত্যই এই মর্যাদাকে বৃদ্ধি করার প্রথম উপায়।

www.pathagar.com

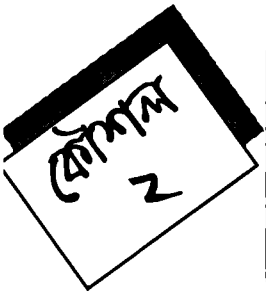

অ্যাকশন্ থেরাপি এবং ব্রেইনওয়াশিং বা মগজধোলাই (Action therapy and Brainwashing)

দলের প্রতি বা নেতার প্রতি অন্যান্য নেতা-কর্মীদের সমর্থন সুদৃঢ় করার জন্য, তাদেরকে শারিরীক ও মানসিকভাবে দলের পক্ষে নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করতে এবং প্রয়োজনে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, এবং তাদের যুক্তি এবং আবেগ উভয়কে বশ করার জন্য এই উপায়গুলি অবলম্বন করা হয়। কৌশলগুলি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। কৌশলগুলি কেউ কেউ সচেতনভাবে প্রয়োগ করেন, কেউ কেউ সচেতনভাবে প্রয়োগ না ক'রেও সাধারণ যুক্তিবিচার প্রয়োগ ক'রে একটি বিশেষ ধারায় কাজ করতে করতে একই ফল পেয়ে যান।

প্রথমে অ্যাকশন্ থেরাপির মূল তত্ত্ব এবং পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আমাদের গতানুগতিক পুরনো ধারণা এই যে, আমরা যে-মানসিক অবস্থায় থাকি, তা অনুসারে আমরা আচরণ করি। যেমন, দুঃখ পেলে কাঁদি, সুখে বা আনন্দে হাসি, দয়ায় কাউকে সাহায্য করি, রাগে কাউকে মারতে উঠি, হতাশায় শারিরীকভাবে দুর্বল হয়ে যাই ইত্যাদি। এই মানসিক অবস্থাগুলির সৃষ্টি হয় কেন? বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ কারণে। অর্থাৎ, গতানুগতিক বিশ্বাস অনুসারে, এই সব কারণের উপর আমাদের হাত নেই ব'লে আমাদের মানসিক অবস্থা নির্ধারণের ব্যাপারেও আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। অর্থাৎ মনটা আমার, তবে তা চলে অন্যের (বাহ্যিক কারণের) ইশারায়।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানীগণ মন এবং আচরণের সম্পর্কের যে আরো কিছু প্রকৃতি আছে তা আবিষ্কার করেছেন। প্রথমে এসেছেন সাইকো-এনালিস্টগণ, যাদের কারো কারো মতে, বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট কোনো মানসিক অবস্থা যদি আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হবার সুযোগ না পায়, তাহলে তা জমা হতে হতে এক পর্যায়ে মনের ধারণ-ক্ষমতার বাইরে চ'লে গেলে মানসিক ভারসাম্য ধ্বংস ক'রে দেয়, এবং এরূপ মানসিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিকে যদি উক্ত মানসিক অবস্থা স্বাভাবিকভাবে যে-আচরণের দিকে পরিচালিত করত, তা করতে দেয়া হয়, তাহলে সে ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পাবে; এবং কারো কারো মতে, রোগীকে যদি উক্ত মানসিক অবস্থা সৃষ্টিকারী ঘটনাটি মনে করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাকে তার মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণ স্পষ্ট- এবং

www.pathagar.com

সঠিকভাবে জানানো হয়, এবং তার মুখ থেকে কারণ-সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলি আগা-গোড়া বর্ণনা করানো যায়, তাহলে এভাবে সে তার মনের অতিরিক্ত ভার ঝেড়ে ফেলে আবারও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে। এ হল মানসিক রোগের কথা। উভয় মতবাদই সত্য। শুধু তাই নয়, এসব ব্যাপারে অনেক মতবাদ এবং পদ্ধতিও রয়েছে—যাদের একটি থেকে অন্যটির পার্থক্য খুব বেশি নয়। এই পদ্ধতিগুলি বাস্তবে কাজ দিয়েছে, এবং দিচ্ছেও।

এ থেকে একটি জিনিস বুঝা গেল : মানুষের মনের উপর মানুষের হাত আছে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞান আরো এক ধাপ এগিয়ে একটি নোতুন তথ্য খুঁজে পেলেন। গবেষণায় এও প্রমাণিত হল যে, আমাদের মানসিক অবস্থা দ্বারা যেমন আমাদের আচরণ নির্ধারিত হয়, তেমনি আমাদের আচরণ দ্বারাও আমাদের মানসিক অবস্থা নির্ধারিত হয়। যেমন, আমরা খুশি বোধ করলে হাসি; **সুতরাং হাসিমুখে থাকলেও আমরা খুশি মন বজায় রাখতে পারি।** আমরা ভয় পেলে চিৎকার করি; **আবার চিৎকার করলে ভয় আরো বেড়ে যায়।** আমরা রেগে গেলে আঘাত করি; **এবং আঘাত করলে রাগ আরো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।** আমরা বিষণ্ন হলে মুখ ভার ক'রে বসে থাকি; **আবার কোনো কারণ ছাড়া বেশিক্ষণ মুখ ভার ক'রে বসে থাকলে বিষণ্নতা এমনিতেই মনের উপর ভর ক'রে বসে।**

অর্থাৎ, দুটি সম্পর্ক পাওয়া গেল :

মানসিক অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয় আচরণ।
আচরণ দ্বারাও নির্ধারিত হয় মানসিক অবস্থা।

শুধু দ্বিতীয় সম্পর্কটিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। কারণ আমরা কাউকে "এই তুই দুঃখ পা" একথা ব'লে তার মনে সত্যিকারের দুঃখের সৃষ্টি করতে পারি না, তবে তাকে এমন ভান করতে বলতে পারি যেন সে দুঃখ পেয়েছে। তার এই ভানই তাকে দুঃখিত ক'রে তুলবে। একইভাবে, কাউকে দিয়ে যদি কোনো ব্যক্তির গায়ে আঘাত করানো যায়, তাহলে, আঘাত করার পর ঐ ব্যক্তির উপর ঐ লোকটির রাগ সৃষ্টি হবে, যদিও সে আগে তার উপর রাগান্বিত ছিল না।

অনেক সময় আমাদের মধ্যে কাজ করার মানসিকতা সৃষ্টি করার জন্য সরাসরি কাজ করা শুরু করতে হয়। একবার কাজে হাত দিলে কাজের আগ্রহও বেড়ে যায়।

এই হল অ্যাকশন্ থেরাপির মূল কথা। এর আরো খুঁটি-নাটি বিশ্লেষণ এবং কারণ নির্ণয় সম্ভব, তবে আমাদের প্রয়োজন এটুকুতেই মিটবে।

অ্যাকশন্ থেরাপির একটি বাস্তব প্রয়োগ হল role playing, বা কাজের আনুষ্ঠানিক অভিনয়। এই পদ্ধতিতে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হয়। নোতুন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা নোতুন নোতুন কাজে লিপ্ত হয়। আর নোতুন কাজ তাদের মনে নোতুন আবেগ, অনুভূতি, মনোভাব, ও যুক্তির

www.pathagar.com

জন্ম দেয়। এভাবে তাদের উক্ত কাজের প্রতি আস্থা এবং শ্রদ্ধাবোধ জন্মায়। নেতা-কর্মীদেরকে এভাবে দলীয়, এবং যাতে দলের স্বার্থ সম্পৃক্ত আছে এমন সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে, ব্যস্ত রাখার মাধ্যমে দলের প্রতি তাদের অনুরাগ বাড়ানো যায়। শুধু তাই নয়, কোনো ব্যক্তিকে দলের পক্ষে কিছুদিন ছোট ছোট কাজ করাতে পারলে সে ক্রমে ক্রমে আপনার দলকে ভালোবেসে ফেলবে। দলে নোতুন নোতুন লোক আনার জন্য এই কৌশলটি অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যুক্তি-তর্ক দ্বারা অধিকাংশ সময়ই মানুষের মন ভোলানো যায় না। সাজানো লেকচার বা প্রচারেও অনেক সময় কাজ হয় না। সেক্ষেত্রে কোনো কায়দায় কাউকে দলের পক্ষে **কাজ করাতে** পারলে তাকে দলের প্রতি অনুরাগী ক'রে তোলা যায়।

কাজ দ্বারা মানুষ যে-মনোভাব এবং যে-যুক্তিকে পাকাপোক্ত করে, সে-মনোভাব এবং যুক্তিকে শুধু প্রচারে বা কথায় খণ্ডন করা যায় না। অন্য কথায়, মানুষ তার যে-বিশ্বাসের পক্ষে সংগ্রাম করে (অর্থাৎ, কাজ করে), সে-বিশ্বাসকে দুর্বল করা সহজ নয়। সুতরাং আপনার নেতা-কর্মীরা যদি আপনার পক্ষে প্রতিনিয়ত কাজ করতে থাকে, তাহলে আপনার প্রতি তাদের আনুগত্যকে অন্য কেউ সহজে ধ্বংস করতে পারবে না। তবে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের কাজ দিতে হবে যেন তারা তাদের বুদ্ধি, শ্রম, সৃজনশীলতা—সবই প্রয়োগ করার সুযোগ পায়।

তাদেরকে কিছু কিছু এমন কাজ দিতে হবে যাতে তারা সফলতা অর্জন করবে এবং জনগণের বাহবা পাবে। কাজের সফলতা মানুষকে কাজের প্রতি আরো অনুরক্ত ক'রে তোলে। এসব ক্ষেত্রে সব সময় যে রাজনৈতিক সফলতা আসতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সফলতাই এখানে মূল লক্ষ্য। সুতরাং কাজটি সামাজিকও হতে পারে। মনে রাখতে হবে, সফলতাই কাজের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

কোনো ফুটবল টিমের মনোবল বাড়াতে হলে তাকে মাঝে মাঝে এমন দলের সাথে খেলার সুযোগ ক'রে দিতে হয় যার সাথে সে অবশ্যই জিতবে। যে-কোনো প্রতিযোগিতামূলক খেলার বেলাতেই একথা প্রযোজ্য। আর নেতৃত্বের খেলা তো আরো উচ্চমার্গের খেলা।

তবে এ কৌশল সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে চলবে না। মনোবল বাড়ানো আর অলস কূপমণ্ডুক ক'রে তোলা এক কথা নয়। তাদেরকে জানতে দিতে হবে যে তাদেরকে আরো এগিয়ে যেতে হবে; এজন্য মাঝে মাঝে তাদেরকে বড় দলের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করাতে হবে। এবং তাদেরকে এও বুঝার সুযোগ দিতে হবে যে তত দূর এগিয়ে যাবার যোগ্যতা তাদের আছে; এজন্য তাদেরকে ছোট দলের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করিয়ে জয়ী হবার সুযোগও দিতে হবে।

কোনো ব্যক্তি যে-কোনো কাজেই জয়ী হোক না কেন, তার উক্ত জয় থেকে প্রাপ্ত মনোবলকে অন্য যে-কোনো কাজে খাটানো যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার দলীয় উদ্যোগে আপনি যদি আপনার অঞ্চলে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অর্থনৈতিক সংকট বা কোনো দুই গোত্রের বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব নিয়ে জয়ী হন, তাহলে কর্মীদেরকে একথা বলতে পারবেন যে, এই ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

আপনারা জয়ী হয়েছেন, তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাজনীতির ব্যাপকতর অঙ্গনেও আপনারা জয়ী হবার যোগ্যতা রাখেন। রাজনীতি তো এক প্রকার সামাজিক কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। তখন আপনার কথা আপনার নেতা-কর্মীরা শুধু বিশ্বাসই করবে না, আপনার উপর তারা রীতিমত আস্থাও রাখতে শুরু করবে।

অ্যাকশন্ থেরাপি স্লোগান, বক্তৃতা, গান, এমনকি শারিরীক পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমেও হতে পারে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ক্লাশ শুরুর আগে শপথ পড়ানো হয় কেন? উদ্দেশ্য অ্যাকশন থেরাপি। তারা যখন নিজেদের মুখেই উচ্চারণ করে, "আমি শপথ করিতেছি যে . . .," তখন তারা উক্ত শপথ বাণীর নির্দেশগুলি মান্য ক'রে চলার জন্য তিলে তিলে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে থাকে। আদালতে কোনো সাক্ষী স্বাক্ষ্য দেয়ার আগে যখন পাঠ করে, "যাহা বলিব, সত্য বলিব; সত্য বই মিথ্যা বলিব না," তখন সে আগে থেকে মিথ্যাকে মনের মধ্যে সাজিয়ে রাখলেও তা উক্ত শপথের কারণে কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শারিরীক প্রস্তুতি মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করে। সুতরাং বিশেষ দিকে মনকে ফেরানোর জন্য এসব আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন আছে।

নিজের কথা নিজের কানে বারবার ধ্বনিত হতে থাকলে মানুষ তা বেশি বিশ্বাস করে। তা মিথ্যা হলেও এক সময় তাকে তার কাছে সত্য ব'লে মনে হয়।

সুতরাং দলের মূলনীতির উপর ভিত্তি ক'রে কিংবা কোনো বিশেষ উপলক্ষকে সামনে রেখে দলীয় স্লোগান মিলিয়ে কোনো গান রচনা ক'রে কর্মীদের সাথে তা সমবেতভাবে গাওয়া যেতে পারে। নোতুন নোতুন উপলক্ষকে সামনে রেখে দলীয় স্লোগান তৈরি করা যেতে পারে। এরূপ অনেক উপায়ই চিন্তা করলে খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি যা বলব ঠিক তাই অনুসরণ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তাছাড়া কোন কাজের মাধ্যমে আপনি কৌশলটি প্রয়োগ করবেন তা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার। আমি ব'লে দিলে এবং তা সবাই অনুসরণ করলে তো কারো সাথে কারো পার্থক্য রইলো না। সুতরাং মাথা খাটাতে হবে। স্বকীয়তা বজায় রাখতে হবে; অর্থাৎ এমন কিছু করতে হবে যা আর দশ জন থেকে আপনাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। প্রতিযোগিতায় স্বকীয়তাই আসল।

অ্যাকশন থেরাপিকে বেশি কার্যকর করার উপায় হল কিছু কিছু অতি সাধারণ (কিন্তু জটিল নয়) অথচ প্রতীকী কাজকে রুটিন-বাঁধা ক'রে দেয়া। স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেমন জাতীয় পতাকা উত্তোলন একটি নিয়মিত কাজ, তেমনি চিন্তা-ভাবনা ক'রে দলীয় অফিসের জন্য প্রতিদিন করতে হবে এমন কিছু কাজ ঠিক ক'রে রাখা যেতে পারে। এছাড়া অন্তত অফিসে থাকাকালীন পালন করতে হবে এমন কিছু নিয়ম (যা অত্যন্ত সহজ অথচ সবার মর্যাদাবোধ বাড়িয়ে দেয়) নির্ধারিত করে দেয়া যায়। এগুলিও পুরোপুরি অ্যাক্‌শন্ থেরাপির আওতাভুক্ত। এতে নেতা-কর্মীদের মধ্যে ডিসিপ্লিন কায়েম হয়। এসব ব্যাপারে বামপন্থীরা আগে খুব সচেতন ছিল। বর্তমানে শিবির এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব প্রক্রিয়ায় এরূপ কিছু কিছু দিক অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুশীলিত হয়। এবং একথা অত্যন্ত সত্য যে, তাদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক চৌম্বকত্ব (cohesiveness) এবং শ্রদ্ধাবোধ অত্যন্ত গাঢ় এবং শক্তিশালী।

www.pathagar.com

সুতরাং কিছু কিছু সৌজন্যমূলক আচরণকে (যেমন সালাম/নমস্কার দেয়া, সেলুট দেয়া, কমরেড বলে করমর্দন করা—এই জাতীয়) অভ্যাসে পরিণত ক'রে ফেললে ভালো ফল পাওয়া যায়। মানুষ অভ্যাসের দাস। অভ্যাসও মানুষের দাস। অতএব সঠিক অভ্যাস গঠন ক'রে তার কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দেয়া ভালো কাজ বটে। তাহলে একটি গল্প শুনুন।

এক লোক। অবিবাহিত। একা। ভদ্র অথচ বাউণ্ডুলে স্বভাবের। এক বিল্ডিংয়ের দোতলায় একটি এপার্টমেন্টে থাকত। প্রতিদিন সকালে সে বের হয়ে যেত। ঘরে ফিরত মাঝরাতে, ঠিক বারোটার সময়—একেবারে মাতাল অবস্থায়।

ঘরে ফিরে সে এক দণ্ড বসতে পারত না বা পোশাকাদিও ছাড়তে পারত না। নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে যা হয় তাই।

ফলে সে করত কি, ঘরে এসে বিছানায় ছড়িয়ে প'ড়ে শায়িত অবস্থায় পায়ের জুতো জোড়া খুলে মেঝেতে ছুড়ে মারত।

ঐ বিল্ডিংয়ের নিচের তলায় থাকত এক দম্পতি। গভীর রাতে তারা তো একে অপরের গলা ধ'রে ঘুমে বিভোর—স্বপ্নের রাজ্যে মনকে ছেড়ে বিছানায় বিন্যস্ত। উক্ত মদ্যপায়ীর প্রথম জুতোর শব্দে এই স্বামী-স্ত্রী দুজনই ঘুমের মধ্যে আৎকে উঠে বালিশ থেকে ঘাড় সহ মাথাটা উঁচু ক'রে কয়েক সেকেন্ড আধো-ঘুমের মধ্যে রাডারের মত কান খাড়া করে থাকত; কিসের শব্দ? কিন্তু যখন দ্বিতীয় জুতোর শব্দটা হত, তখন তারা বালিশের উপর উচিয়ে-থাকা মাথা ছেড়ে দিয়ে আবারও ঘুমিয়ে পড়ত।

প্রথম প্রথম তাদের কিছুটা সমস্যা হলেও ক্রমে ক্রমে তারা শব্দ দুটিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে-কোনো অভ্যাসের একটি রূপ এবং স্বয়ংক্রিয় বৈশিষ্ট্য থাকে। ফলে তাদের অভ্যাসটি ঠিক এরকম ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। বরং এর সাথে আরেকটি নোতুন মাত্রা যুক্ত হল। তা হল : তারা প্রথম জুতোর শব্দে মাথা উঁচু করত, এবং দ্বিতীয় জুতোর শব্দ হবার সাথে সাথেই দু'জনে মিলে প্রকাণ্ড একজোড়া ঢেকুর তুলে আবারও মনের আনন্দে ঘুমিয়ে পড়ত। হয়তো শোয়া থেকে হঠাৎ ওঠার কারণে ঢেকুরের ঘটনাটি মূল নাটকের সাথে যুক্ত হয়েছিল। যাহোক, দিন তাদের যেভাবেই কাটুক আমাদের জানার দরকার নেই, তবে তাদের রাতগুলি এভাবে কাটতে লাগল।

ভালোই কাটছিল এই দম্পতির রাতগুলি। কিন্তু একদিন একটি অনিয়ম হয়ে গেল। ঐ দম্পতি সেদিন বিছানায় যেতে একটু দেরি ক'রে ফেলেছিল। ফলে গভীর ঘুম আসার আগেই দোতলায় জুতো পড়ার শব্দ হল। আগের মত সবাই আৎকে উঠল। কিন্তু আগের মত জুতসই ঘুম হলো না। ফলে তারা ভোরবেলায় উপরে উঠে এসে মদ্যপায়ী যুবককে গভীর রাতে ওভাবে জুতো ছুড়ে না মারার জন্য অনুরোধ করল। এতে যুবক খুব লজ্জা পেল এবং সে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। প্রতিজ্ঞা করল যে সে ও কাজ আর করবে না।

কিন্তু মানুষ অভ্যাসের দাস। সে পরের রাতেও একইভাবে মাতাল অবস্থায় ঘরে ঢুকে একইভাবে প্রথম জুতোটা ছুড়ে মারল।

www.pathagar.com

দুম্ ক'রে এক শব্দ।

নিচতলার স্বামী-স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ। বালিশ থেকে মাথা উঁচু ক'রে থাকা।

কিন্তু একটি জুতো ছুড়ে মারার পরই যুবকের মনে পড়ল উক্ত দম্পতির নিকট তার প্রতিজ্ঞা করার কথা। সে দ্বিতীয় জুতোটা হাতের মধ্যেই ধ'রে রাখল। ছুড়ে মারল না।

এদিকে সুখী দম্পতির তো বেহাল অবস্থা। তারা বালিশ থেকে আধো-ঘুমন্ত অবস্থায় মাথা উঁচু করেই আছে, অথচ দ্বিতীয় জুতোর শব্দ হচ্ছে না।

তাদের গা ঘেমে উঠল।

দ্বিতীয় শব্দ না-হওয়া পর্যন্ত ঘুমোনো সম্ভব নয়।

সারা শরীরে বিষাক্ত এক জ্বালা শুরু হয়ে গেল।

ফলত, তারা দ্রুত বিছানা ছেড়ে উপরে উঠে এল।

মদ্যপায়ী যুবক শায়িত অবস্থায় তাদেরকে দেখে কাকুতি মিনতি শুরু ক'রে দিল, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। খেয়াল ছিল না। তবে ভবিষ্যতে আপনাদেরকে আর জ্বালাতন করব না . . ."

"আরে ভাই চুপ করেন," স্বামীটি ছটফট করতে করতে চিৎকার ক'রে উঠলো, "আগে দ্বিতীয় জুতোটা ফ্যালেন, তারপর কথা বলেন।"

যুবক তো হতভম্ব। সুতরাং সে কথা না বাড়িয়ে দ্বিতীয় জুতোটা হাত থেকে মেঝের উপর ছুড়ে মারল।

আর সাথে সাথেই দুই স্বামী-স্ত্রী হেউ ক'রে এক তালে এক জোড়া ঢেকুর তুলে কোনো কথা না ব'লে ঘরে ফিরল।

যুবকটিও এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারল।

তাহলে দেখুন অভ্যাস কাহাকে বলে। দম্পতি যে-কারণে ঘুমোতে পারছিল না, যুবকটিও সেই একই কারণে ঘুমোতে পারছিল না। দ্বিতীয় জুতো ছুড়ে না মেরে সে কিভাবে ঘুমোবে? অভ্যাস যে।

আবারও বলি, অভ্যাসের মধ্যে সব সময় কিছুটা স্বয়ংক্রিয় এবং যান্ত্রিক চারিত্র্য থাকে যা কাজকে সহজ করে তোলে। সুতরাং নেতা-কর্মীদের মধ্যে সঠিক অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে পারলে সবচেয়ে বেশি ফল পাওয়া যায়।

মাথার উপর যতক্ষণ বৈদ্যুতিক পাখাটা চলে, ততক্ষণ আপনি মালুমই করতে পারেন না যে তা চলছে। অথচ যেই বিদ্যুৎ চ'লে যাবার কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়, অমনি আপনার সমস্ত শরীর আপনাকে ব'লে দেয় : ঐ গ্যালো! এও অভ্যাস। ফ্যানের বাতাসে এবং শব্দে আপনি এতক্ষণ অভ্যস্ত ছিলেন। তাই তার উপস্থিতি মালুম করতে পারেননি। এবং একই কারণে তা থেমে গেলে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি না ক'রেও পারা যায় না।

সদ্য অবসরপ্রাপ্ত কোনো প্রাক্তন চাকুরিজীবিরও একই সমস্যা হয়। মাঝে মাঝে তিনি রীতিমত জামা-কাপড় প'রে অফিসে যাবার জন্যও তৈরি হয়ে যান। খেয়ালই থাকে না যে তিনি অবসর নিয়েছেন। অভ্যাস এমনই জিনিস।

www.pathagar.com

অ্যাকশন থেরাপি পোশাক-পরিচ্ছদ বা অন্যান্য প্রতীকের মাধ্যমেও হতে পারে। পোশাক মনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। একজন সৈনিকের সবকিছু রেখে যদি তার পোশাক কেড়ে নেয়া হয়, তাহলে তার মনে সৈন্যসুলভ তেজটিই জমে উঠবে না। পুলিশের প্রতি জনগণের সম্মানবোধ জাগ্রত হয় প্রথমত পোশাক দেখে। শুধু জনগণ কেন, পুলিশবাহিনীর কোনো সদস্য নিজেই নিজেকে ঠিকমত পুলিশ ব'লে ঠাওরাতে পারে না যদি তার পোশাক না থাকে। নার্সকে তার পেশাদার পোশাক ছাড়া অন্য কোনো পোশাক পরিয়ে ডিউটিতে দিলে তার সেবা গার্হস্থ্য চরিত্রের হবে, পেশাদার নয়। ইউনিফর্ম পরে স্কুলে-যাওয়া ছাত্রকে একদিন সাধারণ পোশাকে স্কুলে পাঠালে অন্যান্য দিনের তুলনায় তার ছাত্রসুলভ আচরণ ত্রুটিপূর্ণ হবে। যে-সব শিশু আলাদা পোশাক প'রে নাচে, তাদেরকে পড়ার সময় যদি নাচের পোশাক পরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাদেরকে কোনো ভাবেই পড়ায় মনোযোগী করা সম্ভব হবে না। তারা নাচতেই চাইবে। আবার যখন নেচে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন আর নাচের পোশাক পরিহিত অবস্থায় থাকতে চাইবে না।

কেন এমন হয়? খুব সহজ কারণ। যে-পোশাকের সাথে আমরা যে-ভূমিকা আরোপ করি, সেই পোশাক ঠিক সেই উদ্দেশ্যকে আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে দেয়। এ হল অনুষঙ্গের (association) বা পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপার। অন্য কথায়, কোনো নির্দিষ্ট পোশাককে যদি আমরা কোনো নির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্যে আলাদাভাবে চিহ্নিত ক'রে রাখি, তাহলে উক্ত কাজের সময় উক্ত পোশাক পরলে কাজে মন বসবে ভালো; এবং বিপরীতক্রমে, উক্ত পোশাক পরলে উক্ত কাজ করার আগ্রহও মনে সৃষ্টি হবে।

পোশাকের এই গুণকে অত্যন্ত উচ্চতর কাজেও ব্যবহার করা হয়। বড় বড় কোম্পানিতে, যেখানে ব্যাপক সৃজনশীল চিন্তার প্রয়োজন হয় এবং এ কাজের জন্য সৃজনশীল এবং উচ্চ-মেধাসম্পন্ন আলাদা এক গ্রুপ কর্মকর্তাও থাকেন, সেখানে সৃজনশীল চিন্তার সেশন অনুষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন সাজে সজ্জিত আলাদা কক্ষ থাকে, যা অন্য কোনো কক্ষের মত নয়। এই কক্ষে যতক্ষণ আলোচনা চলে, ততক্ষণ কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পোশাক পরিহিত থাকেন। তাদের মাথায়ও থাকে চিন্তা-শক্তিদায়ক টুপি (যা একটি প্রতীক মাত্র)। বিস্ময়কর ব্যাপার, তারা যতক্ষণ উক্ত কক্ষে উক্ত পোশাকে সজ্জিত থাকেন, ততক্ষণ তাদের সৃজনশীল চিন্তার ক্ষমতাও বেশি থাকে।

কারণ কী?

কারণ, আগেই বলা হয়েছে, আর কিছু নয়, মানসিক প্রস্তুতি। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ এবং সাজ-সজ্জা দ্বারা এরূপ কর্মকাণ্ডকে প্রাত্যহিক অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ডের বাহ্যিক রূপ থেকে আলাদা করার ফলে উক্ত অবস্থায় কেবল উক্ত কর্মপ্রেরণাই উৎসাহ পায়। নিজের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র দায়িত্ববোধ এবং প্রেরণা অনুভূত হয়।

আমাদের আচরণগত বাহ্যিক প্রস্তুতি আমাদের মনকেও প্রস্তুত ক'রে দেয়।

সুতরাং বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ পোশাক, টুপি, জুতা, বেল্ট, ব্যাজ ইত্যাদি ব্যবহার করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এগুলি কাজের উপর বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার গন্ধ ছুড়ে দেয়।

www.pathagar.com

ডাকাতদের কথাই ধরতে দোষ কি। যে-সব ডাকাত মুখোশ পরে ডাকাতি করে, তাদেরকে, আমার মনে হয়, মুখোশ না প'রে ডাকাতি করতে বললে তারা তেমন জুত ক'রে উঠতে পারবে না। আবার যারা মুখোশ প'রে ডাকাতি করে না, তাদেরকে একই কারণে আমার মনে হয়, মুখোশ পরিয়ে দিলে তারা সে-কাজে বেশি পারদর্শিতা এবং নিষ্ঠুরতা দেখাতে পারবে। (আশা করি এই বইটি কোনো ডাকাত-সর্দার পড়বে না। পড়লেই বা কি, পুলিশের তো ইউনিফর্ম পরাই আছে!)

আমি অনেক লোক দেখেছি যারা একবার নাইট ড্রেস প'রে ফেললে বিছানার দিকে না দৌড়ে পারে না। চোখে ঘুম নেমে আসে। আবার নাইট ড্রেস না প'রে তারা ঘুমাতেও স্বস্তি পায় না। অনেকে আছে যারা ধূমপানের সময় চট্ ক'রে মাথার টুপিটা খুলে নেয়। যেন ধূমপান পাপ নয়, টুপি মাথায় দিয়ে ধূমপান করাই পাপ। এ হল অভ্যাস। এই আলোকে আপনি নিজের অভ্যাসের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করলেও নিশ্চয়ই অনেক উদাহরণ পেয়ে যাবেন।

যাহোক, শারিরীক প্রস্তুতির এই সূত্রকে আপনি নিজের সৃজনশীল চিন্তার দ্বারা অনেক কাজে লাগাতে পারেন। এমনকি বিশেষ বিশেষ মিছিল বা শোভাযাত্রার সময়ে কিংবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের সময়ে কিংবা কোনো বিশেষ দিবসের জন্য এরূপ স্বতন্ত্র পোশাক ব্যাজ ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতে কর্মীদের মনোবল, স্পৃহা, মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পাবে। এ সত্য কবির চিন্তাতেও ধরা পড়েছে :

"মাথায় মুকুটটা পরিয়ে দিতেই রাজা হয়ে গেলেন তিনি।
আর সিংহাসনে পাছা রেখেই হাঁক পড়লেন—হালুম।"

—পূর্ণেন্দু পত্রী

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী মনোভাব সৃষ্টির এবং উৎসাহিত করার জন্যই এই কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এজন্য কেবল গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষেত্রেই এটি ব্যবহার করা উচিত। নইলে স্বতন্ত্র অনুভূতিটি গা-সওয়া হয়ে যাবে। সব সময় এগুলি অনুসরণ করলে তা বিশেষ আনুষ্ঠানিক মর্যাদা পাবে না।

মগজধোলাই বা ব্রেইনওয়াশিং হল মূলত অ্যাকশন থেরাপির একটি দিক। কাউকে দিয়ে অত্যন্ত কঠিন কোনো কাজ করাবার আগে তাকে দিয়ে প্রথমে ছোট খাট কাজ করাতে পারা চাই। ব্যাপারটি কতকটা একটি ভারী গোলাকার বস্তুকে গড়িয়ে দেবার মত, প্রথমে যাকে চালু করতে গেলেই যত সমস্যা, কিন্তু একবার চালু হয়ে গেলে তাকে সামান্য বল প্রয়োগ করেই বেশি গতিশীল অবস্থায় চালু রাখা যায়। সুতরাং সীমিত শক্তি দিয়ে কাজ করতে হয় ব'লে প্রথমে বস্তুটিকে সামান্য গড়িয়ে নেয়া ভালো।

মানুষের মধ্যে প্রতিরোধী (resisting) মনোভাব রয়েছে। যে-কোনো আহ্বানকে, যা তার উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়, সে প্রথমত মানসিকভাবে বাধা দিতে চায়—অর্থাৎ গ্রহণ করতে চায় না। এই বাধার পরিমাণ সাধারণত আহ্বানের জোরের

www.pathagar.com

উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, আহ্বানটি যত বড় দায়িত্ব পালনের জন্য, তার বিপরীতে ব্যক্তির মানসিক প্রতিরোধও তত জোরালো। ফলে, ছোট-খাট দায়িত্বের প্রতি আহ্বানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও হবে কম জোরালো। আবার মানুষের মনের ক্ষেত্রে একটি চমৎকার ব্যাপার এই যে, তার নিজের মানসিক প্রতিরোধকে সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ ভাঙতে পারে না, অন্যেরা তাকে আবেগ এবং যুক্তি দ্বারা বাইরে থেকে প্রভাবিত করতে পারে মাত্র। এ কারণে, তার প্রতিরোধ-বোধ প্রবল হলে নিজের উপর তার নিজের কর্তৃত্ব কার্যকর হয় না। একই কারণে, বড় কোনো দায়িত্বের কাজে আহ্বান করার আগে, তাকে ছোট-খাট কাজে আহ্বান করে তার মানসিক প্রতিরোধকে অতিক্রম করতে সাহায্য ক'রে তাকে মানসিকভাবে উক্ত ভারী গোলাকার বস্তুটির মত প্রথমে চালু ক'রে নিতে হয়।

অন্য কথায়, নেতা-কর্মীদেরকে বড় কোনো কর্মসূচীতে—যার সাথে বড় বড় ত্যাগ, পরিশ্রম, এবং দক্ষতার প্রশ্ন জড়িত—আহ্বান করার আগে তাদেরকে ছোট-খাট কিংবা ঝুঁকিহীন কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হয়। কৌশলটির মূল কথা অত্যন্ত সাধারণ এবং সহজবোধ্য, কিন্তু ফল খুব চমকপ্রদ এবং সুদূরপ্রসারী। একেই বলে মগজধোলাই।

এর সাথে লো-বল টেকনিকের একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। লো-বল টেকনিকটি (অধ্যায়-৪ এর কৌশল-২) যার উপর প্রয়োগ করা হয়, সে আগে থেকে মনে করে (কিংবা তাকে বলা হয়) যে, যে-কাজটি তাকে করতে হবে তা আনন্দদায়ক বা সহজ। কিন্তু পরে সে তা করতে একবার সম্মত হলে দেখতে পায় যে কাজটি আসলে আরো কঠিন। কিন্তু সে একবার রাজি হয়ে গেছে ব'লে সচরাচর আর পিছ-পা হতে চায় না।

অন্যদিকে, মগজধোলাই কৌশল যার উপর প্রয়োগ করা হয়, সে কেবল বর্তমানে যে-কাজটি করছে তাই জানে; ভবিষ্যতে সে যে আরো বড় কাজের দিকে এগুবে তা সে বুঝতে পারে না। অর্থাৎ তার লক্ষ্য শুধু বর্তমানের দিকে, অথচ কাজটি তাকে দিয়ে যে-ব্যক্তি করায়, তার লক্ষ্য ভবিষ্যতের বড় কাজটির দিকে।

অবশ্য আমাদের আলোচনার অনেক ক্ষেত্রে এই দু'টি কৌশলের সূক্ষ্ম পার্থক্য স্পষ্ট থাকেনি। বস্তুত foot-in-the-door technique, low-ball technique, এবং brainwashing-এর প্রয়োগরীতি একই ধরনের, যদিও প্রয়োগক্ষেত্র সামান্য আলাদা। সে কারণে, ব্যবহারিক সুবিধার্থে, আমরা আমাদের আলোচনায় এদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের তাত্ত্বিক আলোচনা করিনি।

www.pathagar.com

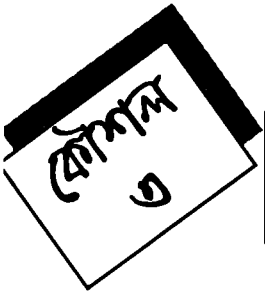

ঝিকে মেরে বউকে শেখানো

নেতৃত্বের ভূবনে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিচক্ষণতাপূর্ণ চর্চার ক্ষেত্রে এই কৌশলটি ব্যবহৃত হয়। সঠিক সময়ে সঠিক উপলক্ষে এই কৌশলটি প্রয়োগ করতে পারলে এতে ফল হবেই। শুধু তাই নয়, কৌশলটি আবশ্যকও বটে।

নোতুন বউ ঘরে এলে তাকে প্রথম প্রথম সবকিছু শিখিয়ে দিতে হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নোতুন বাড়ির নোতুন রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি।

কিন্তু মানুষ ভুল করতে করতে শেখে। শিখতে শিখতে ভুল করে। আছাড় না খেয়ে হাঁটতে শেখা যায় না। ফলে, নোতুন বউ মাঝে মাঝে আছাড় খায়, অর্থাৎ ভুল করে। তখন তাকে তা একাধিকবার শেখানো হয়।

কিন্তু কোনো কোনো বউ তার পরও ভুল করে—কখনো শেখার যোগ্যতা কম থাকার কারণে, কখনো শেখার প্রতি কিছুটা অনিচ্ছার কারণে। যে কারণেই তা হোক না কেন, বুদ্ধিমতী শাশুড়ী তখন কৌশল পাল্টে ফেলেন। এতদিন তিনি তাকে শিখিয়েছেন কিভাবে ভুল *না-করতে* হয়, তাতে তেমন ফল হয়নি; সুতরাং এখন তিনি শেখাতে চান কিভাবে *শিখতে* হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য এক, উপায় ভিন্ন। তখন শাশুড়ী হাতে লাঠি তুলে নেন।

বউকে মারতে?

না, না, মারতে নয়।

ভয় দিতে?

পুরোপুরি তাও নয়। তবে ভয় কিছুটা প্রয়োজনও বটে। প্রধান উদ্দেশ্য হল তার মধ্যে অপরাধবোধ এবং লজ্জাবোধ জাগিয়ে তোলা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল তার মনে তার "অবাঞ্ছিত" আচরণের পরিণাম সম্বন্ধে তাকে আভাস দেয়া। একেই বলে ভয়। শাস্তিতে কোনো কাজ হয় না; শাস্তির ভয়ই আসল। কাউকে শাস্তি দেয়ার আসল সামাজিক উদ্দেশ্য হল অন্যান্যদের মধ্যে শাস্তির ভয় জাগিয়ে তোলা। পরিমিত ভয় মানুষের শেখার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। আর এ কারণেই শাশুড়ী লাঠি হাতে তুলে নেন।

www.pathagar.com

কিন্তু নোতুন বউয়ের সামনে তা উঁচিয়ে ধরার জন্য নয়। তাহলে তো সব শেষ। মানুষকে সরাসরি লজ্জা দিলে লজ্জা ভেঙ্গে যায়, সে ভোঁতা হয়ে যায়; লজ্জা দিতে হয় পরোক্ষভাবে। বুদ্ধিমতী শাশুড়ী তা ভালোভাবেই জানেন।

সুতরাং তিনি অপেক্ষা করেন কখন তার নিজের মেয়েটিও বউয়ের মত একই ভুল করে। সে যদি তা না করে, তাহলে তাকে গোপনে শিখিয়ে দেয়া হয় তা করার জন্য। অর্থাৎ, এখন বউমা আর ঝি (মেয়ে) উভয়ই একই দোষে দোষী। দোষ গরম থাকতে থাকতেই শাশুড়ী তখন "লাঠিটি" হাতে নিয়ে বউমার সামনেই মেয়েকে ডাকেন। মেয়ে সামনে এলে তাকে প্রশ্ন করা হয়, "তুমি অমুক দোষ কেন করলে?"

অমনি বউমার কানেও কথাটির তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনি হয় : তুমি অমুক দোষটি কেন করলে? কারণ সেও তো একই দোষে দোষী।

হয়তো শাশুড়ী মেয়েকে বললেন, "বেয়াদব মেয়ে! ওপাশের বারান্দায় ওড়না খুলে দাঁড়িয়েছিলি কেন?"

বউমা কথাটিকে এভাবে শুনতে পায় : বেয়াদব বউমা! তুমি ওপাশের বারান্দায় বুকের কাপড় ফেলে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

"দাঁত ফেলে দেব!" গর্জে ওঠেন তিনি।

অমনি বউমারও দাঁত শিড়শিড় ক'রে ওঠে।

"ঠ্যাং ভেঙে শোকেসে সাজিয়ে রাখব! বুঝলে অভদ্র মেয়ে?"

অমনি বউমার ঠ্যাং দুটিও ন'ড়ে চ'ড়ে ওঠে।

শাস্তি হয় মেয়ের; লজ্জা পায় বউমা। মেয়ে মার কাছে ক্ষমা চায়; বউমা অপরাধবোধে কাতর হয়। মেয়ে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে সে আর ওরকম ভুল করবে না; বউমাও নিজেকে বুঝায়, "সাবধান! ওরকম ভুল কিন্তু তুমিও ক'রো না।"

ব্যস্। ওষুধ খেল একজন, উপকার পেল আরেকজন। একজন পেল শাস্তি, আরেকজন পুড়ল অনুতাপে।

রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে কিছু "নোতুন বউ" থাকে যাদেরকে সরাসরি তিরস্কার করা বা শাস্তি দেয়া যায় না। অত্যন্ত কাছের ব্যক্তি, উচ্চ পর্যায়ের নেতা বা কর্মকর্তা বা কর্মী এবং অন্যান্য কিছু ব্যক্তি যাদের মর্যাদা এবং আত্মসম্মানবোধকে আহত করা ঠিক নয়, তাদেরকে এই উপায়ে "তিরস্কার" করা হয়। একই জাতীয় ভুলের কারণে তাদের সামনে আরো নিম্নপদস্থ এবং কম সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন লোকদেরকে তিরস্কার ক'রে তাদেরকে মাঝে মাঝে নিজ নিজ মর্যাদার প্রতি সচেতন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মরে।

কিন্তু যার জন্য কৌশলটি খাটানো হবে, তিনি যেন বুঝতে না পারেন যে আপনি তাকে উদ্দেশ্য করেছেন। তবে এটুকু যেন তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন যে আপনি

www.pathagar.com

ঐ ধরনের ভুল বরদাস্ত করেন না। যাকে সরাসরি তিরস্কার করা হল সে আপনার রুম থেকে চ'লে যাবার পর, একটু চুপ ক'রে থেকে এবং "রাগ" সামাল দিয়ে (তাকে বুঝানোও চাই যে আপনি রেগে গিয়েছিলেন এবং তার সম্মানে এখন তা সামলেও নিয়েছেন), তার সাথে হাসি মুখেই অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আলাপ শুরু করতে পারেন। কিছুক্ষণ উক্ত দোষী ব্যক্তির আচরণ নিয়েও আলাপ বা মন্তব্য করা যেতে পারে।

এরূপ পরোক্ষ তিরস্কারের উদ্দেশ্য হল মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভুলকে তিরস্কার করা এবং একই সাথে তাদের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখা। এক্ষেত্রে আপনি আক্রমণ করছেন **দোষকে, দোষীকে নয়। একটি অত্যাবশ্যক কৌশল বই কি।**

এই কৌশল প্রয়োগ করার জন্য যে সব সময় একই দোষে দোষী দুই জনকে খুঁজে বের করতে হবে, তা নয়। যে-কোনো ভুলের জন্য কারো সামনে কাউকে তিরস্কার করা যায়। উদ্দেশ্য হল তিরস্কার করা এবং আপনার কঠোরতা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা। তবে উভয় ব্যক্তির ভুল একই ধরনের হলে ফল সবচেয়ে ভালো হয়।

www.pathagar.com

কৌশল ৪

ঠেলা বনাম টানা (Push vs. Pull)

চার্চিল (?) হোয়াইট হাউসে একটি সহজ অথচ চমৎকার অর্থপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখাতেন। তিনি টেবিলের উপর একটি সুতো রেখে তার এক প্রান্ত ধ'রে অন্য প্রান্তের দিকে **ঠেলা** (push) দিতেন। সুতো ঠেলে কখনো চালানো যায়? ফলে তা বল প্রয়োগের জায়গায় সামান্য সাপের মত বেঁকে যেত, সামনে এগুতে পারত না। তখন তিনি ঠেলার বদলে সবার সামনে সুতোটার অন্য প্রান্ত ধ'রে **টান** দিতেন (pull)। এবার যা ঘটত তা তো বুঝারই কথা, সুতোটা টানের দিক বরাবর তরতর ক'রে এগিয়ে যেত। তিনি উপস্থিত সবাইকে বলতেন, দল (team) পরিচালনার সঠিক উপায় হল টানা, ঠেলা নয়।

দলের নেতা-কর্মীদেরকে সামনের দিকে পরিচালনা করার একমাত্র কার্যকর উপায় হল টানা। কিন্তু অনেকে একথা বুঝতে না পেরে "ঠেলার" উপর বেশি গুরুত্ব দেন।

তবে ঠেলারও কিছুটা দরকার আছে, যদি একই সাথে টানাও হয়। কিন্তু শুধু ঠেলায় নেতৃত্ব চলে না। এ ব্যাপারে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব।

নেতার কাজ সঠিক পথ চিনে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। নেতৃত্ব দেয়া মানেই সামনে থাকা। তার দেখাদেখি অনুসারীরা তার পেছনে থেকে তার প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যাবে। আর সামনে থেকে পেছনের বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা মানে তাকে টেনে নেয়া।

অপরপক্ষে পেছনে থেকে অন্যদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে আদেশ করা মূলত নেতৃত্ব নয়, নিয়ন্ত্রণ। এই "ঠেলার" কৌশল কার্যকর হতে পারে সেনাবাহিনীতে, কোম্পানী ম্যানেজমেন্টে, বা অন্য কোনো অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ব্যবস্থাপনায়। সেসব ক্ষেত্রে কাকে কোন পথে চলতে হবে তা প্রত্যেকেরই জানা। ম্যানেজার শুধু তা নিয়ন্ত্রণ করেন মাত্র।

তবুও একথা অকাট্য সত্য যে, সেসব ক্ষেত্রেও এই ঠেলার কৌশল স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এক দল সৈন্য, উদাহরণস্বরূপ, শুধু যে ঠেলার ধাক্কাতেই এগিয়ে যায় তা নয়; তাদেরকে সামনের দিকে টানে দেশপ্রেম, শত্রুর প্রতি প্রবল আক্রোশ, অনমনীয় বীরত্ব। কোম্পানী ম্যানেজমেন্টেও সাম্প্রতিক কালে ঠেলার বদলে টানার নীতি প্রবর্তিত হয়েছে—অন্তত উন্নত বিশ্বে এখন আর কেউ ঠেলা খেতে চায় না। সবাই চায় তাদেরকে সামনে থেকে

www.pathagar.com

কেউ টানুক, যাকে তারা সবাই মিলে পেছন থেকে ঠেলবে, যার ফলে নেতা এবং অনুসারী উভয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়া আরো সহজ হবে।

তাহলে ঠেলা এবং টানার মধ্যে ব্যবহারিক তফাৎটা কোথায়? কী করলে ঠেলা হয় এবং কী করলে টানা হয়? সম্ভবত পাঠকের মনে এতক্ষণে এই প্রশ্ন নক্ করেছে।

ঠেলা হল ঘোড়ার আগে গাড়ি সাজানোর মত। বিশাল ট্রেনটির বগিগুলির পেছনে ইঞ্জিন বসালেও একই উদাহরণ সৃষ্টি হবে। কিংবা এ হল অন্ধকে পথ দেখাবার ঘটনার মত যেখানে অন্ধ তার লাঠি ঠেকাতে ঠেকাতে অচেনা পথে আগে চলছে এবং পথ-প্রদর্শক তার হাত ধ'রে তার পিছনে থেকে অন্ধের কাছে সামনের পথের বর্ণনা দিচ্ছে।

কেউ যদি তার নেতা-কর্মীদেরকে, এবং এমনকি জনগণকে, শুধু কর্মপন্থা এবং "আদেশ" জানিয়ে দিয়ে তাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে বলে, এবং নিজে "উচ্চ বাঁশের মাঁচায়" নিরিবিলি বিড়াল কোলে ক'রে নিয়ে ব'সে থাকে, তাহলে নেতা-কর্মীরা যেমন তার কথা শুনবে না, তেমনি সেও নেতা হতে পারবে না। তার এরূপ ঠেলা খেয়ে কেবল কিছু বেতন-ভোগী কর্মচারীই কিছুদূর এগুবে—এবং তারা এগুবে আসলে টাকার টানে, ঠেলার কারণে নয়।

ঠেলা এবং টানার পার্থক্য কথায় এবং কাজে উভয় ক্ষেত্রে ফুটে ওঠে। যারা ঠেলে নিয়ে এগুতে চায়, তাদের বক্তৃতার সুরটি হয় এরকম :

. . . তাই, আমার আহ্বান (কিংবা "আদেশ"), আপনারা অমুক **করুন, তমুক করুন** . . .
. . . তারা সীমা অতিক্রম করলে তাদেরকে দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দিন . . .
. . . আমরা হ্যান করেছি, ত্যান করেছি; আপনারা আমাদেরকে সমর্থন দিন . . .

অথচ যারা টানার কৌশল জানেন, তাদের একই বক্তব্যের সুর হয় এরকম :

. . . তাই, **আসুন আমরা** অমুক করি, তমুক করি . . .
. . . তারা সীমা অতিক্রম করলে জনগণ তাদেরকে দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দিবে, এবং আমরা জনগণের পক্ষে . . .
আমরা আপনাদেরই দেয়া দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছি। যদি বিফল হয়ে থাকি, সে দোষ আমাদের; যদি সফল হয়ে থাকি, সে গৌরব আপনাদেরই, এবং তখন আমরা আপনাদেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং আসুন, আমরা আরো শক্তিশালী হয়ে একযোগে এগিয়ে যাই . . . ইত্যাদি।

প্রথম সুরে কথা বলা আর নিজেকে কর্মী এবং জনগণ থেকে আলাদা করা একই কথা। দ্বিতীয় সুরই হল প্রকৃত গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের সুর।

www.pathagar.com

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে"—আপনাকে এগিয়ে যেতে দেখে অন্যেরাও আপনার পিছু নেবে। অনুসারীরা বা সমর্থকরা নেতাকে "দেখতে" চায়। তাই নেতাকে সামনেই থাকতে হয়। মানুষ তার কথাতেই কান দেয় যাকে তারা দেখতে পায়। আরো সত্য কথা, মানুষ তার কথাতেই কান দেয় যিনি কাজের মাধ্যমে কথা বলেন এবং কাজের কথাই বলেন। "টানার" সবচেয়ে বড় কৌশল হল হাতে কাজ নিয়ে তাতে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়া, এবং তারপর অন্যকে আহ্বান করা। "চলুন আমরা এই কাজটি করি" একথা বলাতে দোষ না থাকলেও, "একাজ আমি শুরু করেছি, এ নিয়ে আমি এগিয়ে যাব; আপনারা সাথে থাকলে আমাদের সফলতা নিশ্চিত। সুতরাং আপনারাও আমার হাতকে শক্তিশালী ক'রে আপনাদের জন্য কাজ করতে আমাকে আরো যোগ্য ক'রে তুলুন"—একথা বললে নেতৃত্বে সার্থকতার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। সুতরাং নেতৃত্ব মানে নিজে কাজ করা এবং তারপর যারা এগিয়ে আসবে তাদেরকে কাজের দায়িত্ব দেয়া।

কাজের দায়িত্ব দেয়া একটি চমৎকার এবং অত্যন্ত ফলপ্রসূ কৌশল। দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়েই মানুষ সামনে এগুতে সুবিধা পায় বেশি। তাহলে একটি গল্প বলি। বাস্তব গল্প।

একদিন গ্রামের এক কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। সাথে এক বৃদ্ধ লোক, বিচক্ষণ, মোড়ল গোছের। তার মাথায় একটি ভারী বোঝা। তার ১০/১২ বছরের ছেলে তার সাথে সাথে হাঁটছে।

রাস্তায় এত বেশি কাদা যে হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবে যাচ্ছে। কয়েক দিন বৃষ্টি না হওয়ার কারণে কাদা শক্ত চটচটে হয়ে গেছে। পা টেনে ওঠাতে খুব বেগ পেতে হচ্ছে। বৃদ্ধ আর আমি অভিজ্ঞতার জোরে বেশ স্বচ্ছন্দেই হাঁটতে পারছিলাম। কিন্তু যত সমস্যা হচ্ছিল ছেলেটার। সে বারবার পেছনে পড়ছিল। ইতোমধ্যে কয়েকটা আছাড়ও খেয়েছে।

ছেলে যত পেছনে পড়ে, তত তার বাবা তাকে খিস্তি করে, হুমকি-ধামকি দেয়। কিন্তু কোনোভাবেই তার গতি বাড়ানো গেল না।

অবশেষে বুড়ো হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। আমিও তাই। ছেলেটা কাছে এলে বুড়ো তার মাথার বোঝাটা ছেলের মাথায় চাপিয়ে দিল।

"আপনি এ কী করলেন?" আমি বললাম, "ও এমনিতেই হাঁটতে পারছে না, মরার উপর খাড়ার ঘা দেয়া হয়ে গেল না?"

বুড়ো সামনের পান-খাওয়া বড় বড় দাঁতগুলো বের ক'রে হেসে বলল, এবার ও ঠিকই হাঁটতে পারবে। তারপর সে স্থানীয় ভাষায় যা বলল, তার সারমর্ম এটাই : নিজের দায়িত্ব যে নিতে পারে না, তার উপর বাইরের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে হয়। তাতে সে নিজেকে দায়িত্ববান ভাবতে শেখে এবং এভাবে নিজের উপর তার নিজের দায়িত্ববোধ এসে যায়।

www.pathagar.com

বিস্ময়কর ব্যাপার, সেই ছেলেটা তারপর আর একবারও আছাড় খেয়ে পড়েনি। স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছিল যে তার কষ্ট হচ্ছে, তবে তার দক্ষতাও যেন আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। অবশ্য বাড়ির কাছাকাছি আসার পর বুড়ো তার কাছ থেকে বোঝাটা আবারও নিজের মাথায় নিয়েছিল।

ছেলেটার মাথায় বোঝাটা চাপানো মাত্রই সে বুঝতে পারল যে এখন তার আর আছাড় খাওয়া *উচিত* নয়।

কাজ মানুষকে দায়িত্ব দেয়। দায়িত্ব তার মনোবল এবং ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়, নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করে।

দায়িত্বের এই শক্তিশালী ভূমিকা সম্বন্ধে সবাই কম-বেশি পরিচিত। এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ আমরা দেখে থাকি যেখানে মা-বাবার আদুরে "দুলাল" শুধু ঢনঢন করে বেড়ায়, কোনো কাজ করে না, করতে পারেও না; অথচ আকস্মিকভাবে বাবার অকাল-মৃত্যু হলে সেই বোকা অপরিপক্ক ছেলেটাই গোটা সংসারের হাল ধরে। হাল ধরার প্রয়োজন এলে নরম হাতও শক্ত হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত জন স্টেইনবেকের একটি গল্প মনে পড়ে গেল—The Flight। গল্পের নায়ক হল ১০ বছরের একটি ছোট ছেলে। পরিবারে বাবা কিংবা বয়স্ক কোনো পুরুষ মানুষ না থাকায় তার মা তাকে একটি গুরুদায়িত্ব দিয়েছিল। তার মায়ের বিশ্বাস ছিল, A boy gets to be a man when a man is needed, অর্থাৎ, সময়ের প্রয়োজনে একটি বালকও একজন পুরুষের মত আচরণ করতে শেখে। বাস্তবে ঘটেছিলও তাই। সেই কিশোর শত্রুর সাথে তীব্র বন্দুক যুদ্ধে অসম সাহসিকতা দেখিয়ে বীরের মত মৃত্যুকে গ্রহণ করেছিল।

তাহলে দেখা গেল দায়িত্ব মানুষকে সামনে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। অতএব, নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথে নেতা-কর্মীদেরকেও দায়িত্ব দিতে হবে। সে দায়িত্ব হওয়া চাই কাজের দায়িত্ব, চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দায়িত্ব। তবে দায়িত্ব স্পষ্টভাবে প্রত্যেকের মধ্যে ভাগ ক'রে দেয়া চাই, এবং তা দেয়ার আগে প্রত্যেকের যোগ্যতাকেও মেপে নেয়া চাই।

"টেনে" নেয়ার আরেকটি সুন্দর উপায় হল সফলতা। আগেই কোনো এক কৌশলে বলা হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেতা-কর্মীদেরকে সফলতা এনে দিতে হবে। অন্তত ছোট ছোট রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক ক্ষেত্রে। সফলতা একটি বড় চালিকাশক্তি।

এই বইতে যত কৌশল এবং আলোচনা দেয়া হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই pull strategy-র বা "টানার" শক্তিশালী উপায়।

www.pathagar.com

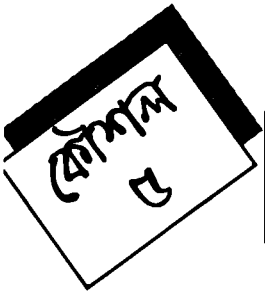

বিভক্ত ক'রে জয় কর (Divide and rule)

আমরা "নেতৃত্বের লড়াই" অধ্যায়ে এই কৌশলটির প্রয়োগ দেখেছি। প্রতিপক্ষের দলে ভাঙন লাগিয়ে দিয়ে তাকে দুর্বল ক'রে দেয়াই এর লক্ষ্য। একই কৌশল নিজের সংগঠনেও ব্যবহার করা হয়, তবে নিজেকে নিজেই ধ্বংস করার জন্য নয়, সংগঠনের সকল স্তরের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং নিশ্চিত করার জন্য, অর্থাৎ সংগঠনকে সঠিকভাবে কন্ট্রোল করার জন্য।

এই কৌশল সব ধরনের বড় সংগঠনে প্রয়োগ করা হয়। সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী থেকে শুরু ক'রে বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে গোটা ক্ষমতার কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এই কৌশল ব্যবহৃত হয়।

অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার-লড়াই (power play) প্রতিপক্ষের চক্রান্ত—এই দুই অপশক্তি সব সময় একটি সংগঠনের (organization) ঐক্য নষ্ট ক'রে দেয়ার জন্য তার power-structure বা ক্ষমতা-কাঠামোর উপর ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে সংগঠনের মধ্যে আত্মবিরোধের এবং ভাঙনের সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে অধিকতর খারাপ ফলশ্রুতি হয় আত্মবিরোধের সৃষ্টি হলে, যার প্রকাশ ঘটে হয় এক ডিপার্টমেন্ট বা গ্রুপের সাথে অন্য এক ডিপার্টমেন্টের বা গ্রুপের অন্তর্কলহের মধ্য দিয়ে, কিংবা এভাবে গঠিত কোনো ক্ষুদ্র "বিদ্রোহী" গ্রুপের দ্বারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বা খোদ authority-র বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে। সংগঠনে নেতৃত্বের স্তর (levels of authority) খুব বেশি হয়ে গেলে (একই সংগঠনে অনেক নেতা থাকলে এরকম হয়) কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ধরা-ছোঁয়া থেকে মাঠ-পর্যায়ের নেতৃত্ব অনেক দূরে সরে যায়। তখন এরূপ সমস্যা ঘটতে পারে। এরূপ সম্ভাবনা এড়াবার জন্য বেশি লোক যেন একত্র হয়ে কোনো ক্ষমতার বিন্দু অধিকার না করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এজন্য সংগঠনকে সম্ভাব্য সব উপায় বিবেচনা ক'রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে ভাগ ক'রে নেতৃত্ব দেয়া হয়। অধ্যায়-৮ এর সূত্র-৩ এ এরূপ বিভাজনের প্রধান নীতিগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।)

শুধু রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে বিবেচনায় রেখে বলা যায়, এক্ষেত্রে পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য এরূপ কোনো বিদ্রোহমূলক চক্রান্ত সংঘটিত হবার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ কেউ দল থেকে বের হ'য়ে যেতে চাইলে তার জন্য "বিদ্রোহের" প্রয়োজন পড়ে

www.pathagar.com

না। আবার দলের সার্বিক ভাবমূর্তি যদি খুব আশাব্যঞ্জক হয়, তাহলে কেউ সে দল ছেড়ে অন্য কোনো দলে যেতে চাইবেও না। সুতরাং এক্ষেত্রে দল থেকে নেতা হারানোর ভয় কোনো বড় ভয় নয় (সে ভয় বড় হলেও আলোচ্য কৌশল দ্বারা তার সমাধান সম্ভব নয়, তখন দরকার অন্য কৌশল), বড় ভয় হল স্বয়ং নেতার অবস্থান নিয়ে। অর্থাৎ এরূপ "চক্রান্তকারী" গ্রুপ দলের মধ্যে থেকেই দলের কোনো এক পর্যায়ের নেতাকে কৌশলে অপসারণ ক'রে তার স্থান দখল করার চেষ্টা করতে পারে। অবশ্য প্রতিষ্ঠানের রকমভেদ অনুসারে এই সমস্যার জটিলতা এবং চরিত্র চক্রান্ত থেকে শুরু ক'রে বিচ্ছিন্নতাবাদ পর্যন্ত গড়াতে পারে (যা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দেখা যায়)। এই সমস্যার সমাধান অত্যন্ত পেঁচালো এবং জটিল। যেহেতু আমরা এই বইতে লোকাল পর্যায়ের নেতৃত্ব বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই, সেহেতু এসব জটিল বিষয় নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব না। তবে যেহেতু এই সমস্যা সীমিত কিছু রূপে লোকাল পর্যায়ের নেতৃত্বের সাথেও জড়িত থাকে, সেহেতু আমরা শুধু দুটি উপায়ের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। প্রথমত, ক্ষমতা-কাঠামোর সকল স্তরে নিজস্ব বিশ্বস্ত "গোয়েন্দা" ছড়িয়ে দেয়া, এবং দ্বিতীয়ত, নিজের সব ডিম এক ঝুড়িতে না রাখা।

শেষোক্ত উপায়টিকে সরল ভাষায় এভাবে বলা যায় : আপনার নিজস্ব প্রভাব বলয়ের মধ্যে আপনি যাদের উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ অন্যান্য অধীনস্থ নেতা ইত্যাদি) তাদের সংখ্যা যত কম হবে, আপনার "আউট" হয়ে যাবার সম্ভাবনা তত বেশি। তখন মাত্র এক বা দুই জন বেঁকে বসলে আপনি কুপোকাত। অপরপক্ষে তাদের সংখ্যা যত বেশি হবে, আপনার অবস্থান তত মজবুত বা দৃঢ় হবে। কারণ, তাদের এক বা দুই জন একত্র হয়েও আপনার উপর বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে না। ক্ষমতার উৎসের সংখ্যা যত বেশি হয়, তার নিশ্চয়তা, স্থায়িত্ব, এবং ঘাতসহতা তত বেশি হয়। কারণ, কেউ তখন আপনার স্থান দখল করতে চাইলে তাকে প্রথমে অধিকাংশ উৎসকে হাত করতে হবে, যা খুব সহজ কাজ নয়। পার্টিতে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য এসব দিক বিচক্ষণভাবে বিবেচনা করতে হয়।

www.pathagar.com

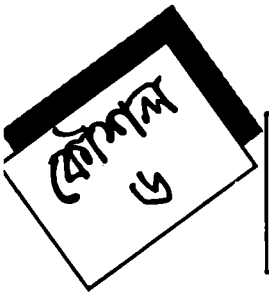

সর্বদা শত্রুকে স্মরণ করা (Always Remember your enemy)

পাঠক মাফ করবেন, আমরা যারা ধার্মিক, তারা যতবার আমাদের বন্ধুকে (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করি, কমপক্ষে ঠিক ততবারই আমরা শত্রুকেও (ইবলিস শয়তানকে) স্মরণ করি। নামাজের মধ্যে বা অন্য সময়ে যখনই আমরা পবিত্র কোরানের কোনো একটি সূরা বা আয়াত পড়তে চাই, তখনই প্রথমে পাঠ করি, "আ'উজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম", অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাকে শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ, শয়তানের হাত থেকে রেহাই পেতে হবে আগে।

শত্রুর কবল থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই ব'লেই বন্ধুকে স্মরণ করি। এবং বন্ধুকে পেতে চাই ব'লেই আমাদেরকে প্রথমে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করতে হয়।

শত্রুর প্রতি ঘৃণাই আমাদের মধ্যে বন্ধুর প্রতি মমত্ববোধ বেশি জাগিয়ে তোলে।

সুতরাং বন্ধুর চেয়ে শত্রুর মূল্য আদৌ কম নয়। শুধু তাই নয়, শত্রু না থাকলে বন্ধুর কদরও বাড়ে না।

ঠিক ইবলিসের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। সে তার শত্রুকে (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ না ক'রে একটি খারাপ (তার মতে "ভালো") কাজও করতে পারে না। কারণ, সে যা-ই করুক না কেন, তা করে তার শত্রুর ক্ষতি করার জন্যেই। এ কারণেই তার কাজকে তার কাছে অর্থবহ ব'লে মনে হয়।

যে-কোনো প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য হল জয়ী হওয়া, আর তার উপায় হল প্রতিপক্ষকে বিভিন্নভাবে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা। আমাদের উপরোক্ত শত্রু আর প্রতিপক্ষ "কার্যত" একই, যদি আক্ষরিক অর্থে "শত্রু" বলতে যা বোঝায় "প্রতিপক্ষ" মানে তা নয়।

লক্ষ্যের দিকে সর্বদা নিরাপদে পথ চলার জন্য নিজেকে সচেতন থাকতে হয়। সচেতনতার এই বোধটি জাগ্রত হয় শত্রুর চিন্তা থেকে। শত্রুর কলাকৌশল এবং যোগ্যতার দিকে তাকিয়ে নিজের কলাকৌশল নির্ধারণ করতে হয় এবং যোগ্যতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হয়। তবে আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গ এসব নয়—আমাদের উদ্দেশ্য হল নেতা-কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহানুভূতিবোধ, ভালোবাসা, এবং

www.pathagar.com

"প্রাতিষ্ঠানিক/দলগত আত্মীয়তা" বৃদ্ধি করার জন্য "শত্রুর" প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুধাবন করা।

একই সংগঠনের অন্তর্গত নেতা-কর্মীদের মধ্যে যেমন থাকে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা, তেমনি, আমরা আগেই দেখেছি, তাদের মধ্যে থাকতে পারে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা, যা তাদের "দলীয় আত্মীয়তাকে" কমিয়ে দিতে চায়।

এই বিপরীত শক্তির কার্যকারিতা কমিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন pull strategy ব্যবহার করা হয়, যা আমরা এই অধ্যায়ের কৌশল-৪ এ দেখেছি।

কিন্তু, অন্তত রাজনীতির ক্ষেত্রে একথা সত্য যে, এ সব কিছুরও আগে দরকার লক্ষ্য নির্ধারণ। কোথায় যেতে হবে তা না জানলে কোন পথে সেখানে যেতে হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। রাজনীতিতে লক্ষ্যের সাথে সব সময় **বিরোধিতার** মাত্রা থাকতেই হয়। সোজা কথায় :

কারো বা কোনো কিছুর বিরোধিতা
না করতে পারলে রাজনীতি হয় না।

এই বিরোধিতা হতে পারে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে, কোনো মতবাদের বিরুদ্ধে, কোনো সামাজিক অর্থনৈতিক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে। মোট কথা বিরোধিতা থাকতেই হবে। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে প্রধানত বিরোধিতা দ্বারাই সফল নেতৃত্ব চলছে (যদিও সফল রাজনীতি চলছে সে কথা হলফ ক'রে বলা যাবে না।)

বিরোধিতা মানুষকে সামনে টেনে নেয়। শুধু তাই নয়, বিরোধিতা সহকর্মীদের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে দেয়।

একই উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে কাজ করতে করতে আমরা একই চিন্তাধারার অংশীদার হই এবং একই কায়দায় চিন্তা করতে শিখি। এভাবে আমাদের চিন্তার ঐক্য গড়ে ওঠে। চিন্তার ঐক্য মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে।

একই ভাবে, একের অধিক ব্যক্তি যদি একই ব্যক্তির বা অবস্থার বিরোধিতা করে, তাহলে ঐ একের অধিক ব্যক্তির মধ্যে জোট গঠনের প্রবণতা জেগে উঠবে। যেমন, দু'জন সৈন্য, যারা পরস্পর শত্রু, যদি উভয়ে একই ঘরে আটকা পড়ে, এবং তারা একে অপরকে খতম করার আগেই যদি তৃতীয় অন্য কোনো শক্তিশালী শত্রু এসে তাদের উভয়কেই খতম করতে চায়, তাহলে ঐ আটকে-পড়া দুজন শত্রু পরস্পরের বন্ধুতে পরিণত হবে এবং তৃতীয় শক্তিটির মোকাবেলা করবে। বিরোধিতার পরিণাম বন্ধুত্ব।

পরস্পর অপরিচিত ভিন দেশের দুই পথিক একই পথে চলার সময় যদি ডাকাত বা দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং তারা উভয়ে তার মোকাবেলা করে, তাহলে তারা একে

www.pathagar.com

অপরের অপরিচিত হলেও তাদের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হবে এবং তারা বহুকাল (চিরকাল না হলেও) একে অপরকে মনে রাখবে। বিরোধিতা বন্ধুত্বের একটি উৎস।

সুতরাং নেতা-কর্মীদেরকে গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত রাখার সাথে সাথে তাদেরকে সব সময় দলীয় নীতির আলোকে নির্ধারিত বিরোধিতার বিন্দুর মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে। তাতে তাদের মধ্যকার বিভেদ কমে যাবে এবং দলীয় আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাবে।

তবে বিরোধিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধানত একটি উপায়; তা যেন একমাত্র-লক্ষ্যে পরিণত না হয়।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৮

ক্ষমতা ও নেতৃত্বের ১৪ টি অমোঘ কৌশল

www.pathagar.com

এখন আমরা ক্ষমতা ও নেতৃত্বের মোট ১৪ টি সূত্র (Law) সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করব। দেশ সমাজ নির্বিশেষে সূত্রগুলি সত্য। একেক সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সূত্রগুলির সত্যতা একেকভাবে লক্ষ্য করি—কোনো ক্ষেত্রে তা সহজে ধরা পড়ে, কোনো সমাজে পরোক্ষভাবে। কিন্তু এগুলি সত্য। এগুলি কোনো না কোনো ভাবে পাঠকের জানা, তবে একসাথে সূত্রবদ্ধ ক'রে এগুলি নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলে ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের রহস্যময় চরিত্র সম্বন্ধে যেমন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যাবে, তেমনি এই অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বাস্তবতাকেও আরো অর্থপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি নেয়া যাবে।

এখানে আমরা সূত্রগুলিকে যতদূর সম্ভব সহজে ব্যাখ্যা করব, কোনোরূপ জটিল ঐতিহাসিক দার্শনিক ব্যাখ্যার বাগাড়ম্বর ছাড়া। তবে একথা ঠিক যে সূত্রগুলিকে আরো বেশি উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারলে আলোচনা আরো পূর্ণতার দিকে যেত। কিন্তু বইটির পঠনযোগ্যতা সর্বস্তরে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সেরূপ বিশ্লেষণ থেকে বিরত থেকেছি। তবুও, আশা করা যায়, এগুলি বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হবে না, যদিও, কারো কারো পক্ষে, এগুলির সার্বজনীনতাকে স্বীকার করার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তবে, প্রিয় পাঠক যদি পর্যাপ্ত বাস্তব উদাহরণের অভাবে কোনো সূত্রের সার্বজনীনতাকে "অনুভব" করতে অসুবিধা বোধ করেন, তাহলে নিজের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ আহরণ ক'রে তার সত্যতা যাচাই ক'রে দেখতে পারেন।

তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। বস্তুজগতের ক্ষেত্রে সূত্রাবলী যেভাবে প্রযোজ্য, মানব-সমাজের ক্ষেত্রে তা কখনো নয়। মানুষের ইতিহাস থেকে কোনো "সত্যকে" মাছ থেকে কাঁটা বাছার মত নির্ভুলভাবে বেছে বের করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সব ঘটনার মধ্যে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ধারা ফুটে ওঠে না।

www.pathagar.com

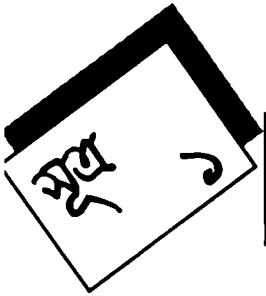

বিরোধিতার সূত্র (Law of opposition)

শক্তির প্রয়োগ সর্বদা বিরোধী শক্তির জন্ম দেয়। অন্য কথায়, যার ক্ষমতা আছে, তার প্রতিপক্ষ আছে।*

এই সূত্রটি যুগে যুগে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন সমাজে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সত্য প্রমাণিত হয়েছে শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, বস্তুজগতের ক্ষেত্রেও।

নিউটনের গতিবিষয়ক তৃতীয় সূত্রটি সারা বিশ্বের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তিরই জানা। সূত্রটি হল : **প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।** বস্তুজগতে এই কথাটি কাঁটায় কাঁটায় সত্য। যেমন, নৌকায় ব'সে মাঝি বাঁশের লগি দিয়ে যখন মাটিতে ঠেলা দেয়, তখন মাটিও লগি বরাবর নৌকাটিকে সমান জোরে বিপরীতমুখী ঠেলা দেয়। ফলে নৌকা সামনের দিকে এগোয়। আপনি কারো গালে থাপ্পড় মারলে ঐ গালও আপনার হাতের চেটোয় সমান জোরে একটি থাপ্পড় মারবে। (ফলে থাপ্পড় খেয়ে কারো আক্ষেপ করার কথা নয়—এমনটি ভাবা ঠিক হবে না কিন্তু!)

নিউটনের এই সূত্রটি শুধু পৃথিবীর বস্তুর বেলায় সত্য তা নয়, এ সূত্র মহাবিশ্বের যে-কোনো স্থানেও সত্য। এই সূত্রের উপর ভিত্তি ক'রেই তৈরি হয়েছে আধুনিক মহাশূন্যযানের বা রকেটের চলার কৌশল। মহাশূন্যে কোনো বাতাস নেই। সুতরাং প্রপেলার বা পাখা দিয়ে সেখানে প্লেনের চলার কৌশলে মহাশূন্যযানের চলার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম ক'রে শূন্যে উঠতে যে-প্রবল গতির প্রয়োজন, প্রপেলার মহাশূন্যযানকে সে গতি দেবে কোত্থেকে। সেক্ষেত্রে এই সূত্রের ধাক্কায়ই মহাশূন্যযানকে চালানো হয়। কৌশল হল, রকেটের ইঞ্জিন বিপুল বেগে ধোঁয়া ঠেলে বাইরে বের ক'রে দেয়, আর ধোঁয়াও একই বেগে রকেটের পেছন দিকে ঠেলা দিয়ে বের হয়ে যায়। এই ঠেলাতেই রকেট দ্রুত বেগে সামনের দিকে ছুটে চলে। বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ার সময়ও একই ঘটনা ঘটে। গুলিকে সামনের দিকে গতিশীল করার জন্য বন্দুক তার উপর যে-বল প্রয়োগ করে (যে-বল আসে বিস্ফোরণ থেকে), গুলিও যাবার সময় বন্দুককে সেই পরিমাণ বলে (ভরবেগে) পেছন দিকে একটা

* J. K. Galbraith, *The Anatomy of Poower (1984),* Hamish Hamilton, London.

www.pathagar.com

ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। এ কারণে গুলি করার সময় আমরা পেছন দিকে একটি ধাক্কা অনুভব করি। নিউটন সূত্রটি আবিষ্কার না করলেও কিন্তু এসব ঘটনা ঘটত।

কিন্তু তিনি এই সূত্রটি আবিষ্কার না করলে অন্যান্য অনেক কিছু আবিষ্কার হতে নিশ্চয়ই একটু দেরি হত। এই সূত্র পরবর্তীতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়ও প্রয়োগ করা হয়েছে। ক্ষমতা সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণাটিও এসেছে এই সূত্রের প্রভাবেই।

মূলত সৃষ্টিজগতের প্রায় সব ধরনের বাস্তবতারই এই চরিত্র রয়েছে। আমাদের শরীরে কোনো রোগজীবাণু প্রবেশ করলে শরীরও নিজস্ব শক্তি দ্বারা উক্ত রোগকে পাল্টা আক্রমণ করে। তৈরি হয় এন্টিবডি। রেফ্রিজারেশনের নীতিও হল এই যে, সে পদ্ধতিতে যতটুকু ঠাণ্ডা বা শৈত্য সৃষ্টি হবে, ঠিক ততটুকু উষ্ণতাও সৃষ্টি হবে। আমরা যত বেশি আনন্দ স্ফূর্তি করি, তত বেশি দুঃখ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। আমরা কাউকে ভালোবাসলে সচরাচর ভালোবাসা পাই, ঘৃণা করলে পাই ঘৃণা। দান করলে প্রতিদান পাই। ক্ষতি করলে ক্ষতিগ্রস্ত হই।

চুম্বকের মাঝখানে কেটে তাকে দু'খণ্ড করলেও আলাদা উত্তর বা দক্ষিণ মেরু পাওয়া সম্ভব নয়; প্রতিবারই সমান শক্তি বিশিষ্ট উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হবে। পরমাণুর মধ্যে ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন আছে ব'লে তাতে ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রনও আছে। সবখানে বৈপরীত্যের ছড়াছড়ি।

ঠিক এই ঘটনা ক্ষমতার ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ, ক্ষমতা থাকলে বিরোধিতা থাকবে। তবে এক্ষেত্রে বিরোধিতা ক্ষমতার সমান, কম, বা বেশিস হতে পারে। মানবীয় ব্যবস্থায় (system) বস্তুজগতের মত কোনো কিছুকে অঙ্কের চুলচেরা বিচারে হিসেব ক'রে মিলিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

হিটলার-মুসোলিনীর মত পশুর আবির্ভাব স্ট্যালিনের মত দানবের আবির্ভাবকে আবশ্যকীয় করে তোলে। আমেরিকা থাকলে রাশিয়ার উদ্ভব ঘটা স্বাভাবিক। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ পাশবিকতার মোকাবেলা করার জন্য অনাক্রমণ নীতিতে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধীর "অসহযোগিতার মারণাস্ত্র" একটি বিস্ময়কর অথচ স্বাভাবিক আবিষ্কার।

ক্ষমতা থাকলে বিরোধিতা থাকবেই। উপরন্তু, বিরোধিতাই ক্ষমতাকে যাচাই করার প্রধান মাপকাঠি। যে-নেতার প্রতিপক্ষ ছোট, তিনি ছোট মাপের নেতা। বিপরীতপক্ষে, যে-নেতার প্রতিপক্ষ বড়, তিনি বড় মাপের নেতা, আর যে-নেতার প্রতিপক্ষ নেই, তিনি রাজনৈতিক নেতা নন, সমাজকর্মী। সমাজকর্মীর রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই, থাকলে তিনি আর শুধুমাত্র সমাজকর্মী থাকেন না, কারণ তখন তার প্রতিপক্ষ তৈরি হয়ে যায়।

ক্ষমতা সর্বদা বৃদ্ধি পেতে চায়। এবং এভাবে তা এক পক্ষের নিরঙ্কুশ স্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে চায়। ফলে তাতে কারো না কারো স্বার্থ বিঘ্নিত হতে শুরু করে। গঠিত হয় বিরোধী পক্ষ। গড়ে উঠতে থাকে ক্ষমতার ভারসাম্য। একচেটিয়া ক্ষমতা চিরদিনই ক্ষতিকর; দীর্ঘমেয়াদে তা একচেটিয়া থাকে না। ভারসাম্যে পৌঁছাতে চায়।

www.pathagar.com

কুকুর যেমন মনিবকে চেনে, ক্ষমতাও তেমনি নেতাকে চেনে। তা সচরাচর একটি নির্দিষ্ট "শ্রেণীর" হাতে আবদ্ধ থাকতে চায়, যার ফলে অন্য কোনো "শ্রেণীর" অর্থনৈতিক সামাজিক বা রাজনৈতিক অস্তিত্ব হুমকির মুখোমুখি হয়ে পড়ে। **নিজেকে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট অবস্থানে আবিষ্কার করতে পারলে মানুষ তার শ্রেণীবোধ সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হয়ে ওঠে।** এই সচেতনতা সৃষ্টি করে তৎপরতার। এভাবে দমিত বা "শোষিত" শ্রেণীও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। "শীত যদি আসে, গ্রীষ্ম কি না এসে পারে?"

"একটি আমের জন্ম শত লক্ষ মুকুল সংহার।" গড়তে গেলে ধ্বংস করতে হয়। কোনো কিছু ধ্বংস করা হয় কোনো কিছু গড়ার জন্য। কোনো শ্রেণীর স্বার্থ আদায় করতে হলে আপনাকে অন্য কোনো শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করতে হবে। যে-ক্ষমতার সাথে স্বার্থের (বা অর্থনীতির) যোগসূত্র নেই তা রাজনৈতিক ক্ষমতা নয়। আবার ক্ষমতার সাথে স্বার্থ জড়িত থাকা মানেই ক্ষমতার স্বার্থান্বেষী ব্যবহার হওয়া। আর এর ফল যে অন্য কোনো মহলের স্বার্থ-সচেতনতা তা কারোরই না বুঝবার কথা নয়।

আপনি সিগারেটকে পোড়াবেন, সিগারেট আপনাকে না পুড়িয়ে ছাড়বে নাকি?

সুতরাং এক অর্থে ক্ষমতাকে ম্যানেজ করা মানে বিরোধিতাকে কৌশলে ম্যানেজ করা।

তাহলে আপনি কোন ধরনের ক্ষমতা চান তা নির্ধারণ করার আগে ঠিক করতে হবে আপনি কোন ধরনের বিরোধিতা চান না। আপনি যদি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চান, তাহলে ভবিষ্যতের "নিরঙ্কুশ" বিরোধিতার জন্য আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনি যদি ধ্বংসকারী ক্ষমতা চান, তাহলে প্রবলতর ধ্বংসাত্মক বিরোধিতার ব্যাপারে আপনাকে সন্দিহান হলে চলবে না। আপনি যদি গঠনমূলক ক্ষমতা চান, তাহলে আপনার প্রতিপক্ষ আপনার দক্ষতাকে আরো বাড়িয়ে দিবে। অবশ্য প্রতিপক্ষ যদি সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে তারও প্রতিপক্ষ আছে। "বাপের" মনে রাখা উচিত যে সেও এক জনের "ছেলে" এবং "ছেলেরও" আশ্বস্ত হবার দরকার আছে যে সেও কারো না কারো "বাপ" হবে। সোজা কথায়, চলতে হবে সামনের দিকে তাকিয়ে। **আমরা বর্তমানে কী করছি তার ভিত্তিতে হিসেব করি ভবিষ্যতে কী হব। পদ্ধতিটি ভালো। তবে এ দৃষ্টিভঙ্গিটি মান্ধাতার আমলের। এখন আমাদের উচিত আমরা ভবিষ্যতে কী হতে চাই তা নির্ধারণ ক'রে, তা হতে হলে বর্তমানে যা করা উচিত তা করা। সামনের দিকে না তাকিয়ে সাইকেল চালানো যায় না। নিজেকে মাপা উচিত ভবিষ্যতের মাপকাঠিতে। অন্যকে মাপা উচিত তার অতীতের বাটখারায়।**

ক্ষমতা রক্ষা কতকটা স্বাস্থ্য রক্ষার মত। স্বাস্থ্য রক্ষা করতে কী খাওয়া উচিত শুধু সেটি ভাবলেই চলে না, কী খাওয়া উচিত নয় তাও ভাবা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষমতা রক্ষা করতে হলেও শুধু কী করণীয় তা নিয়ে ভাবলেই চলে না, কী করা উচিত নয় তা

www.pathagar.com

নিয়েও ভাবতে হবে। আমরা যা করছি, তার মধ্যে যদি যা করা উচিত ছিল না তার পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে যা আমরা চাই না তাই আমাদেরকে মাথা পেতে নিতে বাধ্য হতে হবে। কাজ করতে হবে চিন্তাশীল থেকে। এবং চিন্তা করতে হবে কাজের মধ্য দিয়ে। যে ব্যক্তি মাটি খুঁড়তে থাকে, সে নিচের দিকে নামতে থাকে; আর যে-ব্যক্তি সিঁড়ি বানাতে থাকে, সে উপরের দিকে উঠতে থাকে। কাজ কোনো না কোনো ফল বয়ে আনবেই। সুতরাং ক্ষমতার বিরোধিতা-তত্ত্ব একটি উপযুক্ত সাবধান বাণী বটে।

www.pathagar.com

ক্ষমতার সূত্র
(Laws of power)

এখানে মূলত একটি নয়, একাধিক সূত্র নিয়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু সূত্রগুলি পরস্পরের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ব'লে সেগুলিকে এক সাথে আলোচনা করা হবে। সূত্রগুলি পড়ার সময় ক্ষমতার উৎস এবং প্রকৃতি সম্পর্কে এই বইয়ের প্রথম দিকে যে-আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি মনে করতে পারলে অনেক সুবিধা হবে।

এই সূত্রগুলিতে ছাড়া ক্ষমতার আরো কিছু কিছু চরিত্র এই বইয়ের বিভিন্ন কৌশলে এবং আলোচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চলে এসেছে। সেগুলিকে পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য এখানে আনা হয়নি। আবার পূর্বে আলোচিত কিছু কিছু বিষয়কে এখানে বইটিকে সহজপাঠ্য করার এবং আলোচনাকে প্রবাহমান করার উদ্দেশ্যে পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে। পাঠককে আসলে গোটা বইয়ের যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সার্বিকভাবে বিবেচনা ক'রে মনে মনে একটি ধারণা-কাঠামো (conceptual framework) গঠন ক'রে নিতে হবে।

তাহলে এবার দেখা যাক সূত্রগুলি কী কী।

ক. ক্ষমতা অনিবার্য
(Power is inevitable)

মানুষ যেখানে আছে, যেখানে সমাজ আছে, মানুষে মানুষে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে, আছে মানবীয় সম্পর্কের অর্থনৈতিক চারিত্র্য, সেখানে ক্ষমতা আছে। ক্ষমতা সমাজের একটি আবশ্যকীয় উপাদান।

ক্ষমতার মৌলিক কারণ হল প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা কিছু মানুষকে ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় সম্পর্কের সূত্রে বেঁধে একত্র করে, এবং অপর কোনো একত্রীকৃত গ্রুপের বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে এক দল মানুষের জোট ক্ষমতার সৃষ্টি করে, এবং অন্য কোনো দলের বিরোধিতার প্রয়োজনীয়তা সে ক্ষমতাকে প্রবলতর করতে চায়। সুতরাং ক্ষমতা থাকবেই।

www.pathagar.com

খ. ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে চায়
(Power begets power)

প্রতিটি গ্রুপের বা system-এর মধ্যে কতটুকু ক্ষমতার সৃষ্টি হতে পারে তার একটি সর্বোচ্চ সীমা আছে, যদিও আমরা তা কড়ায় গণ্ডায় মেপে হিসেব ক'রে ব'লে দিতে পারি না। প্রতিটি ব্যবস্থার (system) লোকবল, বুদ্ধিবল (knowledge), অর্থবল (resource) ইত্যাদির একটি সীমা থাকে। তাই ঐ ব্যবস্থায় (system) কতটুকু ক্ষমতা সৃষ্টি হবে তার একটি সীমা আছে। এ হল ক্ষমতার বস্তুগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানুষের বাসনা বস্তুর নিয়ম মানে না। মানুষ নিজের ক্ষমতার বাইরেও চিন্তা করতে পারে। ফলে ক্ষমতা যেমন আবশ্যক, তেমনি, এ কারণে, তা আবশ্যকতার মাত্রাও ছাড়িয়ে যেতে চায়। ক্ষমতা নিজেই একটি নেশা। ক্ষমতাবান এই নেশায় আক্রান্ত হয়ে আরো ক্ষমতার লালসায় তৎপর হয়ে ওঠে। ক্ষমতার উপরোক্ত বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের সাথে যখন এই মানবীয় লালসা জড়িত হয়ে পড়ে, তখন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে চায়। প্রথম ধাপে তা উক্ত "বস্তুগত" সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে চায়। দ্বিতীয় ধাপে তা লোকবল অর্থবল বা জ্ঞানবল বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো ব্যবস্থার (system) ক্ষমতার যোগসূত্র স্থাপন করার মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো ব্যবস্থার ক্ষমতাকে "গ্রাস" করার মাধ্যমে তার নিজস্ব পূর্ববর্তী সীমাকে অতিক্রম করতে চায়। এরূপ অবস্থায় ক্ষমতার বিরোধিতাও বৃদ্ধি পেতে চায়।

গ. ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে চায়
(Power tends to be institutionalized)

অন্য কথায়, ক্ষমতা একটি system-এর মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়।

ক্ষমতার এক বা একাধিক উৎসের (অধ্যায়-২ দেখুন) উপর দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারলে কোনো ব্যক্তি কিছু না কিছু ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এই ক্ষমতা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জন করলে সেই ক্ষমতার প্রতি তার সচেতনতা বেড়ে যায়। ফলে সে তার ক্ষমতাকে আরো বৃদ্ধি করতে চায়। কিন্তু একজন মানুষের যে-সীমাবদ্ধতা আছে, আর দশজনকে একত্রিত করতে পারলে তা অতিক্রম করা যায়। এভাবে সে তার ক্ষমতার ভিত্তিকে একটি জোটের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই জোটকে ধরে রাখার প্রথম উপায় হল একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা। এভাবে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ক্ষমতাবান ব্যক্তি যদি নিজে কোনো প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে না পারে, তাহলে সে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে তার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখে।

এই কারণে, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বিরোধী শক্তির উদ্ভব প্রথমত অপ্রাতিষ্ঠানিক জোটের মধ্যে ঘটলেও তা পরিণামে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এবং

www.pathagar.com

একই কারণে, কোনো শক্তিকে দুর্বল করতে হলে তার প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে দেয়া বা ভেঙে দেয়া একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিপরীতক্রমে বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া ক্ষমতা বেঁচে থাকতে পারে না।

ঘ. প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত ক্ষমতা বিশেষ মহলে বৈধ।
(Institutionalized Power is legitimate in a specified circle.)

ক্ষমতা অর্জন করার প্রক্রিয়া যেমন বৈধ বা অবৈধ হতে পারে, তেমনি তার প্রয়োগও বৈধ বা অবৈধ হতে পারে। ক্ষমতার প্রয়োগ অবৈধ হলে system বা প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকেই তার প্রথম প্রতিবাদ আসে। দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতার অবৈধ প্রয়োগ নেতার জন্য বিপজ্জনক হয়, কারণ তখন তার বিরোধিতা আসে প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে। নেতা যখন নিজের (অর্থাৎ নিজের প্রতিষ্ঠানের) আইনে নিজেই ধরা পড়ে যান, তখন তার পতন অনিবার্য।

কিন্তু, বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ক্ষমতা অর্জন করার উপায় অবৈধ হলেও, ঐ ক্ষমতাকে যদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায়, তাহলে তা বৈধতা পায়। কারণ, সেই প্রতিষ্ঠানের "আইনে" বৈধতা বা অবৈধতা নির্ধারিত হয় উক্ত "অবৈধ" ক্ষমতারই বলে। সোজা কথায়, তাদের মতে তাদের ক্ষমতা বৈধ। এরূপ বৈধতার চ্যালেঞ্জ আসে একমাত্র বাইরে থেকে, অর্থাৎ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে। কিন্তু অবৈধ ক্ষমতা খুব জোরালো হ'লে তখন এরূপ চ্যালেঞ্জকেই মানুষ সাধারণ "বিরোধিতা" ব'লে আখ্যায়িত ক'রে তার গুরুত্ব উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে।

ক্ষমতাকে (অন্তত) "নিজেদের মধ্যে" বৈধ করাই অনেকের প্রথম লক্ষ্য থাকে। এ প্রক্রিয়ার মূল হাতিয়ার হল নিজেদের মধ্যে লিখিত "আইন" বা নীতিমালা পাশ করা। লিখিত চুক্তির বা "আইনের" এমনই শক্তি যে, যারা সর্বসম্মতিক্রমে তা "পাশ" করে, তারা ঐ আইন পরিবর্তন না করা পর্যন্ত তা লঙ্ঘন করতে পারে না। "আইন" লঙ্ঘন করার সর্বাধুনিক চতুর কৌশল হল তা পরিবর্তন করা বা নোতুন বিতর্কিত আইন সৃষ্টি করা।

ইতিহাস "অবৈধ" ক্ষমতার এরূপ "বৈধকরণের" উদাহরণে ভরপুর। শুধু তাই নয়, "এরূপ আইনের" পক্ষে সংগ্রাম ক'রে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে, এবং দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে সরকার গঠনের ক্ষেত্রেও এরূপ একাধিক উদাহরণ আছে। এদেশে এমন ক্ষমতাও আছে যার জন্ম কুৎসিত এবং (এ দেশের জনগণের আইন অনুসারে) "অবৈধ"; অথচ তার বাড়ন্ত শরীরটা এখন বেশ নাদুস নুদুস। ক্ষমতা বলে কথা!

www.pathagar.com

তবে যে-সব ক্ষেত্রে বৈধতা এবং অবৈধতা বিতর্কিত, এবং যে-সব ক্ষেত্রে বিপুল জনতার সমর্থন রয়েছে, কেবল সে-সব ক্ষেত্রেই এরূপ ক্ষমতা টিকে থাকতে পারে, নচেৎ নয়।

সুতরাং মূল কথাটি দাঁড়াচ্ছে এরূপ :

সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বীকৃতি পেলে ক্ষমতা বৈধতা লাভ করে।*

এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, ঠিক একই প্রক্রিয়ায়ই বৈধ ক্ষমতাকেও অবৈধ করা যায়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বীকৃতি ছাড়া ক্ষমতাকে বৈধকরণ বা অবৈধকরণ কোনোটাই স্বাভাবিক কার্যকরতা লাভ করতে পারে না। শুধু বাহুবল কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

৬. *ক্ষমতার অস্তিত্ব মনস্তাত্ত্বিক।*
(Power is psychological.)

এক গাছে ছিল এক ভূত। সে ঐ গাছের তলা দিয়ে যে-ব্যক্তি হেঁটে যেত, তাকে ভয় দিত। লোকেরা ভয় পেয়ে মরিপড়ি ক'রে প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে দৌড়াতো, আর ভূতটি আত্মপ্রসাদে খিল খিল ক'রে হেসে আটখানা হত। "হেঁ, হেঁ, হেঁ! আমাকে সবাই ভয় পায়। আর তাই তো আমার ভয় দেয়ার ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। কেউ ভয় না পেলে কি আমি বেঁচে থাকতাম।" কিন্তু একদিন এক লোক ভয় পেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ভূতের এ কথা শুনে ফেলল। সে পরদিন আরো কিছু লোক সাথে ক'রে ঐ গাছতলায় এল। সঙ্গে সঙ্গে ভূতের তর্জন গর্জন শুরু হল। গাছের ডালের মধ্য থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়ল ভূতের উদ্ভট মুখ।

"ওরে বাপ রে!" ব'লে কয়েকজন প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাল।

তাতে ভূতের সাহস বেড়ে গেল। কিন্তু আগের দিন যে-লোকটি ভয় পেয়েছিল, সে এবং আরো কয়েকজন লোক সেখানে রয়ে গেল। ভূত দেখল, এ তো সমস্যা। ওরা ভয় পাচ্ছে না কেন? ওদেরকে ভয় পাওয়াতেই হবে। নইলে আমি বাঁচব কিভাবে। তাই সে আরো তর্জন গর্জন করতে করতে গাছ থেকে নেমে এল। তাই না দেখে সবাই তো দে-দৌড়। ভূত তখন মনের আনন্দে বিকট শব্দে চোখ বুঁজে হাসতে লাগল। খানিক পর চোখ খুলে সে অবাক হয়ে গেল। আগের দিন যে-লোকটি ভয় পেয়েছিল সে এখনো দৌড়ে পালায়নি। সে ভয়ও পায়নি।

ফলে ভূতটি খুব তর্জন গর্জন ক'রে তার দিকে এগুতে লাগল। কিন্তু সে ভয় পেল না।

ভূতটি তার দিকে আরো এগিয়ে এল।

তবুও সে পিছালো না।

---

* Peter M. Blau, *Exchange and Power in Social Life*, Wiley, New York, 1964, P—23

www.pathagar.com

"আমাকে ভয় পা," গর্জন ক'রে উঠল ভূতটি।

"একদম না," লোকটি বলল।

ভূতটি তখন হাউ মাউ ক'রে কেঁদে বলল, "তুই আমাকে বাঁচতে সাহায্য কর। একটু ভয় পা। পিছু ফিরে দৌড় দে। কেউ ভয় না পেলে আমি যে বাঁচতে পারব না।"

কিন্তু লোকটি "আমি ভয় পাই না" ব'লে ভূতটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ভূতটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে কাঁপতে লাগল। তার পিছু হটার উপায় নেই। তাহলে তার অস্তিত্ব শেষ।

লোকটি ভূতটির আরো কাছে এগিয়ে গেল। অবশেষে সে যখন ভূতটিকে ছুঁতে যাবে, অমনি বিকট চিৎকার ক'রে ভূতটি অদৃশ্য হয়ে গেল। ওখানেই তার অস্তিত্ব শেষ।

ভয় পাবার কেউ না থাকলে ভূত বাঁচতে পারে না। মানুষের ভয়ের মধ্যে সে বেঁচে থাকে। মানুষের ভয়ই ভূতকে শক্তি যোগায়।

ঠিক এরূপ একটি ঘটনা আমরা পাই Lewis Caroll-এর *Alice in the Wonderland* উপন্যাসে। রাজা রাণী এবং তাদের অমাত্যবর্গ যখন বিচার ক'রে ছোট মেয়ে অ্যালিসের শিরোশ্ছেদের আদেশ দিল, তখন অ্যালিস বলল, "যা! আমি তোদেরকে ভয় পাই নাকি? তোরা তো এক প্যাকেট তাস (playing card) মাত্র।" আর অমনি উধাও হয়ে গেল রাজা রাণী এবং তাদের লোক লস্কর। আসলে ঘটনাটি ঘটেছিল স্বপ্নে।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতার ক্ষমতা কতকটা এরূপ। Follower-রা leader-কে ক্ষমতাবান ভাবে ব'লেই তিনি ক্ষমতাবান।

কিন্তু তাই ব'লে দু'এক জন লোক যদি নেতাকে ক্ষমতাবান না ভাবে তাহলে তিনি ক্ষমতাহীন হয়ে যান না। সবাই তাকে ক্ষমতাবান ভাবলে সামান্য কিছু লোকের অস্বীকৃতিতে তার ক্ষমতা কমে যায় না। তাছাড়া, মানুষ তাদের প্রিয় নেতাকে ক্ষমতাবান ভাববেই। প্রত্যেকের কিছু না কিছু ক্ষমতা থাকে। সবাই তাদের প্রিয় নেতাকে তা দিয়ে তার হাতকে আরও শক্তিশালী করতে চায়।

ক্ষমতা মনস্তাত্ত্বিক—এই কথাটি উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে যে-অর্থে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাকে ঠিক তার উল্টো অর্থেও প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ, ভূত এবং রাজা রাণীকে ভয় না পাওয়ার ফলে তারা অস্তিত্ব হারালেও, নেতাকে ভয় না পেলে বা সম্মান না করলে তিনিও যে অস্তিত্ব হারাবেন তেমনটি নয়। দশ জন যার পক্ষে আছে, এক জন তাকে অস্বীকার ক'রে তাকে অস্তিত্বহীন করতে পারে না। আসলে "ভয় না পাওয়ার" ঘটনাটি আমাদেরকে ব'লে দিল যে ক্ষমতা মনস্তাত্ত্বিক; অর্থাৎ তার স্বীকৃতি আমাদের মনের মধ্যে।

এই সত্যটিকে আমাদেরকে বিপরীত উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে হবে—ক্ষমতাকে অস্তিত্বহীন ক'রে দেয়ার জন্য নয়, তাকে বৃদ্ধি করার জন্য। অর্থাৎ, নিজের প্রতিষ্ঠানের

www.pathagar.com

ক্ষমতাকে বিশ্বাস করতে হবে; তাকে মর্যাদা দিতে হবে। নেতা যদি নিজের ক্ষমতার প্রতি ইতিবাচক মর্যাদা পোষণ না করে, তাহলে অন্যরা তার ক্ষমতাকে তুচ্ছ করবে। একইভাবে, অন্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দিলে নিজের মর্যাদাও রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ, ক্ষমতার অস্তিত্ব অনেকখানি মানসিক স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল।

চ. প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার (authority) স্বভাব হল এই যে, তাকে ব্যবহার না করলে সে বাঁচতে পারে না।
(The law of authority is—Use it or lose it)*

লোহার তৈরি দা-বটি বা অন্যান্য ধারালো অস্ত্র যত ব্যবহার করা হয়, তত সেগুলির কার্যকারিতা বাড়ে। কিন্তু সেগুলিকে ব্যবহার না ক'রে দীর্ঘদিন রেখে দিলে তাতে মরচে পড়ে। ক্ষমতার স্বভাবটা কতকটা এরকমের। তাকে ব্যবহার না করলে তা হারাতে হয়। তার মানে এই নয় যে তা অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে; তার মানে এই যে তা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হবার উদ্দেশ্যে হাত পাল্টাতে চাইবে।

যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে, আমরা আগেই দেখেছি, সাংগঠনিক ক্ষমতার বিপরীত ক্ষমতা সব সময়ই থাকে। প্রথম ক্ষমতাটিকে বলে গঠনমূলক (constructive) ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়টিকে বলে ধ্বংসকারী (disruptive) ক্ষমতা। এই "ধ্বংস" মূলত সাংগঠনিক ঐক্যকে দুর্বল ক'রে দেয়ার বা বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে নির্দেশ করে। সংগঠনের স্থিতিশীলতার বা টিকে থাকার (survival) শর্ত হল এই যে, প্রতিষ্ঠানটিতে constructive power-এর পরিমাণ disruptive power-এর পরিমাণের চেয়ে বেশি হতে হবে। কিন্তু authorityকে কাজে না খাটালে constructive power-কে টিকিয়ে রাখা বা বৃদ্ধি করা যায় না।

এখানে ক্ষমতার ব্যবহার বলতে আবশ্যিকভাবে তার সদ্ব্যবহারকে বোঝানো হচ্ছে। **ক্ষমতার সদ্ব্যবহার শুধু গঠনমূলক কাজ করাকে বুঝায় না, ধ্বংসকারী শক্তিকে ধ্বংস করার কাজও ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।** সুতরাং সংগঠনের নেতা হিসেবে নিজের ক্ষমতাকে (যা সংগঠন থেকে এসেছে) সংগঠনের নীতিমালা অনুযায়ী সব সময় ব্যবহার করতে হবে—অধিকাংশ সময়ে গঠনমূলক কাজে, মাঝে মাঝে ধ্বংসকারী ক্ষমতাকে ধ্বংস করার কাজেও।

ক্ষমতার গঠনমূলক ব্যবহারকে সাইকেল চালানোর উপমা দ্বারাও স্পষ্টভাবে বুঝা যেতে পারে। সাইকেল চালানোর আবশ্যকীয় শর্ত দু'টি : তাকে চালু রাখা এবং দূরের দিকে চোখ রাখা। ক্ষমতাকেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে "চালু" রাখতে হয় এবং উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে দূরের লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। যে নেতা ক্ষমতাধারী

* Helga Drummond, *Power : Creating it, Using it*, Kogan Page Limited, London (1991)

www.pathagar.com

হওয়া সত্ত্বেও তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে না, সে শুধু নিজেকেই বিপদগ্রস্ত করে না, সংগঠনেও অরাজকতা সৃষ্টির কারণ হয়। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে সাংগঠনিক অপারগতার দ্বারা সৃষ্ট অরাজকতার যত দায়-দায়িত্ব তার উপরই বর্তায়।

ছ. সকল সামাজিক ক্ষমতাই রাজনৈতিক চরিত্র পেতে চায়।
(All types of social power tend to obtain a political nature.)

ক্ষমতার এই স্বভাবটি শ্বাশ্বত সত্য। এ কারণেই "ধর্মীয়", "সমাজসেবামূলক", "কালচারাল"—ইত্যাদি যাবতীয় জোট, যাদের উৎপত্তি ছিল অরাজনৈতিক—যখন ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি বা জনপ্রিয়তা লাভ করে, তখন তারা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব বিস্তার করে—কখনো পূর্ব-নির্ধারিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য, কখনো "ব্যাপক প্রভাবের ছোঁয়ায়" রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ ক'রে নিজের জনপ্রিয়তার "অন্য" এক রূপ আবিষ্কার করতে পেরে, কখনো বা রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার কারণে (যেমন যুদ্ধের সময়), আবার কখনো বিদ্যমান রাজনৈতিক শক্তির কোনো না কোনো শাখার "সামাজিক" হাতিয়ার হিসেবে।

ক্ষমতার রাজনৈতিক চরিত্রকে প্রভাবের সামাজিক চরিত্র থেকে আবশ্যিকভাবে আলাদা ক'রে দেখতে হবে। ক্ষমতা তখনই রাজনৈতিক চরিত্র পায় ব'লে ধরা হয় যখন তার সাথে (১) কোনো না কোনো ভাবে অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব জড়িত থাকে, (২) ব্যবহারিকভাবে নির্ণয়যোগ্য না হলেও তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণযোগ্য শ্রেণী সংগ্রাম জড়িত থাকে, বা/এবং (৩) যখন তা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনাকে প্রভাবিত করে। এ কারণে সমাজের উপর দিয়াগো ম্যারাডোনার বা প্রয়াত তরুণ অভিনেতা সালমান শাহের বা মানবপ্রেমিকা মাদার তেরেসার প্রভাব রাজনৈতিক নয়; কিন্তু ভারতের ধর্মীয় গুরু সাঁই বাবার বা আটরশির পীর সাহেবের বা এমনকি আবাহনী-মোহামেডানের সামাজিক প্রভাব কম-বেশি রাজনৈতিক চরিত্রের।

যে ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সামাজিক অঙ্গনে ভিত গেঁড়ে বসে, তা পরিণামে অর্থনৈতিক বিজয়ের আনন্দ পেতে চায়।

যে ক্ষমতা মানব মনকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জন করে, তা পরিণামে বস্তুগত শক্তি অর্জন করতে চায়।

যে ক্ষমতা বস্তুগত ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করে, তা কোনো না কোনো "শ্রেণীর" মানুষের স্বার্থের সাথে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

যে ক্ষমতা মনস্তাত্ত্বিক বা আর্থ-সামাজিক মূর্তনির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করে, তা অন্য কোনো না কোনো শ্রেণীর বিরোধিতা অর্জন করে, যেহেতু সমাজে সর্বদাই একাধিক "শ্রেণী" বর্তমান।

যে ক্ষমতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো শ্রেণীর ধ্যান-ধারণার বা স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, তা যেমন কোনো শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত "সক্রিয়" (মনস্তাত্ত্বিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে "সক্রিয়") সমর্থন লাভ করে, তেমনি কোনো শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত এবং "সক্রিয়" (একই অর্থে) বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

এভাবে শুরু হয় দ্বন্দ্ব, মেরুকরণ, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, এবং রাজনৈতিকীকরণ।

এরূপ দ্বন্দ্ব শাশ্বত, তবে তা সময়ের সাথে নমনীয় বা পরিবর্তনশীল হতে পারে।

এভাবে যে-কোনো সফল "সামাজিক" ক্ষমতাই রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করতে পারে, করতে চায়, করেও।

নদী সর্বদা সমুদ্রে গিয়ে মিশতে চায়। সফল ক্ষমতাও রাজনৈতিক অঙ্গনে মিশে পরিণতি লাভ করতে চায়। এই সত্য যেসব বিচক্ষণ প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সংগঠন জানে, তারা সরাসরি রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ ক'রে কোনো আশু সুবিধা পাবে না ব'লে মনে করলে, প্রথমে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অরাজনৈতিক উপায়ে পর্যাপ্ত প্রভাব অর্জন করার চেষ্টা করে, এই উদ্দেশ্যে যে, যেন পরবর্তীতে তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে বা কোনো বিদ্যমান রাজনৈতিক সংগঠনের সমর্থন লাভ করতে পারে। এবং একই সত্য বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতারা জানেন ব'লে তারাও তাদের কর্মকাণ্ডকে শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন সামাজিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত ক'রে দেন, এই উদ্দেশ্যে যে, যেন "অবাঞ্ছিত" কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মানুষের এসব "সামাজিক আকাঙ্ক্ষার" সুযোগ নিয়ে পর্যাপ্ত প্রভাব অর্জন করতে না পারে; অর্থাৎ সম্ভাব্য সকল শূন্যস্থান তারাই আগেভাগে পূরণ ক'রে রাখতে চান। কিন্তু, বলা বাহুল্য, পরিবর্তনশীল সমাজে শূন্যস্থান সর্বদা থাকেই।

www.pathagar.com

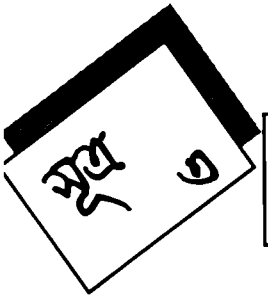

জোট গঠনের সূত্র
(Law of group formation)

কিছু লোককে বাইরে থেকে অনুপ্রাণিত ক'রে বা প্রভাবিত ক'রে কোনো গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু বাইরে থেকে প্রভাবিত না করলেও তারা নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মধ্যে এক বা একাধিক রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক গ্রুপ গঠন করবে, কারণ, কোনো রূপ জটিল ব্যাখ্যার অবতারণা না ক'রেই বলা যায়, মানুষ সামাজিক জীব। কিন্তু লোকগুলির মধ্য থেকে কতগুলি গ্রুপ গঠিত হবে, এবং কতভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর জটিল হলেও এর এমন উত্তর পাওয়া সম্ভব যা ব্যবহারিক দিক থেকে মূল্যবান।

জোট বা গ্রুপ—হোক তা রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক—গঠনের প্রথম সূত্র হল :

ক. একদল মানুষ কোনো সামগ্রিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করলে তারা সবাই মিলে একটি গ্রুপ। কিন্তু এ গ্রুপের মধ্যেও আরো একাধিক গ্রুপ গঠিত হবে। গ্রুপগুলি গঠিত হবে কতিপয় লোকের শারিরীক মানসিক বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক বা পেশাগত অবস্থান, স্থানগত সান্নিধ্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি সাধারণ (common) বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি ক'রে।

অন্য কথায়, সদস্য সংখ্যা বেশি হলে একটিমাত্র গ্রুপের মধ্যেও আরো একাধিক সম্ভাব্য (potential) গ্রুপ বর্তমান থাকে। সচরাচর এসব গ্রুপ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বরং সদস্যদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক (informal) সম্পর্কের মধ্যে অস্তিত্বশীল থাকে। কিন্তু বৃহত্তর গ্রুপের অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে উক্ত সুপ্ত (dormant, potential) গ্রুপগুলি স্পষ্টতরভাবে অস্তিত্ব লাভ করতে চায়।

এই সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদেরকে অধ্যায়-৬ এ বর্ণিত "মানসিক মানচিত্রের" ধারণাটিকে মনে রাখতে হবে। ধরা যাক পনর জন সদস্যের (যদিও সদস্য সংখ্যা আরো বেশি হলে) ভাল হয়, একটি গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যের "মানসিক মানচিত্র" নিচের মত।

www.pathagar.com

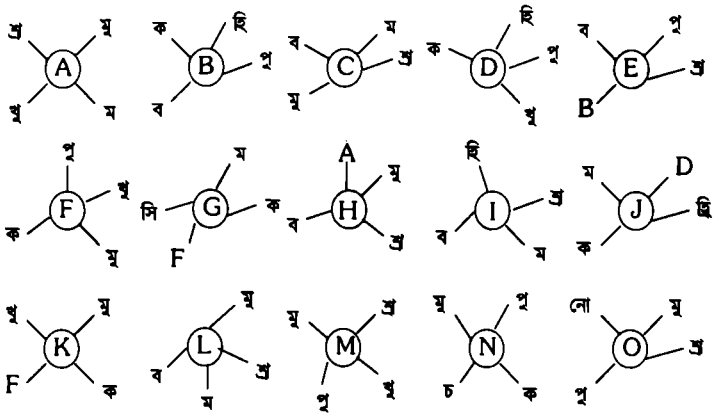

A, B, C ইত্যাদি হল সদস্যদের নাম। সংকেতগুলির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

শ্র	→	শ্রমিক
ক	→	কর্মকর্তা
মু	→	মুসলমান
হি	→	হিন্দু
খু	→	খুলনার অধিবাসী
ব	→	বরিশালের অধিবাসী
সি	→	সিলেটের অধিবাসী
চ	→	চট্টগ্রামের অধিবাসী

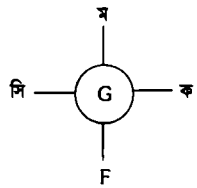

এই চিহ্নটির F দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে ব্যক্তি G-এর সাথে ব্যক্তি F-এর পারিবারিক আত্মীয়তা আছে।

এই লোকগুলি, ধরা যাক, একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। সুতরাং তারা সবাই একই গ্রুপের অন্তর্গত, কারণ, গ্রুপ হল একাধিক ব্যক্তির একটি সমাবেশ, যারা সবাই একটি সাধারণ (common) লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করছে। কিন্তু তারা সবাই একটিমাত্র গ্রুপের অন্তর্গত হলেও, উপরোক্ত সূত্র অনুসারে, তাদের মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে

www.pathagar.com

(informally) আরো একাধিক গ্রুপ গঠিত হবার সম্ভাবনা বর্তমান। যেমন, উপরোক্ত ১৫ জন লোকের মধ্যে কমপক্ষে ৮টি গ্রুপের সম্ভাবনা রয়েছে। A, C, E, H, I, L, M, এবং O-এই ৮ জন লোক শ্রমিক ব'লে তাদের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের সম্বন্ধ এবং সহানুভূতি থাকবে। সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের বাইরেও তারা একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে তুলবে। স্বাভাবিকভাবে এই সম্পর্ক চোখে না পড়লেও গুরুত্বপূর্ণ কোনো মুহূর্তে—যেমন ব্যবস্থাপকদের সাথে বেতনাদি নিয়ে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে—উক্ত সুপ্ত গ্রুপ স্পষ্ট এবং শক্তিশালী রূপ ধারণ করবে।

একইভাবে, গ্রুপের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সবগুলো লোক মিলে এরূপ একটি সুপ্ত গ্রুপের সম্ভাবনা বয়ে বেড়াবে। একই কথা মুসলমান ব্যক্তিগুলোর বেলায়ও সত্য। সত্য সব খুলনাবাসী লোকগুলোর ক্ষেত্রে। বরিশালবাসী লোকগুলোও কোনোরূপ ব্যতিক্রম নয়। এভাবে, গ্রুপের মধ্যে কমপক্ষে ৮টি ক্ষুদ্রতর গ্রুপ গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রুপগুলোকে নিচে দেখানো হল :

গ্রুপ নং	বৈশিষ্ট্য	সদস্য
১.	শ্রমিক	A, C, E, H, I, L, M, O
২.	কর্মকর্তা	B, D, F, G, J, K, N
৩.	পুরুষ	. . . .
৪.	মহিলা	A, C, G . . . . .
৫.	খুলনা	. . . .
৬.	বরিশাল	. . . .
৭.	সিলেট	. . . .
৮.	চট্টগ্রাম	. . . .

মূল গ্রুপটিতে যেহেতু হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ধর্মের লোক আছে, সেহেতু একের উপস্থিতি অপরটিকে আত্মসচেতন ক'রে তুলবে। ফলে ধর্মের অনুভূতির উপর ভিত্তি করেও এক্ষেত্রে গ্রুপ গঠিত হবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানে যদি শুধু একই ধর্মের লোক থাকত এবং বৃহত্তর (মূল) গ্রুপটি ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট-নিরপেক্ষ হত, তাহলে সেখানে ধর্মীয় অনুভূতির উপর ভিত্তি ক'রে কোনো গ্রুপ গঠিত হত না, যদি প্রতিষ্ঠানটির বাইরে থেকে ধর্ম বিষয়ক কোনো উস্কানি না আসত।

দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিষ্ঠানটিতে মহিলা এবং পুরুষ উভয় ধরনের লোক আছে। এক্ষেত্রে, আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে বলা যায়, পুরুষরা আলাদাভাবে কোনো গ্রুপ গঠনের প্রবণতা দেখাবে না, যেহেতু তারা "নির্যাতিত" নয়; কিন্তু মহিলারা, তারা যদি কোনো ভাবে ঐ প্রতিষ্ঠানে অবহেলিত হচ্ছে ব'লে মনে করে এবং তারা সংখ্যায় যদি একেবারে নগণ্য না হয়, তাহলে স্বার্থরক্ষার বা আত্মরক্ষার জন্য গ্রুপ গঠনের প্রতি প্রবণতা দেখাবে।

www.pathagar.com

জন্মস্থানভিত্তিক গ্রুপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল সামাজিক সম্পর্কের বা স্বজনপ্রীতির অনুভূতি প্রদর্শনে সীমাবদ্ধ থাকে, যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজন তাকে "সংগ্রামে" নামতে বাধ্য না করে।

আত্মীয়তাভিত্তিক সম্পর্কের কারণে অনেক সময় একই ব্যক্তি একাধিক গ্রুপের সদস্য হতে পারে, কিংবা গ্রুপের স্বার্থগত চূড়ান্ত মুহূর্তে আপত্তিকর "দ্বৈত" ভূমিকা পালন করতে পারে।

আসলে, একদল লোককে যতগুলি স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করা যায়, তাদের মধ্যে ততগুলি গ্রুপ গঠিত হবার সম্ভাবনা রয়ে যায়। ধরা যাক A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, এবং T এই বিশ জন ব্যক্তি একটি অঞ্চলে থাকে। ধরে নেয়া হল যে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে এনে একটি নোতুন জায়গায় বসবাস করতে দেয়া হয়েছে। তারা সবাই যেহেতু এখন একই লোকালয়ে বসবাস করছে, সেহেতু, অঞ্চল প্রীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে, তারা এক সময় অন্তত কোনো বিশেষ প্রয়োজনের মুখোমুখি হয়ে একটি মাত্র গ্রুপের মত আচরণ করবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তারা যেমন একে অপরের সাথে তাদের বিভিন্ন "সাদৃশ্য" আবিষ্কার করবে, তেমনি একে অপরের মধ্যকার "পার্থক্যও" আবিষ্কার করবে। ফলে তাদের মধ্যেও একাধিক গ্রুপ গঠিত হবে। কিন্তু কিভাবে?

ধরা যাক তাদেরকে প্রধানত সতরটি বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রথমে ভাগ করা যায়* :

ধর্মপ্রাণ—হিন্দু : D, G, H, N, R
ধর্মপ্রাণ—মুসলমান : A, B, C, E, L, M, O, P, T

ধনী এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত : A, B, H, L, Q, T

গরিব এবং কাজের জন্য ধনীদের বা উচ্চ-মধ্যবিত্তদের উপর নির্ভরশীল : C, D, E, F, G, I, J, K, M, N, O, P, R, S

কালচার (আচার আচরণ, রীতি-নীতি) : *
কালচার—১ : A, C, D, E, F, R, T
কালচার—২ : G, H, L, O, P, Q
কালচার—৩ : B, I, J, K, M, N, S

* নিঃসন্দেহে এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ নয়। যেমন ধার্মিক লোকদেরকে বাদ দিলে যারা থাকে তাদেরকে কিভাবে ভাগ করা হবে (নিরপেক্ষ, উদার, ধর্মবিরোধী . . .)—কিংবা অন্যান্য বিষয়কে কিভাবে পরিপূর্ণভাবে শ্রেণীবিভক্ত করতে হবে তা এখানে দেখানো হয়নি।

* কালচার প্রধানত ভাষা, ধর্ম, এবং ঐতিহাসিক প্রথার সংমিশ্রণ থেকে উৎপন্ন হয় ব'লে ভাষা এবং ধর্মের বিভাজনের সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিন্তু জটিলতা এড়াবার জন্য এখানে ভাষা আর কালচার অভিন্ন গ্রুপের সৃষ্টি করে ব'লে ধরা হল।

www.pathagar.com

ভাষা (মাতৃভাষা) :

ভাষা—১ : A, C, D, E, F, R, T

ভাষা—২ : G, H, L, O, P, Q

ভাষা—৩ : B, I, J, K, M, N, S

শিক্ষাগত অবস্থাভেদের কারণে—

"প্রগতিবাদী" : B, L, Q

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও মৌলবাদী : A, C, D, M, N, O, P, R

স্বভাবত অপরাধপ্রবণ : Q, F, K

কঠোর অপরাধবিরোধী : A, E, R, T

একই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা—

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—১ : B, L

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—২ : Q

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—৩ : — —

অবশ্য আরো অসংখ্য উপায়ে তাদেরকে শ্রেণীবিভক্ত করা যেত, তবে আলোচনার সুবিধার জন্য এই ভাগগুলিই যথেষ্ট। দেখা যাচ্ছে যে, উপরের সবগুলি বৈশিষ্ট্যই সামাজিকভাবে স্পষ্ট এবং নির্ণয়যোগ্য। সুতরাং, গ্রুপ গঠনের পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে, উক্ত ২০ জন লোকের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এবং প্রয়োজনে কমপক্ষে উপরোক্ত ১৭টি গ্রুপ এবং সাব-গ্রুপ গঠিত হবার সম্ভাবনা রয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, একটি বিশেষ সময়ে তাদের মধ্যে স্পষ্টভাবে নির্ণয়যোগ্য একাধিক গ্রুপ বর্তমান থাকবে, যেখানে একজন ব্যক্তি একাধিক গ্রুপের সদস্য হতে পারে, এবং যেখানে কিছু গ্রুপের স্বার্থ অন্য কিছু গ্রুপের স্বার্থের প্রতি অনুকূল, প্রতিকূল, বা তার সাথে নিরপেক্ষ। উপরের গ্রুপগুলির কিছু অংশ ব্যাখ্যা করা যাক।

ধর্মপ্রাণ হিন্দু গ্রুপে থাকবে ৫ জন এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমান গ্রুপে থাকবে ৯ জন। এদের প্রত্যেক গ্রুপের লোকেদের মধ্যে ধর্মবোধের সুবাদে এক ধরনের ভ্রাতৃত্ববোধ সক্রিয় থাকবে। উপাসনালয়ে বা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ তাদেরকে ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলবে। তবে কারো ধর্মের উপর কোনো আঘাত আসলে তখন ধর্মপ্রাণ না হয়েও ঐ ধর্মের পরিচয় বহনকারী অন্যান্য লোকও তখন উক্ত গ্রুপের সঙ্গে যোগ দিবে কিংবা সাময়িকভাবে ধর্মীয় চেতনার উপর নির্ভরশীল নোতুন কোনো গ্রুপ গঠন করবে।

ধনী এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তদের মধ্যে কিছু লোক হিন্দু এবং কিছু লোক মুসলমান। তবুও তারা ধর্মের দিক থেকে ভিন্ন গ্রুপের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও গরিব কর্মচারী শ্রেণীর জোটের (যদি থাকে) মোকাবেলা করার জন্য বা সন্ত্রাসীদের আক্রমণ থেকে জান-মাল রক্ষা করার জন্য একটি বিশেষ গ্রুপ গঠন করতে পারে। এরূপ কোনো গ্রুপে "বাঘে মহিষে" বা "সাপ বেজিতে" একত্র হলে, তাদের (যেমন) ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না হলেও,

www.pathagar.com

ধর্মগত অন্তর্দ্বন্দ্ব অনেক কমে যায়। পারস্পরিক সহনশীলতা বেড়ে যায়; অর্থাৎ তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দক্ষতা বেড়ে যায়। এভাবে দু'টি মৌলিকভাবে পৃথক (যেমন ধর্মবিশ্বাসের কারণে বা মতাদর্শগত কারণে) গ্রুপের (কিছু) লোকেরা যদি অন্য এক বা একাধিক কারণে একত্র হয়, তাহলে তারা যত বেশি দিক থেকে একত্র হবে, এবং একত্র হবার উক্ত কারণগুলোর গুরুত্ব যত বেশি হবে, তাদের উক্ত মৌলিক বিরোধের শত্রুসুলভ চারিত্র্য তত কম হতে থাকবে, যদিও তাদের স্বাতন্ত্র্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিলীন হয়ে যাবে না।

তাহলে, এক্ষেত্রে ধনী এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত গ্রুপের মধ্যে দু'টি ধর্মীয় গ্রুপের লোক রয়েছে। গ্রুপ দু'টিকে নিচের ভেনচিত্রের (venn diagram) মাধ্যমে দেখানো যায় :

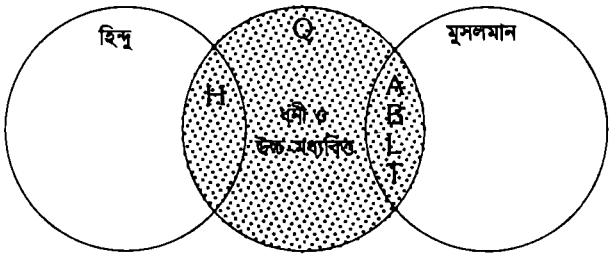

ধরা যাক আর দু'টি গ্রুপ নিম্নরূপ :

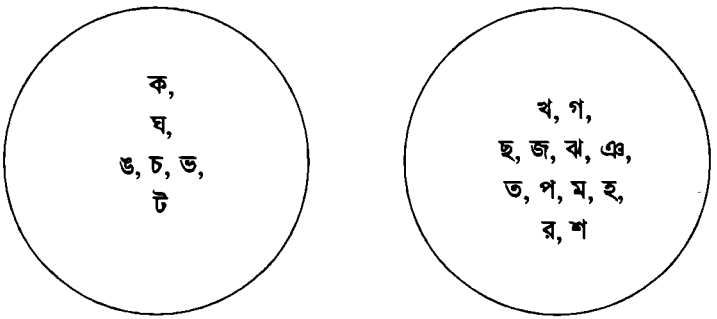

এই গ্রুপ দু'টি মূলত দু'টি শ্রেণী। Technical অর্থে এদেরকে গ্রুপ বলা যায় যদি প্রত্যেকটি গ্রুপের সবাই একটি common লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুটামুটিভাবে সংগঠিত হয়ে কাজ করে। ধরা যাক, এরা এই অর্থে কোনো গ্রুপ নয়, একই অঞ্চলের দুই প্রান্তে বসবাসকারী দুই শ্রেণীর জনগোষ্ঠী। বিভিন্ন কারণে আজকের যে বাস্তবতা, তাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে বলতেই হয় যে, গ্রুপ দুটি মৌলিকভাবে পরস্পরের প্রতি

www.pathagar.com

বৈরীভাবাপন্ন। তাদের মধ্যে চিন্তা-চেতনায়, সামাজিকতায়, উদ্দেশ্যে, বিশ্বাসে, এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যের যে পার্থক্য আছে, তা তারা জিইয়ে রাখতে চায়, যদিও তারা কোনো দাঙ্গার সৃষ্টি করছে না। এখন, যদি সময়ের প্রয়োজনে তারা স্বেচ্ছায় আরো কয়েকটি গ্রুপ গঠন করে যেগুলিতে উভয় জনগোষ্ঠী থেকে সদস্য রয়েছে, অর্থাৎ যে-গ্রুপগুলির মাধ্যমে উভয় জনগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বা কোনো নির্দিষ্ট অংশের common উদ্দেশ্য সাধিত হবে, তাহলে এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতাপূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (interaction) বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাদের মধ্যে ধর্মগত বিরোধ (conflict) কমে যাবে, বা থাকবে না, যদিও তাতে তাদের ধর্মগত স্বকীয়তার কোনো ক্ষতি হবে না। নিচের চিত্র দেখা যাক।

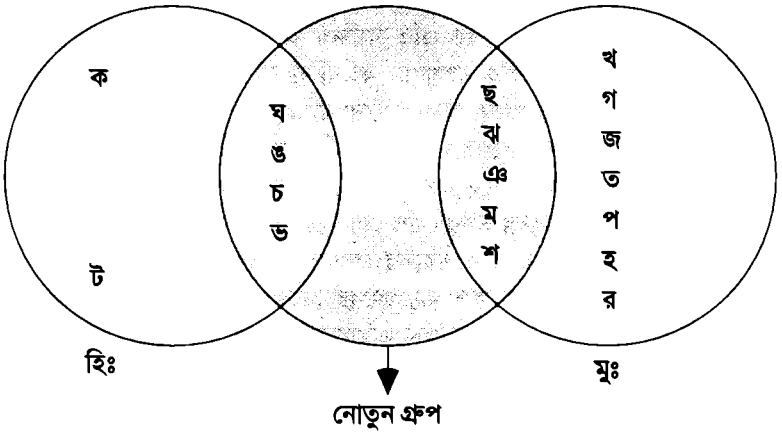

দেখা যাচ্ছে যে, নোতুন গ্রুপটিতে (তা কোনো খেলার টীম হতে পারে, হতে পারে কোনো ক্লাব ইত্যাদি) উভয় জনগোষ্ঠী থেকে লোক থাকার কারণে তাদের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক আরো গাঢ় হবার সুযোগ পাবে।

সুতরাং এই কথাগুলি মনে রাখা দরকার :

- যে-কোনো বড় জনগোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক গ্রুপ গঠনের সম্ভাবনা বর্তমান। এবং প্রয়োজনে তা গঠিত হবেও। অধিকন্তু, একই সময়ে তাদের মধ্যে একাধিক গ্রুপ থাকতে পারে।
- উক্ত জনসমাবেশের সবাই যদি বৃহত্তর একটি গ্রুপের অন্তর্গতও হয়, তবুও তাদের আচরণ উপরোক্ত সূত্র অনুসরণ করবে।
- একই ব্যক্তি একাধিক গ্রুপের সদস্য হতে পারে, যদি সংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলির মধ্যে স্বার্থগত কোনো দ্বন্দ্ব না থাকে।
- একটি বিশাল গ্রুপের মধ্যে অন্যান্য আনুষ্ঠানিক (formal) বা অনানুষ্ঠানিক (informal) সম্ভাব্য গ্রুপ গঠনের সুযোগ না থাকলে, যদি ক্ষুদ্রতর অন্যান্য

www.pathagar.com

এক বা একাধিক গ্রুপ গঠন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে বৃহত্তর গ্রুপটির ঐক্য (group cohesiveness) বিনষ্ট হবে, এবং ঐ গ্রুপের বাইরের কোনো সহযোগিতা তাদেরকে গ্রুপ গঠনে প্রভাবিত করবে।

- ধর্মবোধ দ্বারা উজ্জীবিত বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবকে পুঁজি ক'রে কোনো গ্রুপ গঠন করলে, সে গ্রুপকে ধর্মের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় এমন অন্য কোনো গ্রুপের সাথে মেলানো বা শান্তিপূর্ণ এবং সহযোগিতাপূর্ণ সহাবস্থানে অবস্থান করানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আবার ধর্মের প্রতি অনীহা দেখালে বা বিরূপ হলেও ধর্মকে পুঁজি ক'রে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা গ্রুপ গঠন করবেই।
- একই সময়ে কোনো ব্যক্তি একাধিক গ্রুপের সদস্য হলেও তার কাছে সব গ্রুপের গুরুত্ব সমান হয় না। কিসের ভিত্তিতে গ্রুপ গঠিত হল তার উপর নির্ভর করবে সে গ্রুপের প্রতি ব্যক্তির আকর্ষণ কতখানি হবে। যেমন, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পেশাগত মর্যাদা বা দাবি বা বৈধ অধিকার আদায়ের জন্য কোনো গ্রুপ গঠিত হলে, কোনো ব্যক্তি ঐ গ্রুপকেই বেশি গুরুত্ব দিবে, যদিও সে অন্যান্য গ্রুপেরও সদস্য (ধর্ম বাদে)। তবে একেক সময়ে একেক প্রয়োজন মানুষের কাছে বড় হয়ে ওঠে। ফলে সে একেক সময়ে একেক গ্রুপের লক্ষ্য অর্জনের উপর বেশি জোর দেয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গ্রুপ গঠনের প্রবণতা মানুষকে যেমন ঐক্যবদ্ধ করে, তেমনি তা সদস্যদেরকে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপের দিকে আকৃষ্ট ক'রে বৃহত্তর গ্রুপটির ভাঙ্গনের কারণ হতে পারে। **এই ভাঙ্গন এড়ানোর উপায় হল আগে ভাগে বৃহত্তর গ্রুপটিকে ভেঙে দেয়া**। অর্থাৎ বৃহত্তর গ্রুপটির মধ্যেই অন্যান্য সম্ভাব্য সব ধরনের গ্রুপ গঠনের সুযোগ তৈরি ক'রে দেয়া, যেগুলির লক্ষ্য বৃহত্তর গ্রুপটির লক্ষ্যের পরিপন্থী নয়।

গ্রুপের বড় রহস্যটি এই যে, আমি কোন দলে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবার জন্য মানুষ নিজেকে এই প্রশ্নটিও ক'রে থাকে—আমি কোন দলে নই। যে সীমারেখা দ্বারা আমরা "আমাদেরকে" একত্র করি, ঠিক সেই সীমারেখা দ্বারাই আমরা "তাদেরকে" আলাদা ক'রে দেই। অর্থাৎ দলের যে-আকর্ষণ কোনো সদস্যকে কাছে টেনে রাখে, তাই-ই তাকে "অন্য" দল থেকে দূরে ঠেলে দেয়। দলের এই পক্ষপাতিত্ব (ingroup bias) সদস্যকে দলের প্রতি আকর্ষণ করে। ফলে, একই গ্রুপের মধ্যে অন্যান্য গ্রুপ গঠিত হলে একটি গ্রুপের সাথে অন্য একটি গ্রুপের কিছুটা দ্বন্দ্ব (conflict) রয়ে যাবে। তবে তা ক্ষতিকর হবে না, কারণ সবগুলি গ্রুপই একটিমাত্র বৃহত্তর গ্রুপের সদস্য। বরং এই দলপ্রীতি (ingroup bias) প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে বিরোধিতাকে চাঙ্গা রাখতে সাহায্য করবে।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কোনো ব্যাপক কর্মসূচি বা উদ্দেশ্য ছাড়াও যদি সাময়িকভাবে কেবল নাম দ্বারা দু'টি বিরোধী গ্রুপকে চিহ্নিত করা হয়, সেক্ষেত্রেও নিজের গ্রুপের পক্ষপাতিত্ব এবং প্রতিপক্ষ গ্রুপের বিরোধিতার বোধ মানুষের মনে জাগ্রত হয়ে ওঠে। কোনো রূপ দাঙ্গা বা রক্তপাতের পথে না গিয়েও মানুষের এই দল-প্রবণতাকে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করা যায়।

www.pathagar.com

সরলতার সূত্র
(Law of candor)

মানুষ রাজনৈতিক জীব। কিন্তু রাজনীতি কখনো জ্যামিতিক সরলরেখায় চলে না; তার গতিপথ কুটিল এবং বক্র। ফলে নেতাকেও এসব জটিলতা ম্যানেজ করতে করতে জটিল হয়ে যেতে হয়। মানুষের মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, সামাজিকতা, কৃষ্টি ইত্যাদির জটিল জিলিপির প্যাঁচই রাজনীতি। সুতরাং সফল নেতা হতে গেলে, এবং এই প্যাঁচ "খুলতে" হলে, উল্টো প্যাঁচ লাগানো ছাড়া নেতার সামনে আর কোনো পথ খোলা থাকে না। ফলে, আবশ্যিকভাবে, নেতাকে জটিল এবং কুটিল হতে হয়। মিথ্যা দোষ এড়ানোর উদ্দেশ্যে তাকে সত্যের আশ্রয় নেয়ার পাশাপাশি আরো বড় মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। সত্য দোষও আবার গায়ে সয় না; ফলে ডাহা মিথ্যার হাতুড়ি দিয়ে সত্যের দম্ভ চূর্ণ ক'রে দেয়ার যজ্ঞ চালাতে হয়। নিজের অক্ষমতাকে অন্যের বা অবস্থার উপর চাপাতে হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে এ হল জটিল পথ। সত্য খুবই সরল সোজা। অথচ নেতৃত্ব জটিলতার দাবি রাখে। সুতরাং নেতাকে জটিল হতেই হবে।

এ হল নেতৃত্ব সম্বন্ধে প্রধানত এশিয়ার কয়েকটি দেশের নেতাদের গতানুগতিক মনোভাব। কিন্তু এ মনোভাব আবশ্যিক নয়।

নেতাকে জটিল হলে চলবে না। তাকে সরল হতে হবে, তবে জটিলতা পরিহার ক'রে নয়, জটিলতাকে অতিক্রম ক'রে।

বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের নেতৃত্বের সবচেয়ে প্রধান—এবং সম্ভবত সবচেয়ে ঘৃণ্য—বৈশিষ্ট্য হল, নিজের এবং নিজের দলের একেবারে সাফাই গাওয়া, কোনো দোষই—ছোট হোক বা বড় হোক, নিজের হোক বা অন্যের হোক, অতীতের হোক বা বর্তমানের হোক, প্রয়াত নেতার বা জীবিত নেতৃবৃন্দের হোক—কেউ গায়ে মাখতে চায় না। প্রত্যেকেই নিজেকে এবং নিজের দলকে একশ' ভাগ নির্দোষ এবং "দুধে ধোয়া" ব'লে প্রচার করতে ওস্তাদ। একই সাথে, প্রত্যেকেই সব দোষ ঢালাওভাবে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে চাপাতে অত্যন্ত পটু। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য যাতে কোনো দোষ নেই তাতেও দোষের লেবেল সেঁটে দেবার পায়তারা চলে। ভাবখানা এমন যেন দোষ-ত্রুটি মানুষের হয় না, নেতার তো দূরের কথা।

কিন্তু জনগণ জানে কেউই দোষের উর্ধ্বে নয়।

www.pathagar.com

জনগণের বিশ্বাস মানব জাতির মধ্যে নেতারাই সবচেয়ে বেশি দোষ করে।

ফলে, জনগণ নেতাদের এসব ডাহা সাফাই গাওয়াকে ঘৃণার চোখে দেখে। এসব কারণে জনগণের কাছে নেতাদেরকে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে হয়। জনগণ এমন কারো কোনো কথাই বিশ্বাস করতে চায় না যার কোনো দোষই নেই। পুরোপুরি নির্দোষ হওয়া নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এক প্রকারের "অপরাধ"—কারণ এরূপ প্রচার জনগণকে ধোঁকা দেয়ারই নামান্তর, যেহেতু জনগণ আগে থেকেই জানে যে নেতারা কোনো না কোনো দোষে দোষী—তা সত্য হোক বা না হোক।

অতএব, জনগণ যাকে যেভাবে দেখতে চায়, তার উচিত জনগণের সামনে সেভাবে উপস্থিত হওয়া। তাতে নিজের মর্যাদা সহজে রক্ষা করা যায়। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ : জনতার সামনে বেশি ভান ক'রে ভালো সাজতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

সরলতার সূত্র অনুসারে, জনগণের সামনে নিজের বা নিজের দলের কিছু কিছু দোষ স্বীকার করা ভালো। আপনার মুখ থেকে আপনার নিজের বা নিজের দলের ঢালাও প্রশংসা শুনে জনগণ তার খুব সামান্যই বিশ্বাস করবে; অথচ আপনিই যদি নিজের কিছু ত্রুটিকে নিজের মুখে অকপটে প্রকাশ করেন, তাহলে জনগণ আপনার অন্যান্য কথাগুলি বেশি বিশ্বাস করবে। জনগণ আগে থেকেই জানে (অর্থাৎ মনে করে) যে আপনার কিছু ত্রুটি আছে। আপনিও স্বীকার করলেন যে আপনার উক্ত দোষ আছে। তখন জনগণের মনোভাবের সাথে আপনার মুখের কথার চমৎকার একটি মিল স্থাপিত হয়ে গেল। আপনি তাদেরকে তাই বলেছেন যা তারা শুনতে চেয়েছিল। ফলে তারা বিশ্বাস করল যে আপনার কিছু ত্রুটি আছে। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করল যে আপনি বলেছেন যে আপনার কিছু ত্রুটি আছে। অর্থাৎ তারা আপনার স্বীকারোক্তিকে বিশ্বাস করল। অর্থাৎ তারা আপনার কথার এক অংশ বিশ্বাস করল। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, তারা আপনার অন্যান্য কথাও বিনা বিচারে বিশ্বাস করবে। উদ্দেশ্য থাকা উচিত মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে ঢুকে পড়ার সুযোগ খোঁজা—নিজের ভুল স্বীকার ক'রে হোক কিংবা ভুল না ক'রেও কিছু দোষ গায়ে টেনে নিয়ে হোক। মানুষ আপনার স্বীকারোক্তিকে বিশ্বাস করলে আপনার সত্য (এবং অনেক মিথ্যা) দাবি এবং প্রচারকেও বিশ্বাস করবে। মনে রাখা উচিত :

আমরা যা বলতে চাই জনগণ তা শুনতে নাও চাইতে পারে; অনেক সময় আমাদেরকে তাই-ই বলতে হয় যা জনগণ শুনতে চায়।

উন্নত বিশ্বের নেতৃত্বের দিকে তাকালে আমরা এরূপ "সরলতার" সফল নজির খুঁজে পাব। দলমত নির্বিশেষে সবারই নিশ্চয়ই মনে আছে বঙ্গবন্ধুর সেই অকপট স্বীকারোক্তি—আমার সামনে চোর পেছনে চোর ডাইনে চোর বায়ে চোর . . .। এই স্বীকারোক্তি দ্বারা কি অদ্ভুতভাবেই না তিনি জনগণের মনে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন! এমনকি এখনও প্রতিপক্ষ দলও আওয়ামী লীগের উপর বিভিন্ন দোষ

www.pathagar.com

চাপানোর প্রচারণায় বঙ্গবন্ধুর সেই কথাটি ব্যবহার ক'রে থাকেন। তার কথা প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা মানে তাকে বিশ্বাস করা। তাকে বিশ্বাস করা মানে অন্তত উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে হলেও তার কথাটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে ক'রে তার সততার প্রতি নিজের অজান্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করা। সততাপূর্ণ সরলতার মৃত্যু নেই।

আপনার চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত? কিংবা নাকটা ড্যাবা? কিংবা চোখ দুটো হাস্যকরভাবে ছোট? কিংবা দাঁত উঁচু? নিঃসন্দেহে, তাহলে, আপনি এ অবস্থায় অন্যের সামনে গিয়ে খুব বিব্রত বোধ করেন। কেউ আপনার ড্যাবা নাকের দিকে তাকিয়ে থাকলে আপনার মনটা ছোট হয়ে যায়। দাঁতগুলো কাউকে দেখাতে চান না ব'লে আপনি গাল বন্ধ ক'রে গালের হাসি নাক দিয়ে বের ক'রে দেন। বড় inferiority complex-এ ভুগতে হয় আপনাকে। ফলে মনটাও থাকে উড়ু উড়ু : ঐ বুঝি কেউ আমার নাকের কুশ্রিতার দিকে নজর দিল! ফল : টেনশন, এবং ছোটখাট জিনিসে রেগে যাওয়া। কপালেরও দোষ : যত লোক সব আপনার নাক বা দাঁতের দিকেই তাকিয়ে পড়ে। আপনার ইচ্ছে করে নিজে মরতে না হয় যে আপনাকে দেখছে তাকে মারতে।

কিন্তু ব্যাপারটা ভারি সহজে সমাধানযোগ্য। আপনার চেহারা খারাপ হলে নিজেই নিজের চেহারার বিদ্রুপ করবেন। দেখবেন আর সবাই তখন উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। তাতে আপনার মনটাও আরো খোলাসা হবে।

নিজের ত্রুটি সবার আগে নিজেই স্বীকার করা ভালো। তাতে অন্যের বলার জন্য আর সুযোগ থাকে না। মনে রাখা দরকার : সততা এখনও উৎকৃষ্ট পন্থা।

তবে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

● If it ain't broke, don't fix it—অর্থাৎ যা ভাঙেনি, তা জোড়া লাগাতে যাবেন না। যে দোষ কেউ দেখেনি, এবং জানতে পারবে না ব'লে মনে করেন, তা স্বেচ্ছায় কাউকে জানাতে যাওয়া ঠিক নয়। "মাচার ওপর কে? আমি গুড় খাই না" গোছের স্বীকারোক্তির মত বোকামির কোনো মানে হয় না।

● যে-ত্রুটি আপনার আছে ব'লে "অধিকাংশ" জনগণ মনে করে, এবং যা অস্বীকার করলেও তাদের মন থেকে সে বিশ্বাস মুছে ফেলা সম্ভব নয়, তা অকপটে কিংবা আংশিকভাবে স্বীকার করুন। "মানুষ সেই যুক্তি বেশি বিশ্বাস করে যা সে নিজেই নিজের সামনে দাঁড় করায়" (Blaise Pascal)।

● যে ভুল স্বীকার করলে আপনার অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তা স্বীকার করতে যাওয়া ঠিক নয়।

● শুধু বেছে বেছে ভুল স্বীকার করলেই হবে না, কাজের মাধ্যমে জনগণকে আশ্বস্ত করতে হবে যে আপনি উক্ত ভুলকে নিজেই ঘৃণা করেন। শিক্ষণীয় বিষয় এই যে,

www.pathagar.com

জার্মানবাসীরাই এখন হিটলারকে ঘৃণা করে—অন্তত তারা বিশ্বের সামনে তাই-ই প্রকাশ করে।

গত '৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়ের একটি প্রধান কারণও হল তাদের বিগত দিনের কিছু কিছু ভুল অকপটে স্বীকার ক'রে নেয়া।

● অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো ভুলের কথা উল্লেখ না ক'রে, সাধারণভাবে "মানবীয়" বিভিন্ন ভুলের কথা স্বীকার করা ভালো।

সবাই ভুল করে। কিন্তু তা অকপটে স্বীকার করার সাহস এবং যোগ্যতা সবার নেই। সফল নেতার তা থাকা উচিত।

www.pathagar.com

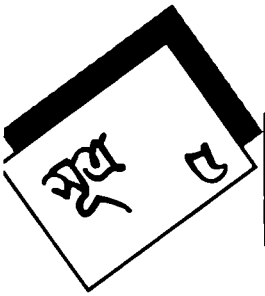

সফলতার সূত্র
(Laws of success)

লক্ষ্য অর্জন করতে পারা মানেই সফলতা। যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করতে হয়, তা হল দলের লক্ষ্য। কিন্তু দলের লক্ষ্য অর্জিত হয় প্রত্যেক নেতার লক্ষ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে। সুতরাং ব্যবহারিক সুবিধার জন্য দলীয় সফলতাকে বিভিন্ন অঞ্চলের এবং নেতার সফলতায় বিভক্ত ক'রে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আবার যারা স্বতন্ত্রভাবে নেতৃত্ব দিতে চান, তাদের জন্য দলের কথাটি প্রাসঙ্গিক নয়। সুতরাং এখানে আমরা দলীয় সফলতার বদলে নেতৃত্বের সফলতার দিকে ইঙ্গিত করব।

সফলতার প্রসঙ্গ যখনই ব্যক্তি-নেতার পর্যায়ে নেমে আসে, তখন, সঙ্গত কারণেই, তা প্রধানত তাদের নিজ নিজ পর্যায়ের সফলতার সাথে আবশ্যিকভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের নেতার সফলতা ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলের কার্যক্রম এবং নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে। নেতা, উদাহরণস্বরূপ, যত উঁচু পর্যায়ের হবেন, তার নেতৃত্বের কৌশলও হবে ততটা আবেগ-নির্ভর এবং ক্যারিজম্যাটিক; অপরপক্ষে, তিনি যত জনতার কাছাকাছি বা মাঠ পর্যায়ের নেতা হবেন, তার কৌশল হবে তত কাজ-প্রধান বা কর্মনির্ভর। কিন্তু জনগণের চোখে সফলতা মানে নির্বাচনে জয়ী হওয়া। এই জয়, আমরা জানি, নেতৃত্বের সব পর্যায়েই হয়ে থাকে। এই জয়ই সব দলের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সফলতার দুঃখজনক সত্য এই যে :

সফলতা বিফলতা ডেকে আনে।
(Success leads to failure.)

মানুষ যখন সফলতা অর্জন করে, তখন সে দিন দিন কম বস্তুনিষ্ঠ হতে থাকে। তখন জনগণ কী চায় তা ভুলে গিয়ে সে নিজে কী চায় তার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। দম্ভ এবং অহঙ্কার তাকে পেয়ে বসে। অহঙ্কার পতন ঘটায়, ঔদ্ধত্য ঘটায় ধ্বংস।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কথাগুলো দুঃখজনকভাবে সত্য। এখানে জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েই অনেকে ভাবে যে সে বুঝি রাজা বনে গেছে। জনগণ তখন তার কাছে প্রজা। রাষ্ট্র তখন জনগণের নয়, তার নিজের। ঘুষ দুর্নীতি কেলেংকারির মধ্যে তখন সে আখের খোঁজে; কেউ কেউ সরকারী ভাতা গ্রহণ না ক'রে কোষাগারে দান ক'রে দেশের

www.pathagar.com

পঙ্গু অর্থনীতিকে চাঙ্গা ক'রে তোলার মহান ব্রত পালনের প্রয়াস পান। তখন দেশ গড়ার রাজনীতি ভুলে গিয়ে তারা ব্যক্তিগত প্রতিশোধের আক্রোশনীতি চর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন তাদের কাছে জনগণ মানে শুধু মুষ্টিমেয় সেই ক'জন লোক যারা তাদের দলীয় কর্মী। দলীয়করণ এবং স্বজনপ্রীতি গোটা সরকার ব্যবস্থাকে কলুষিত ক'রে দেয়। রাস্তা-ঘাট প্রতিষ্ঠানে চলে নামকরণ এবং নামবদলের ছেলেখেলা। মোটকথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে, তার মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, কোনো দল যেন *সরকার গঠন* করেনি, দেশের রাষ্ট্রপরিচালনার যন্ত্রটিকে *দখল করে* বসে আছে।

আসল কথা হল, সত্যিকার অর্থে জনগণের মন পেতে হলে দলীয় প্রচেষ্টায় ক্ষমতায় যেতে হবে বটে, তবে, ক্ষমতা লাভের পর, বৃহত্তর দলীয় এবং জাতীয় স্বার্থে, গোটা দেশবাসীকেই দলীয় কর্মী এবং সমর্থক হিসেবে গণ্য করতে হবে। তাতে কিছু কর্মী হারাতে হতে পারে বটে, তবে মনে রাখা দরকার, সামান্য কিছু কর্মী মানেই গোটা জনগণ নয়। ভোট দেয় জনগণ। দেশের আইন-শৃঙ্খলা কঠোর এবং দলীয় প্রভাবমুক্ত হলে স্বার্থপর এবং দাঙ্গাপ্রিয় কর্মী ছাড়াও দল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ক'রে জনগণের মন পাওয়া সম্ভব। এবং ওটাই হল প্রকৃত গণতন্ত্র।

সফলতার দ্বিতীয় সূত্রটি সম্বন্ধে আমরা আগেই কোনো এক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সূত্রটি সত্য, অন্তত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে; এবং সত্য বলেই তা দুঃখজনক।

কেউ সফল হলে মানুষ তাকে সমর্থন করতে শুরু করে, এবং ভুলে যায় সে কিভাবে বা কী উপায়ে সফল হয়েছিল।

(Success justifies the means.)

জনগণ যদি পরবর্তীতে কালো পথে ক্ষমতায় আসা ব্যক্তিকে সমর্থনই করে, এবং উক্ত জনগণ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহলে আর কী-ই বা করার থাকতে পারে? তবে মানুষ যত শিক্ষিত এবং সচেতন হচ্ছে, ততই এরূপ সফলতার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই সূত্র আর কার্যকর হবার সুযোগ পাবে না। ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে জবরদস্তি অবশ্য কেবল উচ্চতম পর্যায়েই ক্ষণিকের জন্য সফলতা লাভ করতে পারে, অন্য কোনো পর্যায়ে নয়। কিন্তু একটি কথা বলা দরকার, অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় এসে যেসব দল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করে, কোনো সফল গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত তাকে অবৈধ এবং রাষ্ট্রদ্রোহী ব'লে ঘোষণা ক'রে সে অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ নেয়া—সে দলের সমর্থক যত বেশিই হোক না কেন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? তাছাড়া, এক দোষী কখনো আরেক দোষীর বিচার করতে পারে না।

গ্রীক সভ্যতার যুগের সফিস্টদের "Might makes right" বা "জোর যার অধিকার তার" নীতিতে এখনও অনেক নেতা পুরোপুরি আস্থা রাখেন। কিন্তু সুস্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আসল সত্য হল Right is might—অর্থাৎ অধিকার এক দিন ক্ষমতা লাভ করবেই। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, দীর্ঘমেয়াদে (long term-এ) জয় জনগণেরই। সুতরাং জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে তা আপাতত সফল হলেও ভবিষ্যতে বিফলতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে বাধ্য।

www.pathagar.com

সূত্র ৬

টিকে থাকার সূত্র
(Law of survival)

যে সহে, সে রহে। এই কথাটি মানব জীবনের অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রের চেয়ে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আরো বেশি সত্য। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে উত্থান পতন সবই আছে। থাকবেও। বিশেষ ক'রে নোতুন বা গতানুগতিক ধারা থেকে ব্যতিক্রম বা অপেক্ষাকৃত বিপ্লবধর্মী বা সৎ নেতৃত্বকে স্থান গেড়ে বসতে হলে তাকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে হয়। প্রথম প্রথম সমর্থক না পাওয়া গেলে "একলা চল রে" নীতিতে অটল থেকে এগিয়ে যেতে হয়। যে ব্যক্তি নিজে চলতে পারে না, মানুষ কখনও তাকে অনুসরণ করে না। মানুষ মনে করে তাদের যাবতীয় গঠনমূলক শক্তির উৎস হল বলিষ্ঠ এবং যোগ্য নেতৃত্ব। কাজেই, নেতা যদি না দেখাতে পারেন যে তিনি সত্যিকারে মানসিক বলে বলীয়ান, তাহলে কেউই তাকে অনুসরণ করবে না। যদিও নেতার যাবতীয় ক্ষমতার উৎস জনগণ, তবুও স্বয়ং জনগণের ধারণা এই যে, তাদের সমস্ত শক্তি আসে নেতার কাছ থেকে। এ কারণে কথা কাজ এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নেতাকে প্রমাণ করতেই হবে যে তিনি কোনো প্রতিকূলতার তোয়াক্কা করেন না, তিনি শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও এগিয়ে যাবেন। জনগণ নেতার কাছ থেকে কিছুই চায় না; শুধু চায় আশ্বাস—তাদের জন্য কঠোর সংগ্রাম ক'রে যাবার আশ্বাস, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার আশ্বাস। মোটকথা, জনগণ তাকেই সমর্থন করবে যাকে তারা নির্ভর করতে পারবে ব'লে তারা মনে করে। এ কারণে টিকে থাকা চাই।

www.pathagar.com

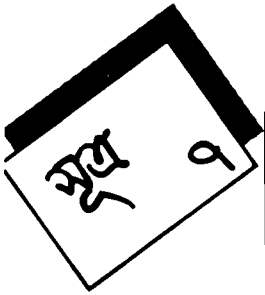

সমর্থক ছাড়া নেতার অস্তিত্ব মিথ্যা
(No leader without followers)

"গায়ে মানে না আপনি মোড়ল" সেজে কোনো প্রতিষ্ঠানে বাহুবল বা টাকার দৌরাত্ম্যে উড়ে এসে জুড়ে বসলে মুহূর্তের জন্য ক্ষমতা দখল করা গেলেও নেতা হওয়া যায় না। নেতা তিনিই যাকে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করে। জোর ক'রে মানুষের মাথা নোয়ালে কিছুদিন সন্ত্রাসী হয়ে টিকে থাকা যেতে পারে, তবে বেশি দিন নয়। নেতা হতে গেলে সমর্থক চাই-ই—হোক তারা সংখ্যায় কম বা বেশি। অবশ্য, বাস্তবতা দেখে অনেকে মনে করেন, ছলে বলে কোনোভাবে একবার ক্ষমতা দখল ক'রে পরে গুটিকয়েক সাজানো সমর্থক যোগাড় করতে পারলেও কিছুদিন টিকে থাকা যায়। এই টিকে থাকাকালীন সময়ে অন্য কোনো কৌশলে কিছু লোকের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন অর্জন করতে পারলে কিছুটা—অন্তত বিশেষ কোনো একটি মহলে—বৈধতাও পাওয়া যায়। একথা কিছুটা সত্য বটে, তবে কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে কথাটা কিছুটা সত্য হতে পারে, যেহেতু এরূপ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে এই অপশক্তিকে দমন করার জন্য কোনো বৃহত্তর শক্তি প্রস্তুত থাকে না। কিন্তু এর চেয়ে ঝুঁকির কাজ আর দ্বিতীয়টি নেই। তাছাড়া অল্প কয়েক দিনের জন্য পেশীশক্তির বদৌলতে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারলেও তার পরিণাম হয় ভয়াবহ। একথা সবারই জানা। তবে রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা-কাঠামোকে এভাবে আক্রমণ করা সম্ভব নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইন সক্রিয়। অধিকন্তু, দেশে নিদারুণ অরাজকতা বিরাজ না করলে "জোর" দ্বারা কখনো "মুলুক" জয় করা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রেও কথা থেকে যায় : ক্ষমতা দখলকারী দলকে ব্যাপক জনসমর্থন অর্জন করতে হবে। যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে উক্ত স্বৈরাচারী ক্ষমতা বৈধ গণতান্ত্রিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত হবে। বাংলাদেশেই এর জ্বলন্ত উদাহরণ আছে বৈকি!

তবে, আশা করা যায়, এবং সঙ্গত কারণে আশ্বস্ত হওয়া যায়, ভবিষ্যতে আর কোনো কালো শক্তি এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা "রাতারাতি" দখল করতে পারবে না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ডিঙিয়ে এ দেশে আর কেউই কোনো চক্রান্তে সুবিধা করতে পারবে না, যেহেতু স্বাধীনতা-উত্তরকালের অরাজকতা এখন আর নেই। জনগণ এখন ভালোভাবেই বোঝে স্বাধীনতা মানে শুধু বহিঃশক্তির প্রভাবমুক্ত থাকা নয়, স্বাধীনতা মানে পূর্ণ গণতন্ত্র।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৯

সুতরাং, প্রিয় নেতা...

www.pathagar.com

আপনাকে দেখতে হবে তাই, যা আর দশ জনে দ্যাখে, কিন্তু আপনাকে তাই ভাবতে হবে, যা খুব কম লোকই ভেবে থাকে। অর্থাৎ আপনাকে তুখোড় চিন্তাশীল হতে হবে, হতে হবে সত্যিকার অর্থে সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী। অধিকাংশ সময়েই আমরা চিন্তা করি পরিস্থিতির প্রয়োজনে, অবস্থা দ্বারা তাড়িত হয়ে। কিন্তু মানুষের এমনই শক্তি আছে যে, সে তার চিন্তার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার চিন্তার শক্তি আরো বাড়াতে পারে। আমরা কিভাবে চিন্তা করি এবং কিভাবে চিন্তা করলে চিন্তাশক্তি আরো বৃদ্ধি করা যায়, এবং, এমনকি, কিভাবে চিন্তা করলে আমরা চিন্তার গতানুগতিক ধারা অতিক্রম ক'রে নোতুন নোতুন জ্ঞান অর্জন এবং কৌশলের সন্ধান করার ক্ষেত্রে সফল হতে পারি, তা নিয়ে চিন্তা করার শক্তিও আমাদের আছে। সঠিক উপায় অবলম্বন ক'রে, এবং উপযুক্ত ও মধুর মানসিক ব্যায়াম অনুশীলনের মধ্য দিয়ে, আমরা আমাদের যৌক্তিক এবং সৃজনশীল চিন্তার শক্তিকে অসীম পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারি! অতএব আপনাকে এসব ব্যাপারে ওয়াকেবহাল হতে হবে। তবে এই বইয়ের ক্ষুদ্র পরিসরে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয় ব'লে কৌতুহলী পাঠক ইচ্ছে করলে এই লেখকের *সৃজনশীলতার রহস্য : সৃজনশীল চিন্তার কৌশল এবং প্রয়োগ* নামক বইটি প'ড়ে দেখতে পারেন।

আপনার চিন্তার ধরনের উপর নির্ভর করছে আপনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন ধরনের সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করবেন। একজন নেতার প্রতিটি সিদ্ধান্তই তার প্রভাব এবং ক্ষমতা কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং ভেবে-চিন্তেই কাজ করতে হবে; কাজ করার পরও ভাবতে হবে। আগে থেকেই স্থির করতে হবে কখন প্রগতিশীল (proactive) চিন্তা করতে হবে—অর্থাৎ কখন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিস্থিতি থেকে শুরু ক'রে ভাবতে হবে পেছন দিকে বর্তমান পর্যন্ত, এবং কখন প্রতিক্রিয়াশীল (reactive) চিন্তা করতে হবে—অর্থাৎ কখন মুহূর্তের প্রয়োজনে মুহূর্তের সিদ্ধান্ত স্থির করতে হবে। বর্তমানের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই আমাদেরকে নিতে হয় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। দৃষ্টিকে শুধু বর্তমানের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ রাখলে আমরা কেবল অতীতের অমোঘ টানে পেছন দিকে যেতে থাকব, কারণ বর্তমান সর্বদা অতীতগামী।

আধুনিক সৃজনশীল চিন্তার একটি বড় আবিষ্কার হল এই যে, সময়ের জন্ম অদৃশ্য ভবিষ্যতে, এবং তা প্রবাহমান "বিস্ময়মান" এবং ক্ষীয়মান অতীতের দিকে। আমরা প্রতিদিন দেখি যে, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এ থেকে সচরাচর এখনও অনেকে (যারা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সঠিক তথ্যটি জানে না) ভেবে বসে যে, সূর্য পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরছে। কিন্তু আসল ঘটনাটি তার উল্টো : পৃথিবী তার অক্ষের উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। প্রথম ধারণা যার সেও দেখছে যে সূর্য পূর্বে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়; দ্বিতীয় ধারণা যার সেও ঠিক একই জিনিস দেখছে—সূর্য পূর্বে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি যা দেখল, তাকেই সে কারণ হিসেবে ভেবে বসে থাকল; অথচ দ্বিতীয় ব্যক্তি যা দেখল, তাকে সে একটি

www.pathagar.com

ফল (result) বা ঘটনা (phenomenon) হিসেবে বিবেচনা ক'রে কারণ খুঁজে পেল অন্য কোথাও। অতএব, চোখকে দেখার সুযোগ দিয়ে মনটাকেও ভাবার সুযোগ দিতে হবে। আরো সোজা কথায়, যা দেখলাম তাকে অতিক্রম ক'রে যা দেখিনি অথচ যার অস্তিত্ব আছে, সে পর্যন্তও চিন্তাকে পৌঁছে দেয়া চাই। জানা থেকে অজানায় পৌঁছানোর প্রক্রিয়ার নামই সফল চিন্তা।

যাহোক, সময় এসেছে বাস্তবতাকে ভিন্নভাবে বোঝার। জীবন এগিয়ে যায় অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে; আর সময় ধাবিত হয় ভবিষ্যত থেকে দূর অতীতের দিকে। সুতরাং অনাগত সময় আমাদের জন্য কী নিয়ে আসবে তা ভেবে দেখা দরকার। নইলে তা যাবার সময় আমাদের যা আছে তাও ছিনিয়ে নিয়ে অতীতের দিকে হারিয়ে যাবে। সুতরাং, সেই আগের কথাটাই আবার বলতে হয় : দেখতে হবে (অতীতের আলোকে) বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে, কিন্তু চিন্তা করতে হবে ভবিষ্যতের ভিন্ন ভিন্ন সময়বিন্দু থেকে বর্তমানের দিকে। আর এরূপ চিন্তা থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্তকে বর্তমানের কাজে খাটাতে হবে। অকারণে অতীত নিয়ে মাতামাতি করার কোনো মানে হয় না। যার দরকার প্রোটিন, মাংস বাদ দিয়ে শুধু হাড় নিয়ে কামড়া-কামড়ি করলে অচিরেই তাকে অপুষ্টিতে ভুগতে হবে।

শুধু সাহসী হলে চলবে না, সুচিন্তিতভাবে সাহসী হতে হবে। কারণ আমরা যখন ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করি, দুর্ঘটনা তখন থেকেই শুরু হয়। সামাজিক এবং রাজনৈতিক দুর্ঘটনা হুট ক'রে আসে না; তা ধীরে ধীরেই আসে। সুতরাং জাগ্রত থাকার দরকার। নিজের গতানুগতিক চিন্তার গৎ-বাঁধা গতির জড়তা সম্বন্ধে সচেতনতাই নিজের সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে ওঠার এবং সাবধানতা অবলম্বন করার প্রধান হাতিয়ার।

মানুষের জন্য এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক সত্য যে, রক্তপাত থামানোর জন্য তাকে রক্তপাতের আশ্রয় নিতে হয়। শান্তি রক্তপিপাসু। তবে মনে রাখতে হবে, শান্তি স্থাপনের জন্য রক্তদান আর রক্তপাত ঘটিয়ে শান্তিভঙ্গ করা অবশ্যই এক কথা নয়। রক্তপাত যদি ঘটাতেই হয়, তবে তা ঘটাতে হবে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে, সমাজের রক্তপাত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। তবুও কবির কথায় যতদূর সম্ভব সাড়া দিতে হবে : আমি চাই না লাল কালি দিয়ে কেউ কবিতা লিখুক (পূর্ণেন্দু পত্রী)।

নিজেকে চরিত্রবান ক'রে তোলা চাই। আপনি অন্ধকারে একা একা কী করছেন, তাই-ই আপনার খোদ চরিত্র। তা বেশিদিন গোপন থাকতে পারে না। সত্য আলোর মত; অন্ধকার দিয়ে তা ঢেকে রাখা যায় না। প্রকৃত সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হলে জনগণ তার মূল্যায়ণ করবেই। আকাশে সূর্য উঠলে তাকে দেখার জন্য টর্চ জ্বালানোর দরকার হয় না।

জনগণের প্রিয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং টিকে থাকতে চাইলে গতিশীল চেতনার অধিকারী হতে হবে। চেতনা হল বাস্তবতার সম্ভাব্য এবং বাঞ্ছিত ভবিষ্যত

www.pathagar.com

গতিবিধি সম্পর্কে কর্মমুখী পূর্বানুভূতি। নিজের এবং অপরের স্বপ্নকে চেতনার স্তরে উন্নীত করতে হলে তার সাথে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাজের উপাদান যোগ করতে হবে। চেতনা হল যৌক্তিক অনুভূতি যা কাজে রূপান্তরিত হবার জন্য প্রস্তুত। কিংবা, অন্য কথায়, চেতনা হল কাজ যা চিন্তার মধ্যে অস্তিত্বশীল এবং অনুভূতির মধ্যে বেগবান। প্রকৃত চেতনা আগুনের মত, যা জীর্ণতাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে চায়। চেতনা মানুষকে কর্মমুখী ভাবনা দান করে। তা বৌদ্ধিক স্তর থেকে উঠে এসে মিশে যায় দৈনন্দিন সামাজিক রক্তপ্রবাহে। সময়ের দাবি তখন রক্তের মধ্যে গতিশীল হয়ে ওঠে :

আমার রক্তে সুপুষ্ট বীজ
বপনের মন্ত্রণায় ছুটে যাই দুরন্ত মিছিলে
কর্মরণক্ষেত্রে

— এস. এম. জাকির হুসাইন,
কল্পকণা

এই চেতনাই বলে দেয় কখন আপনাকে বক্তৃতার মধ্যে গানের মিষ্টি-মধুর সুর প্রয়োগ করতে হবে, আর কখন ছাড়তে হবে হুংকার। সফল বক্তৃতা মানে যথাযোগ্য মুহূর্তে যথাযোগ্য চেতনার মৌখিক প্রকাশ। শুধু হুংকার ছাড়লেই সফল এবং ক্যারিজম্যাটিক বক্তা হওয়া যায় না। বক্তৃতা মানে শুধু মনোভাব বা উদ্দেশ্য প্রচার নয়, শুধু কর্মসূচির উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা নয়। বক্তৃতার নিজস্ব সুরও থাকতে হয়, তীক্ষ্ণতা থাকতে হয়, অনুভূতি এবং আবেগের নিয়ন্ত্রিত মাত্রা থাকতে হয়। ভাবের সঙ্গে, বক্তব্যের সঙ্গে, পরিস্থিতির সঙ্গে, উদ্দেশ্যের সঙ্গে, শ্রোতার মানসিক অবস্থা এবং অবস্থানের সঙ্গে বক্তৃতার স্রোতধারার যোগসূত্র থাকা চাই। বক্তৃতা একটি আর্ট বা শিল্প, যা কঠোর এবং সুপরিকল্পিত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জন করতে হয় এবং সুচিন্তিতভাবে পরিবেশন করতে হয়। সফল বক্তৃতা অবশ্যই কেবল কিছু কথা এবং কণ্ঠধ্বনির সংমিশ্রণ নয় : তার মধ্যে থাকা চাই সঞ্জীবনী ক্ষমতা। কণ্ঠ আপনার, তবে কথাগুলো আপনার ব্যক্তিগত নয়। বক্তৃতার ভাষার নিজস্ব অলংকার আছে, সাজসজ্জা আছে। তাতে কতখানি যুক্তি আর কতখানি আবেগের মিশ্রণ ঘটাতে হবে তাও সুচিন্তিতভাবে নির্ধারণ করা চাই। তাতে প্রাণময় বৈচিত্র্য থাকা চাই, আকর্ষণীয় চৌম্বকত্ব থাকা চাই। বক্তৃতার নিজস্ব দাড়ি, কমা, তাল, লয় থাকে। শব্দচয়নে, বাক্যবিন্যাসে, কণ্ঠস্বননে, এবং সামগ্রিক যুক্তিপ্রবাহে—বক্তৃতার প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে আর্টের প্রশ্ন জড়িত। একেক ধরনের অর্থ, যুক্তি, এবং আবেগ প্রকাশের জন্য একেক কায়দায় ভাষা এবং উচ্চারণকে ম্যানেজ করতে হয়। একজন সফল নেতার জন্য এটিও একটি আবশ্যকীয় গুণ। অবশ্য

www.pathagar.com

এত বিশাল একটি বিষয়কে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উদাহরণসহ সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আগ্রহী পাঠক এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা পাবার জন্য এই লেখকের *বক্তৃতাবিজ্ঞান* বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

যাহোক, আবার চেতনার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। মানুষের চেতনার আশু দিকটি ফুটে ওঠে বাস্তবতায়। কিন্তু অনেক নেতাই—প্রধানত উঁচু পর্যায়ের নেতারা—জনগণের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে না এসে বাস্তবতাকে বুঝতে চেষ্টা করেন পত্র-পত্রিকার প্রচারণা এবং পার্টি সহ বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রেরিত বা প্রকাশিত রিপোর্টের মাধ্যমে। তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে "বাস্তবতার" বদলে তার এক ধরনের "ব্যাখ্যা"ই বেশি প্রাধান্য পায়। ফলে উর্ধ্বতন এসব নেতা অনেক সময় সত্যিকারের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, যার কারণে কর্মসূচি বা নীতি নির্ধারণে তারা অনেক সময় ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেন, যার মাশুল দিতে হয় নেতা এবং পার্টি উভয়কেই। এ প্রসঙ্গে আমি প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের নেতাদেরকে একটি কথা বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই : শেক্সপীয়র বলেছিলেন কানকে বিশ্বাস না ক'রে চোখকে বিশ্বাস করতে। একই কথার চমৎকার একটি প্রতিফলন ঘটেছিল রীগ্যানকে বলা গর্বাচেভের একটি কথায় : একশ' বার শোনার চেয়ে একবার নিজের চোখে দেখা অনেক কার্যকর।

এবার জনগণের দিকে শেষবারের মত চোখ ফেরানো যাক। সত্যিকারের প্রয়োজন না এলে ঘন ঘন শ্বাসরুদ্ধকর হরতাল, ধর্মঘট, ঘেরাও ইত্যাদি কর্মসূচি ঘোষণা করলে জনগণ বিরক্ত হয়। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশংকায় তাদের নাভিশ্বাস ওঠে। জনগণকে বিশ্রাম দেয়া চাই। তাদেরকে আন্দোলিত ক'রে তোলাও চাই—তবে ঠিক তখন, যখন তারা স্বেচ্ছায়ই তা চায়। জনগণের হাত-পা বেঁধে রেখে রাজনীতিতে কোনো দিনই সুফল ভোগ করা যায় না। জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে কবির ভাষায় এভাবে বর্ণনা করা চলে :

তার সাথে মহানন্দে থাকি
কারণ, সে বেঁধে দিয়ে ছাড়ে
এবং যতটা পারে
ছেড়ে দিয়ে বাঁধে।
— সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কবির এই "ছাড়ের মধ্যে বাঁধন" এবং "বাঁধনের মধ্যে ছাড়ের" কৌশলটি নেতাকেও ভালোভাবে জানতে হবে।

পরিশেষে বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের অনাগত সকল নেতার প্রতি একটি আহ্বান জানিয়ে বইটির ইতি টানতে চাই। কাহলিল জিব্রান বলেছেন, "পোশাক তোমাদের

www.pathagar.com

অনেক সৌন্দর্য ঢেকে রাখে, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কদর্যতাকেই গোপন করতে পারে না।" সুতরাং শুধু বাইরের অভিনয় এবং লুকোচুরির কৌশল (বা কৌশলের লুকোচুরি) দ্বারা ভেতরের কদর্যতাকে ঢেকে রাখা যায় না। সফল নেতা হতে গেলে সত্যিকার অর্থে হৃদ্যতার সৌরভ ছড়াতে হবে। তবুও আমি বলব, দেখুন, কাপড়ের ভেতরে আমরা সবাই ন্যাংটো; সবাই তা জানিও। তবে পোশাকটা আছে ব'লে তা আমরা মালুম করিনে। অতএব, মানুষের জন্য পোশাকের প্রয়োজন রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে কৌশলের, অন্তত নিজেদের জানা অনেক কিছু থেকে নিজেদেরকে উদাসীন রাখার জন্য। আর এসব কৌশলরূপ পোশাকাদির মধ্যে থেকেই আসুন আমরা এই উদ্দেশ্য নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাই :

"পৃথিবীর বুকের ভিতরে
উজ্জয়িনী আরেক পৃথিবী
আমাদেরই গ'ড়ে দিতে হবে চমৎকার।"

---

www.pathagar.com

নেতাদের জন্য এই লেখকের আরো একটি বই

বক্তৃতাবিজ্ঞান

আজকের নেতা : সফল নেতৃত্বের শত কৌশল বইটি যদি আপনাকে আকৃষ্ট করতে পেরে থাকে, তাহলে, আমাদের বিশ্বাস, এই বইটি আপনাকে পুরোপুরি মোহাবিষ্ট ক'রে রাখবে। বক্তৃতার উপর অনেক বই-ই বাজারে আছে, তবে এই বইটির সাথে সে-সব দেশি এবং বিদেশি কোনো বইয়ের তুলনাই হয় না। বইটি কোনো উপদেশবাণীর গালগপ্পে ভরা নয়। এ হল বাস্তব কৌশল। বক্তৃতার মাধ্যমে কিভাবে আপনি মানুষের কানের মধ্য দিয়ে তার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করবেন, এতে আছে সেই কৌশল। শব্দকে, বাক্যকে, বাচনভঙ্গিকে, আবেগকে, যুক্তিকে নিজের হাতে দক্ষ খেলোয়াড়ের মত নাড়াচাড়া করার পুরোপুরি প্রয়োগযোগ্য বাস্তব কৌশল। অভিনব! বইটিকে বক্তৃতার ক্ল্যাসিক ব্যাকরণও বলতে পারেন। এই বইটির যাবতীয় কৌশলই আপনাকে ব'লে দেবে কিভাবে চিন্তাকে ভাষা এবং ধ্বনির মধ্যে বিদ্যুতের মত চকমকিয়ে প্রকাশ করতে হয়। বইটি সম্বন্ধে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রোয়াজন।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই—

বাংলা ভাষা পরিক্রমা (ব্যাকরণ ও রচনা)

— এস. এম. জাকির হুসাইন

বইটির বৈশিষ্ট্যাবলী :

বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যে শিক্ষার্থীদেরকে কোনোকিছু না বুঝে মুখস্থ করার প্রয়োজন হবে না।

ষ-ত্ব বিধান, ণ-ত্ব বিধান, সন্ধি, সমাস, কারক, প্রকৃতি-প্রত্যয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপস্থাপন পদ্ধতি এত সহজ এবং পদ্ধতিগত যে কোন শিক্ষার্থী অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই সেগুলো পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে। সচরাচর কোন বাংলা ব্যাকরণ বই-ই শিক্ষার্থীদের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে না। ফলে তাদেরকে একের অধিক বইয়ের সাহায্য নিতে হয়। এই দিকটা বিবেচনা করে এই বইতে সম্ভাব্য সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বি. সি. এস. ও ডিগ্রী (পাশ ও সাবসিডিয়ারি, সম্মান) পর্যায়ের প্রয়োজনীয় রচনা, ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ ইত্যাদি এতে রয়েছে।

Tactics for Effective Reading and Critical Thinking

— by S. M. Zakir Hussain

Reading and Comprehension এর কৌশল সমন্বিত উদাহরণ। প্রচুর practice material-উত্তর এবং ব্যাখ্যাসহ। Comprehension এত জটিল জিনিস যে তা একমাত্র কৌশলে এবং practice এর মাধ্যমেই আয়ত্ত করা সম্ভব। এই বইটি পড়ে শেষ করলে আপনি শুধু degree পর্যায়ের নয়, GMAT, GRE, SAT, TOEFL এবং BCS এর Reading Comprehension গুলোর ১০০% উত্তর করতে পারবেন।

আরো থাকবে speed reading এর কৌশল। কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে জটিল passage পড়ে তার পূর্ণ অর্থ, Theme, Topic Sentence, Thematic structure, Assumption, Inference, Transitional Devices, Rhetorical Devices ইত্যাদি শুদ্ধভাবে উদ্ধার করা যায় সেই কৌশল। এসব কৌশল তাদেরও কাজে লাগবে যারা অল্প সময়ে অধিক প'ড়ে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে চান। ফলে, গবেষক, business executive, শিক্ষক সবারই বইটি অত্যন্ত কাজে লাগবে। একটি passage মাত্র ১ বার পড়ে যে তার যাবতীয় ধরনের পসযরণ এবং implied meaning কিভাবে উদ্ধার করা যায়, এ বইটিতে তার পরিপূর্ণ কৌশল পাবেন। এরূপ একটি বই খোদ ইংরেজি ভাষাতেও বিরল। সহজ ইংরেজিতে লেখা। আপনি যদি জীবনে বেশি দূর এগিয়ে যেতে চান, তাহলে বইটি আপনার জন্য অবশ্যপাঠ্য। সাহিত্য, ইতিহাস, এবং সমাজবিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানের যে-কোনো শাখার ছাত্রদের জন্য এটি একটি অনন্য বই। বইটি সংগ্রহে রাখুন এবং পড়ুন।

A Passage to the English Language

— by S. M. Zakir Hussain

ইংরেজি ভাষা গভীরভাবে, নির্ভুলভাবে, কারো সাহায্য ছাড়াই শেখার নিশ্চয়তার জন্য এই বইটি পড়ুন। MBA. BBA. Admission Test. TOEFL. GMAT. GRE. SAT. BCS-ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসহ অন্যান্য যে-কোন উচ্চতর পর্যায়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এই বইটির উপর বিশ্বস্ত হ'য়ে নির্ভর করতে পারেন। সচরাচর আপনাকে grammar-এর সমুদয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য একাধিক বই (দেশি এবং বিদেশি) এর শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই একটিমাত্র বই-ই আপনাকে সেই ঝামেলা এবং অনিশ্চয়তা থেকে রেহাই দিতে পারে। বইটি পড়ে দেখুন, এবং এর উপর যে-কোন গঠনমূলক মন্তব্য ক'রে আমাদেরকে জানান। আমরা আপনার যে-কোন গঠনমূলক পরামর্শ সম্মানের সাথে মূল্যায়ন করব।

The Anatomy of the English Sentence

— by S. M. Zakir Hussain

বইতে রয়েছে—

(১) MBA. BBA ADmission Test. GMAT. GRE. SAT-তে যে-সব বিশাল জটিল ইংরেজি বাক্য প্রশ্ন হিসেবে দেওয়া হয়, কিভাবে তাদেরকে গঠন-শৈলী বিশ্লেষণ ক'রে অর্থ উদ্ধার করা যায় এবং sentence

www.pathagar.com

টির কোথায় ভুল আছে তা নির্ভুলভাবে, অত্যন্ত সহজে নির্ণয় করা যায় সেই কৌশল। পদ্ধতিটি কৌশলগত এবং চমৎকার।

(২) কিভাবে নিজে নিজে ছোট বাক্য থেকে শুরু করে জটিল এবং বিশাল বিশাল নির্ভুল ইংরেজি বাক্য গঠন করা যায় সেই কৌশল।

(৩) MBA. BBA Admission Test. Test. GMAT. GRE. SAT-এ এসে থাকে বা আসতে পারে এমন সব সম্ভাব্য প্রশ্নের সমন্বয়ে গঠিত অত্যন্ত কার্যকরী কয়েকটি MODEL TEST.

A High Level English Course-Book—1, 2 & 3 (Spoken & Written English)

— by S. M. Zakir Hussain

এই বই দু'টি রচিত হয়েছে কেবলমাত্র তাদের জন্য যারা ইংরেজির প্রাথমিক বিষয়গুলো জানেন এবং আরো উচ্চতর পর্যায়ের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করতে চান। সুতরাং কোনো পাঠকের যদি বইটি পড়ার সময় মনে হয় যে তার প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য আরো বেশি প্রস্তুতি নেয়া দরকার, তাহলে তাকে আমরা A High Level English Course Book–1 বইটি পড়ার জন্য অনুরোধ করব। বইটির সম্বন্ধে বেশি কিছু বলার চেয়ে সহজে এটুকু বলা যায়, A High Level English Course Book–1 বইটি যদি আপনার ভাল লাগে, যদি মনে করেন যে এই পদ্ধতিতে লেখা অন্য যে-কোন বইও আপনার জন্য উপকারে আসবে, তা আপনাকে অত্যন্ত অল্প পরিশ্রমের বিনিময়ে অধিক ফল দেবে, তাহলে, আমাদের বিশ্বাস, এই বইটিও আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে।

কিছু কিছু ভারতীয় বই যা প'ড়ে বাক্য মুখস্থ করা ছাড়া উপায় নেই তা দিয়ে তো আপনার কোন লাভ নেই; আপনাকে শিখতে হবে উচ্চ পর্যায়ের ইংরেজি-এমনকি যাতে TOEFL-এর বেশ কিছুও শেখা হয়ে যাবে। উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার্থী, চাকুরীজীবি, বিদেশ গমনেচ্ছু ব্যক্তি, উচ্চাকাঙ্খী-সবার জন্যই বইটি অনন্য। ইংরেজি শিখতে কারো সাহায্য লাগে? মিথ্যে কথা! এ বইটি তা প্রমাণ করবে। কমপক্ষে ইন্টারমিডিয়েট পাশ না হলে বইটি পড়ে তেমন লাভবান হবেন না।

Word Learning Magic-Book—1

— by S. M. Zakir Hussain

পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ। Synonym এবং Antonym-এর বর্ধিত তালিকা থাকবে। প্রতিটি word-এর উচ্চারণ দেয়া থাকবে। এছাড়া Part–I ও Part–II-তে আরও নোতুন নোতুন word দেয়া হবে। যারা বইটি পড়েছেন তারা এই ২য় সংস্করণটিও পড়ে দেখুন।

Word Learning Magic-Book—2 & 3

— by S. M. Zakir Hussain

বইটি Book–1 অপেক্ষা আরও পদ্ধতিগত, সহজ, এবং সুখপাঠ্য। প্রতিটি word-এর উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। মাত্র ৫০টি ও ৪০টি root মুখস্থ করলে পুরো বইটার সমুদয় word-ই আয়ত্ত করা যাবে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬০ এবং বইটি যে কোন পাঠকেরই মন জয় করবে।

কল্পকণা

— এস. এম. জাকির হুসাইন

একটি চমৎকার কবিতার বই। তরুণ কবি এবং কাব্যামোদীদের জন্য বইটি অবশ্য পাঠ্য। পাকা হাতেরই লেখা।

আজকের নেতা : সফল নেতৃত্বের শত কৌশল

— এস. এম. জাকির হুসাইন

একটি চমৎকার বই। বাংলা ভাষায় এটাই প্রথম। আপনি যদি সফল নেতা হতে চান, কিংবা নেতৃত্বের দক্ষতা আরও বাড়াতে চান, কিংবা নিজের অঞ্চলে বা প্রতিষ্ঠান অভাবনীয় সুনাম প্রভাব এবং সাফল্য অর্জন করতে চান, তাহলে এই বইটি পড়ুন। বইটির সবগুলো পদ্ধতিই কার্যকরী এবং সহজ। এছাড়া এতে থাকবে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় কিভাবে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায় এবং কিভাবে পরিবেশের এবং পরিস্থিতির সুযোগকে সঠিকভাবে চিহ্নিত ক'রে তাকে ঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় সেই অপূর্ব কৌশল। অপরকে দিয়ে নিজের কাজ সফলভাবে করিয়ে নেয়ার কার্যকরী কৌশল এ বইটিতে পাবেন। রাজনৈতিক এবং যে-কোন প্রতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বইটি অনন্য। আজই প'ড়ে দেখুন।

চোখের তলে জলের ঝিলিক (কবিতার বই)

— এস. এম. জাকির হুসাইন

যৌবন এবং তারুণ্যের তীব্র আবেদনে ভরা একগুচ্ছ কবিতা। কবিতা যে মোটেও কঠিন না হয়ে এমনকি গল্পের চেয়েও বেশি উপাদেয় হতে পারে, এ বইটি তার প্রমাণ। এই বইটিই পারে আপনার অবসরের মুহূর্তকে আনন্দে

www.pathagar.com

আর স্বপ্নে মুখরিত ক'রে তুলতে। এই লেখকের অন্যান্য বই যারা পড়েছেন তারা তাঁর এই বইটিও পড়ে দেখুন। যারা কবিতাকে কঠিন এবং নীরস মনে ক'রে তা এড়িয়ে চলেন, তাদেরকে আমরা অন্তত এই বইটি প'ড়ে দেখতে আহ্বান জানাচ্ছি।

Word Making Tactics Book—2 & 3

— by S. M. Zakir Hussain

Book–1-এ যে সব পদ্ধতি দেয়া সম্ভব হল বা, বিশেষত আরও শক্তিশালী, জটিল, এবং উচ্চ পর্যায়ে প্রযোজ্য, সে-সব কৌশলগুলো Book–1 এর মত উপস্থাপন পদ্ধতিতেই Book–2 তে আসছে। এই বইটি ইংরেজি ভাষার উপর আপনার দখল আরও মজবুত করবে, আপনাকে দিবে সফলতার অধিক আশ্বাস।

Tactics for Learning Prepositions Book—1 & 2

— by S. M. Zakir Hussain

আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে Spoken English-এ প্রচুর সংখ্যক preposition ব্যবহৃত হয়। কারণ কি? কারণ হল prepositionকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানলে অতি সংক্ষেপে, কার্যকরীভাবে এবং idiomatically মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। আসলে ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা তারা তাদের কথাবার্তায় preposition এত বেশি ব্যবহার করে যে, আপনি হাজার ইংরেজি শিখেও একমাত্র preposition ভালভাবে না বুঝার কারণে তাদের ইংরেজির অধিকাংশই বুঝতে পারবেন না। আবার নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্য করেছেন যে preposition অধিকাংশ ব্যক্তিই কেবল চোখ বুজে মুখস্থ করতে চায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেরেও ওঠে না। কারণ তাদেরকে কোনো বই সহজ এবং আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে preposition এর idiomatic ব্যবহারের নিয়ম উপহার দিচ্ছে না।

কিন্তু আপনার আর দুশ্চিন্তা নেই। এই বইটি আপনাকে preposition-সম্পর্কিত সকল রহস্য অত্যন্ত সহজে এবং উপভোগ্য উপায়ে শেখাবে। শুধু spoken English-এর জন্য নয়, ইংরেজি ভাষা সফলভাবে এবং গভীরভাবে যে-কেউ শিখতে চান না কেন, তার জন্য এই বইটি অবশ্যপাঠ্য।

অন্ধকারের বস্ত্রহরণ

(পূর্ববর্তী প্রচারিত নাম : সৃজনশীল চিন্তার কৌশল এবং প্রয়োগ)

— এস. এম. জাকির হুসাইন

গল্পের নায়ক, বুড্ডা, জ্ঞানপুরীর সন্ধান পায়, যা আছে যুক্তির ওপারে। সেখানে যেতে হয় সম্মোহনযোগে। তার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক, উদ্ভাবনী, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতার রহস্য জানা। সে প্লেটো পড়েছে, কিন্তু প্লেটো হতে পারেনি, রাসেল চর্চা করেছে, তবুও রাসেল হতে পারেনি। সে বুঝতে পেরেছে যে প্লেটো প'ড়ে প্লেটো হওয়া যায় না, রাসেল হতে গেলে রাসেল পড়াই যথেষ্ট নয়, তাঁদের মতো হতে গেলে তাঁরা যে-দৃষ্টি দিয়ে বাস্তবতাকে দেখেছেন সেই দৃষ্টি অর্জন করতে হবে, তাঁদের মতো ক'রে ভাবতে শিখতে হবে, তাঁদের মতো ক'রে প্রশ্ন করতে শিখতে হবে—প্রকৃতিকে এবং নিজেকে। সে পেয়েও গেল উপযুক্ত শিক্ষক, শিখল বিভিন্ন *দৃষ্টিকোণ*। মাথার মধ্যে সৃজনশীল চিন্তা কিভাবে সংঘটিত হয় তা সে পুরোপুরি না জানতে পারলেও সে কার্যকরভাবে জানতে পেরেছে কিভাবে নিজের মধ্যে সৃজনশীলতাকে উস্কে দিতে হয়, চিন্তার নাড়ানিটাকে কিভাবে ফলপ্রসূভাবে নাড়াতে হয়। সে শিখেছে কিভাবে চিন্তার সুতোটার একেকটা মোচড় সভ্যতাকে ধাপে ধাপে বদলে দিয়েছে। সেই সুতোটা সে ধরতে চায়—তাতে সে নিজের মতো ক'রে দুয়েকটি মোচড় দিতে চায়।

জ্ঞানপুরী থেকে এক বন্ধুর প্ররোচনায় সে গেল 'জ্ঞানাগারে'—জ্ঞান চুরি করতে। সেখানেও সে শিখল চিন্তার সুতোটাকে অন্যভাবে মোচড়াতে। সে জানল নিউটন যদি ক্যালকুলাস আবিষ্কার না করতেন তাহলে সে নিজে কিভাবে তা করত, কুয়োর ব্যাঙ কেন আজীবন লাফিয়েও কুয়ো থেকে বের হতে পারে না, কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এমন ঘটনাকে যে এক মাথাবিশিষ্ট এক রাক্ষস নিজের মাথা ছিড়ে নিজে খাচ্ছে, সৃষ্টিকর্তা নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না—তাঁর এই অক্ষমতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়, এবং এরূপ আরো অনেক রহস্য। এবং তার অর্জিত *দৃষ্টিকোণকে* প্রয়োগ ক'রে সে নিজেই আবিষ্কার করল রহস্যময় অথচ বাস্তব এক সরলরেখা যার একটাই মাত্র প্রান্ত। সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ সমাধান দিল রাসেলের সেট থিওরি সম্পর্কিত ধাঁধার, যা রাসেল নিজেও সঠিকভাবে দিতে পারেননি। ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করল সক্রেটিসের শিক্ষক জিনোর প্রধান ধাঁধাকে। উদ্ভাবন করল 'প্রক্রিয়াতত্ত্ব', যা চিন্তার ক্ষেত্রে নোতুন বিপ্লবের সূচনা করবে ব'লে তার শিক্ষক মনে করেন।

অসীম অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য আলোকবিন্দু। সে তা থেকে দুহাত ভ'রে কুড়িয়ে নিতে চায়। কিন্তু অবশেষে তার জ্ঞানের সাথে সংঘর্ষ লেগে গেল তার জীবনের—বিশুদ্ধ সত্যকে জানলে যা হয়। আর তাই তার এই অবিরাম ছুটে চলা।

www.pathagar.com

Word Making Tactics—1

— by S. M. Zakir Hussain

এই বইটি একটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী বই। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ : এতে থাকবে-জানা word থেকে অসংখ্য নোতুন নোতুন word গঠন করার কৌশল।

অজানা/জানা root থেকে আরো অনেক word গঠন করার কৌশল।

যিনি ইংরেজি বেশ জানেন অথচ কথা বলার সময় সঠিক Wordটি মনে করতে পারেন না, কিংবা যিনি মনে করেন যে জানা word ও সময়মতো তার কাজে লাগে না, বা আয়ত্ত হয় না, তার জন্যই এই বইটি অত্যন্ত উপকারে আসবে। উচ্চাকাঙ্খী পাঠকের জন্যই এই বইটি। এই বইটি আপনাকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করবে যে, ইংরেজি word মাতৃভাষার শব্দের মতই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

Tactics for Learning Phrasal Verbs

— by S. M. Zakir Hussain

Phrasal verbs/Group Verbs Spoken এবং written উভয় ইংরেজিতে কত গুরুত্বপূর্ণ তা লক্ষ্য করেছেন? অথচ চোখ বুঁজে মুখস্থ না ক'রে ক'জন তা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে? তাছাড়া মুখস্থ ক'রে কি কোনোকিছু পুরোপুরি 'হৃদয়ঙ্গম' করা যায়? কিন্তু উপায় যে নেই—একথা বলছেন? না, উপায় অবশ্যই আছে। এই লেখক এই বইটিতে চমৎকার কিছু কৌশল উপহার দিয়েছেন যা দ্বারা আপনি অধিকাংশ Phrasal Verb-ই মাতৃভাষার মতো আয়ত্ত করতে পারবেন। প'ড়েই দেখুন। পড়লেই বুঝবেন যে, এই লেখকের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ জটিল অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী ক'রে উপস্থাপন করা—এই বইটিতেও সমানভাবে ফুটে উঠেছে।

Effective Listening And Smooth Pronunciation

— by S. M. Zakir Hussain

ধরা যাক, আপনি বেশ ভালোই ইংরেজি জানেন। কিন্তু যেটুকু জানেন তা কি শুদ্ধভাবে ও সাবলীলভাবে বলতে পারেন? শুদ্ধভাবে বলতে গেলে তা আর সাবলীল হয়ে ওঠে না, আবার সাবলীলভাবে বলতে গেলে তা আর স্বাভাবিক হয় না, কষ্টকর এবং কৃত্রিমতাপূর্ণ হয়ে ওঠে—এই বুঝি আপনার সমস্যা? একই সাথে নিজের জানা ইংরেজি ও অপরের মুখে (বিশেষত খোদ ইংরেজি ভাষীদের মুখে) শুনলে তা আর বোধগম্য হয় না? accent, stress, intonation, assimilation ইত্যাদির গোলকধাঁধায় word-গুলো এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে যায় যে, জানা ইংরেজিও তাদের মুখে শোনার সময় প্রতিটি word-কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয়। ফলে মোটের উপর কিছু বুঝতে পারেন না? একজন ইংরেজি-জানা ব্যক্তির পক্ষে এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক সমস্যা।.কিন্তু এই সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন এই বইতেই। একরত্তি এক বই, অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই এই বইটি আপনার ইংরেজি বলার ও শোনার ক্ষমতা কমপক্ষে ২০ গুণ বাড়িয়ে দেবে। প'ড়েই দেখুন। বইটি কানের ময়লা সাফ করবে, জিহ্বাকে তৈলাক্ত করবে। বইটির আগে নাম ছিল Effective Listening and Smooth Speaking.

Effective Writting Skills for Advanced Learners

— by S. M. Zakir Hussain

ব্যবহারিক বা শিক্ষাগত জীবনে পত্র, রচনা, রিপোর্ট, কলাম, প্রবন্ধ, গল্প—ইত্যাদি সবাইকেই লিখতে হয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিল করা চাট্টিখানি কথা নয়। লেখার গুণ ও মানের উৎকর্ষই তার সার্থকতা নির্ধারণ করে। বাংলা বা ইংরেজি যে ভাষাতেই হোক, এসব লেখার জন্য কতকগুলো আয়াস-সাধ্য কৌশল অর্জন করা আবশ্যক। কাঁচা হাতকে কেরানির মতো অনর্গল লিখে পাকা করা যায় না, তা করতে হলে শেখা চাই শক্তিশালী কতকগুলো কৌশল। বক্তৃতা, বাণিজ্যিক পত্র, প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন পত্র বা রিপোর্ট ইত্যাদির সার্থকতা মূলত তাদের রচনার কৌশলগুলোর ওপরই নির্ভরশীল। এমনকি ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই গদ্য-রচনার যাদুকরী রীতির প্রয়োগ দ্বারা সত্যিকারের সোনার ফসল ফলানো সম্ভব। এই বইটি আপনার গদ্য-লেখার দক্ষতা অদ্ভুতভাবে বাড়িয়ে দেবে। অন্যের লেখার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে কীভাবে লেখায় নিজস্ব style সৃষ্টি করতে হয়, তাও জানা দরকার। এসবই পাচ্ছেন এই বইটিতে। কেবল তত্ত্বীয় জ্ঞানের জন্য এই বইটি নয়, এ থেকে যা শিখবেন তা সাথে সাথে প্রয়োগও করতে পারবেন। বইটি হোক আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের নিত্যসঙ্গী।

How to Speak English Fluently Book—1

— by S.M. Zakir Hussain

বাংলা ভাষায় এ বিষয়ের উপর লেখা অন্য কোন বইয়ের নজির আজও সৃষ্টি হয়নি। এটাই প্রথম। যারা ইংরেজি জেনেও ঠিকমত বলতে পারেন না, কিংবা যারা মনে করেন যে তারা যেটুকু ইংরেজি জানেন তা অন্তত কথা বলার

www.pathagar.com

জন্য যথেষ্ট কিন্তু বলার সময় ভালভাবে বলতে পারেন না, কিংবা যারা অন্যের ইংরেজি শুনে বুঝতে সক্ষম কিন্তু নিজে বলতে অক্ষম, তাদের জন্য এই বইটির কোনো বিকল্প নেই। আপনি যদি উপরোক্ত তিনটি অবস্থার যে-কোনো একটির মধ্যে নিজেকে খুঁজে পান, তাহলে একথা সত্য যে আপনি মুটামুটি ভাল ইংরেজি জানেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় নোতুন ক'রে ইংরেজি শিখতে গেলে আপনি তেমন লাভবান হবেন না। দরকার শুধু এই বইটির। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠাই আপনাকে এর সত্যতার প্রমাণ দেবে। আবার বইটি এমনভাবে রচিত যে একেবারে অল্প ইংরেজি জানা ব্যক্তির জন্যও এটা সমানভাবে কার্যকরী হবে। এই লেখকের অন্যান্য বই পড়ার অভিজ্ঞতা থাকলে পূর্ণ আত্ম-বিশ্বাস নিয়েই এই বইটিও পড়ুন।

How to Speak English Fluently Book—2

— by S. M. Zakir Hussain

বলাই বাহুল্য যে, Book-1 ভালো লাগলে Book-2 আরো ভালো লাগবে।

Magic Rules of Pronunciation Book—1

— S. M. Zakir Hussain

বলুন দেখি . . . ?

treat—এর উচ্চারণ "ট্রীট্"

কিন্তু threat—এর উচ্চারণ "থ্রেট্" কেন? অর্থাৎ "ea" = কখনও "ঈ" আবার কখনও "এ" কেন? কিংবা beatific—এর উচ্চারণ "বিঅ্যাটিফিক্" কেন? অর্থাৎ এক্ষেত্রে "ea" = "ইঅ্যা" হল কেন?

একইভাবে hat = "হ্যাট", অথচ

hate—"হেইট্",

এবং father—"ফাদ্যার্"।

অর্থাৎ "ট" = কখনও "অ্যা", কখনও "এই", আবার কখনও "আ" হচ্ছে।

bough—এর উচ্চারণ "বাউ", কিন্তু

rough—এর উচ্চারণ "রাফ্" কেন? কেন "রাউ" নয়?

numb—শব্দে "ঠ" উচ্চারিত হবে কি?

column, palm—ইত্যাদি word-এর সঠিক উচ্চারণ কী?

debt, wrestle, qualm—ইত্যাদি ষমরট-এর সঠিক উচ্চারণ কি?

আবার : but—বাট্, কিন্তু put—পুট্-u-এর উচ্চারণ কোথাও "আ" কোথাও "উ"। অধিকন্তু cute-এ u-এর উচ্চারণ "ইউ"। university-তে u = ইউ, অথচ utmost-এ u = "আ"। কেন? dull, null, skull ইত্যাদিতে u = আ, অথচ bull, pull-এ u = উ। hire-এ i = আইঅ্যা, কিন্তু time-এ i = আই, আবার bird-এ i = অ্যা। finish-এ i = ই, অথচ finite-এ i = আই। কিন্তু কেন?

তাহলে কি প্রতিটি word-এর উচ্চারণ আলাদা আলাদাভাবে মুখস্থ করতে হবে?

না। একেকটি নিয়ম জেনে হাজার হাজার ষমরট-এর উচ্চারণ সঠিকভাবে করা সম্ভব। এই বইতে এমন কিছু নিয়ম বর্ণনা করা হবে। এসব নিয়মের (কৌশলের) আরেকটি উপকার এই যে কোনো word-এর অর্থ আপনি যদি না-ও জানেন তবু এগুলোর সাহায্যে তা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন।

যারা ইংরেজি প্রথমে শিখছেন, কিংবা যারা শুধু জানা word ছাড়া অন্যান্য word-এর উচ্চারণ করতে পারেন না, যারা শিক্ষকতা করেন কিন্তু ছাত্র/ছাত্রীদেরকে সহজে এবং কৌশলে উচ্চারণ শেখানোর জন্য কোনো পদ্ধতি হাতের কাছে পাচ্ছেন না, যারা TOEFL করবেন তাদের সবার জন্যই এই বইটি অত্যন্ত উপকারী ব'লে প্রমাণিত হবে। তাছাড়া যে-সব উচ্চাকাঙ্ক্ষী পিতা-মাতা বা অভিভাবক তাদের সন্তানদেরকে অতি অল্প বয়স থেকে ইংরেজি উচ্চারণ সঠিকভাবে এবং অত্যন্ত সহজে শেখাতে চান, তাদের জন্য এই বইটি হবে একটি অনন্য আকর্ষণ। এরূপ বই বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয়টি নেই।

A Systematic Approach to Critical Reasoning And Analytical Ability

— by S. M. Zakir Hussain

TOEFL, GMAT, GRE, SAT, BCS, MBA BBA Admission প্রভৃতি উচ্চমার্গের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সবচেয়ে কঠিন sectionগুলো হল—অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর মতে—Reading Comprehension এবং Critical Reasoning বা Analytical Ability (এবং I.Q) section দুটি। বছর বছর সাধনা করেও অনেকে এই section দুটির উপর পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটিকে যতটা কঠিন মনে হয় তা ততটা কঠিন নয়। সঠিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি এবং কৌশল অবলম্বন করতে পারলে এই section দুটিতে (প্রায়) ১০০% নম্বরই পাওয়া সম্ভব। তবে উক্ত পরীক্ষাগুলোর জন্য বাজারে যে-সব বিদেশি গাইড বই পাওয়া যায় সেগুলোর সাহায্যে অতটা সাফল্য পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়, যদিও সেগুলো খুব উপকারী। এ ব্যাপারে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে হলে এই লেখকের এই বই দুটি পড় ন। বিস্ময়কর বই। প্রথম বইটি Critical Reasoning Analytical Ability, I.Q. Test এবং অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার জন্য।

www.pathagar.com

British and American English Differentiated

— by S. M. Zakir Hussain

আধুনিক যুগের শিক্ষিত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের জন্য বইটি অত্যাবশ্যক। কারণ আপনি যে ইংরেজি লেখেন বা বলেন, তাতে যদি British এবং American English মিশ্রিত থাকে, তাহলে তা পড়ে বা শুনে Britishরা যেমন হাসবে তেমনি ঠাট্টা করবে Americanরা। এ কারণে আন্তর্জাতিক Correspondence, লেখালেখি—ইত্যাদি ক্ষেত্রে যারা জড়িত তাদের উচিত এই দুই ইংরেজির মধ্যকার প্রধান পার্থক্যগুলো জেনে রাখা। বিশেষ করে, TOEFL, GMAT, GRE, SAT ইত্যাদির ছাত্রদের জন্য এই পার্থক্য জানা আবশ্যক।

Tough English Made Simple

— by S. M. Zakir Hussain

এই বইতে ইংরেজি ভাষার কিছু জটিল অথচ অত্যাবশ্যক construction, তাদের গঠন পদ্ধতি, ব্যবহার এবং উপযোগিতা আলোচিত হয়েছে। Spoken এবং Written উভয় ইংরেজিতেই এই construction-গুলো অনেককেই খুব ভোগায়। আবার TOEFL, GMAT, GRE, SAT, Bcs-সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এবং বাস্তব জীবনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই construction-গুলো বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। সুতরাং, এই বইটি আপনার দরকার। সর্বোপরি, এই লেখকের স্বভাবজাত উপস্থাপন-পদ্ধতির বন্ধুত্বপূর্ণ ছোঁয়ায় জটিল জিনিসগুলো যে কত উপভোগ্য এবং সহজপাঠ্য হয়ে উঠেছে তা বইটি পড়লেই বুঝবেন।

The Beauty of Mathematics

— by S. M. Zakir Hussain

সত্যিকার অর্থে বড় হতে গেলে গণিতভীতির বদলে মনের মধ্যে গণিতপ্রীতিই চাঙ্গা ক'রে তোলা চাই। গণিত না জেনে কে কবে কোথায় প্রখর, প্রলয়ংকরী, বা গঠনমূলক চিন্তাশক্তি অর্জন করেছে? অথচ সচরাচর শিক্ষার্থীদের ধারণা গণিত নীরস—তা কেবল কতকগুলো যান্ত্রিক সমীকরণের সমষ্টি। ফলে তারা গণিতবিমুখ থাকে। প্রচলিত পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান-পদ্ধতি, এবং পরীক্ষা-পদ্ধতিও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গণিতের মতো এত গভীর, সুন্দর, আনন্দদায়ক বিজ্ঞান আর দ্বিতীয়টি নেই। বিজ্ঞানের ভাষা হলো গণিত। আবার বৈজ্ঞানিক এবং বৌদ্ধিক চিন্তার সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ারও গণিত। তা শুধু পাঠ্যবইতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, চিন্তায়-মননে এবং সার্বক্ষণিক চৈতন্যে তাকে তুলে আনতে হবে। গণিত এক অনাবিল আনন্দের ক্ষেত্র। গণিত-দীক্ষিত চোখ এবং মন প্রকৃতিজগতের দিকে তাকিয়ে তার প্রকৃত রহস্যময় রূপকে দেখতে সক্ষম হয়।

কিন্তু কেবল ফর্মূলা মুখস্থ ক'রে গণিত শেখা যায় না। এই বইটি পড়লেই বুঝা যাবে গণিত আসলে কী। এমনকি যার গণিতের ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, তিনিও বইটি পড়তে পারবেন। বইটি মূলত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য॥ কিন্তু অ-গণিতবিদ চিন্তাবিদ বা বুদ্ধিজীবিগণও বইটি প'ড়ে অত্যন্ত লাভবান হবেন। এমনকি গণিতের শিক্ষার্থীদের কাছেও—যারা কেবল পরীক্ষা ঠেকাবার উদ্দেশ্যে 'সিলেবাস' অনুযায়ী গণিত শিখেছেন—এই বইটি একটি সুখপাঠ্য এবং রহস্য-উদ্‌ঘাটনকারী বিনোদনমূলক বই হিসেবে প্রতীয়মান হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের যে-সব শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হতে চান, তাদের জন্য এই মুহূর্তে এই বইটি অবশ্যপাঠ্য। এই বইটি পড়লে ভবিষ্যতে আর 'চোখে অন্ধকার দেখার' ঝামেলায় পড়তে হবে না। বইটি পড়ুন : গণিতের অসীম বাস্তবতাকে 'অনুভব' করার দক্ষতা অর্জন করুন। বাংলা ভাষায় এরূপ বই এটাই প্রথম। যারা সাধারণ এবং সার্বিক ধারণা অর্জন করার জন্য বইটি পড়তে চান, তাদেরকে বইটি পড়ার সময় হাতের কাছে কাগজ-কলম না রাখলেও চলবে।

নারীর মন — এস. এম. জাকির হুসাইন

নারী মনস্তত্ত্বের গোপন এবং রহস্যময় দিকগুলি নিয়ে একটি তত্ত্বীয় গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় এরূপ বই এখনও রচিত হয়নি, যা হয়েছে তা কেবল তথ্যভিত্তিক ইতিহাস-নির্ভর উপ-গবেষণা, তত্ত্বীয় কিছু নয়। এই বইতেই প্রথম দেখানো হয়েছে দেহে এবং মনে নারী কতখানি নারী এবং কেন, পুরুষ নারীর কাছে আসলে কী চায়, নারী কেন পুরুষকে ভুল বোঝে, নারীর মনের গোপন কোণে আসলেই কোনো অপূর্ণ বাসনা লুকিয়ে আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়। বইটিতে পরিশোধিত করা হয়েছে ফ্রয়েডের তত্ত্বকে, এবং দাঁড় করানো হয়েছে নোতুন এবং গাণিতিকভাবে ঘাতসহ একটি তত্ত্ব—যা সম্ভবত নারী-মনস্তত্ত্বের ওপর এযাবতকালের সবচেয়ে সফল এবং নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব। এই তত্ত্বই যৌক্তিক-মনস্তাত্ত্বিক-দার্শনিক উপায়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তথাকথিত 'নারীবাদ'-এর যৌক্তিকতা কতখানি, নারীর প্রতি মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই বা মানবিক কি না। বইটির মূল প্রতিপাদ্য হলো এই যে, নারীর যাবতীয় স্বজাতিসুলভ আচরণ তার যৌনতার নিজস্ব রীতি দ্বারা নির্ধারিত, এবং বইটিতে সেই যৌনতার মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে। নারী নিজেই জানে না সে কতটুকু পরিমাণে নারী। পুরুষও তাকে নিজের যুক্তি দিয়ে গড়তে চায় ব'লে ভুল করে।

www.pathagar.com

উদ্ভাবনী চিন্তার কাঠামো : বর্হিজগৎকে আমরা যেভাবে জানি

— এস. এম. জাকির হুসাইন

পরমাণুবিজ্ঞানী ড. শহীদুল্লাহ মৃধার মতে, 'আমি তো বিস্ময়ে বিমূঢ়, হতবাক হয়ে গেছি। লেখক মূল জায়গাটাতেই হাত দিয়ে ফেলেছেন। তিনি শুধু তত্ত্বই দেননি, তার প্রয়োগের উপায়টাকেও পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। লেখক একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন।'

Mastering Tenses

— by S. M. Zakir Hussain

Learning tenses in five days and teaching in one.

Tense শেখার এবং শেখানোর একটি সম্পূর্ণ নোতুন উপায়। Tenseকে 'গঠন' করার দরকার হবে না, তা চিন্তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই উৎপন্ন হবে। ১২ প্রকার tense মনোভাব প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয় কেন, এবং অন্যান্য আর কী tense ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয়, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও থাকছে। Written এবং Spoken English-এ এবং British এবং American English-এ tense এবং ভিন্ন জাতীয় প্রয়োগ কখন এবং কেন হয় তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে।

Natural Spoken English

— by S. M. Zakir Hussain

কৃত্রিম নয়, খোদ ইংরেজরা এবং Americanরা যেভাবে Spoken English ব্যবহৃত করে, ঠিক তাই। বইটির আগের নাম ছিল 'Short-Cut Ways of Speaking English'।

কোরআনের আলোকে
প্রাণের প্রাগৈতিহাসিক উৎস
এবং
মানব মনের গুপ্ত রহস্য

— এস. এম. জাকির হুসাইন

ড. শহীদুল্লাহ মৃধার ভাষায় : "আমার হতাশা কেটে গেছে। ভেবেছিলাম এই জাতির জীবনে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা নিয়ে কেউ আসবে না। কিন্তু নিঃসঙ্গ তরুণ চিন্তাবিদ এবং হবু দার্শনিক এস. এম. জাকির হুসাইন সেই গুরুদায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছেন দেখে আশান্বিত হয়েছি।"

বইটির নাম থেকে বুঝা যাচ্ছে তার বিষয়বস্তু কী। বইটি পড়তে পড়তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকতে হয়! ধার্মিক নাস্তিক সবার জন্য অবশ্যপাঠ্য—মুসলিম তো বটেই। লেখক বইটিতে প্রাণ সৃষ্টির প্রাগৈতিহাসিক উৎসের রহস্য উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে দেখেছেন যে ১৪০০ বছর আগে কোরআনেই প্রিকামব্রিয়ান, মেসোজোইক, সিনোজাইক, ইত্যাদি মহাযুগের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার স্তরভেদকে চিত্রিত করা হয়েছে।

তিনি এই সর্বপ্রথম সার্থকভাবে বিবর্তনবাদের সাথে কোরআনের সাযুজ্যকে দেখাতে পেরেছেন, এবং একই সাথে কিছু নাস্তিক বিজ্ঞানীর ধ্যান ধারণাকেও মিথ্যা প্রমাণিত ক'রে দিয়েছেন। বইটিতে চমৎকার ভঙ্গিতে ফুলের পাপড়ির মতো স্তরে স্তরে খুলে দেয়া হয়েছে মানব মনের গুপ্ত রহস্যটিকে। আজই পড়ুন।

A Dictionary of English Structures

— by S. M. Zakir Hussain

The Pleasure of Idiomatic English

— by S. M. Zakir Hussain

The Politics of Managing The Boss

— by S. M. Zakir Hussain

Rohel's Make Sound and Smooth Speaking

Rohel Vocabulary-Add

Rohel Pocket Dictionary

www.pathagar.com

ROHEL
Dictionary of
Synonyms and Antonyms
with subtle differences of meaning

এই ধরনের একটি বই শুধু যে বাংলা ভাষাতে নেই তা নয়, ইংরেজি ভাষাতেও তা বিরল। অথচ ঠিক এরূপ একটি বই-ই আপনার দরকার। কারণ synonym Antonym এরন যে-সব বই (dictionary বা thesaurous) আপনি পড়ে থাকেন, তাতে কেবল কোনো word এর synonym এবং/বা antonym এবং কিছু উদাহরণ দেয়া থাকে, কিন্তু কোনো word তার synonym (সমার্থক শব্দ) এর সাথে কতখানি বা কতটুকু পরিমাণে সমার্থক, এবং তার antonym (বিপরীতার্থক শব্দ) এর সাথে কতটুকু পরিমাণে বিপরীতার্থক তা তাতে দেয়া থাকে না। কিন্তু আপনার আসলে দরকার এসব বিষয়ই। GMAT, GRE, SAT, TOEFL, BBA, MBA, Admission Test, BCS ইত্যাদিতে যে synonym Antonym section, sentence completion section, analogy section ইত্যাদি থাকে, তার সঠিক উত্তর করতে হলে এসব সূক্ষ্ম বিষয় অবশ্যই জানা দরকার। ব্যাপারটি আপনি নিজেই ভাল বুঝতে পারবেন যদি GMAT, GRE ইত্যাদির ভাল গাইড বই (যেমন Cliff's, Barron's, ARCO ইত্যাদি) বের ক'রে কিছুক্ষণ পড়েন। দেখবেন যে, কোনো একটি word এর শুধু synonym বা antonym জানলে সেখানে কোনো লাভই হচ্ছে না, যা জানতে হয় তা হল একটি synonym এর সাথে অন্য একটি synonym এর মিল এবং পার্থক্য আসলে কতখানি তা। আর এসব কারণেই বাজারে প্রচলিত দেশি-বিদেশি কোনো বইতেই আপনার তেমন কোনো উপকার হয় না। synoym antonym এর এসব বিষয় কেবল এই বইতেই পাবেন।

আরো কিছু কারণে এই বইটি আপনার জন্য একটি আদর্শ বই। যেমন এই বইয়ের প্রতিটি word এর এবং তার synonym এর antonym এর বাংলা ও ইংরেজি অর্থ-(definition) দেয়া থাকবে। ফলে সাধারণ word শেখার জন্যই আপনি সরাসরি এই বইটি পড়তে পারেন। প্রতিটি word এর (synonym এবং antonymxy) ব্যবহার sentence এর মাধ্যমে দেখানো হবে। প্রতিটি word এর বিভিন্ন part মত speech এর রূপও এতে পাবেন। অধিকন্তু, এতে পাচ্ছেন জটিল এবং high frequency word এর synonym এবং antonym। সুতরাং, এ ধরনের বই যদি আপনার পড়তেই হয়, তাহলে কেবল এই বইটিই পড়ুন।

সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ—১
(সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন)

– সৈয়দ শওকতুজ্জামান

সমাজবাসী মানুষের কল্যাণের জন্য সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কোথায় কখন কিভাবে কি ধরনের কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছিলো এর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যভিত্তিক বিবরণ বিবৃত হয়েছে এ বইটিতে। একই সাথে সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচিতি আছে। তাতে পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে ক্রমবিবর্তন ধারার বৈচিত্র্যে সমাজকল্যাণ দর্শন কিরূপ বিকশিত ও বিস্তৃত এর একটি রূপরেখা তুলে ধরার সযত্ন প্রয়াসও এতে সহজে লক্ষ্য করা যাবে। বইটি পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা বিবেচনায় লিখিত হলেও সমাজকল্যাণের অনেক মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাম্প্রতিক তথ্যগত বিশ্লেষণ। ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, উন্নয়নকর্মীসহ সামাজিক উন্নয়নে উৎসাহী সকলের কাছে এটি একটি আবিশ্যিক বই।

www.pathagar.com

সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ—২

(মানবীয়, বৃদ্ধি-বিকাশ, আচরণ ও পরিবেশ)

– সৈয়দ শওকতুজ্জামান

মানুষের আচরণ, বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং মানবীয় আচরণে পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যাত হয়েছে এ বই-তে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনকে মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে সুখ-সমৃদ্ধি করার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ ও তা প্রয়োগের বিষয়াদি জেনে সমাজকল্যাণ-সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সমাজকর্মীরা উপকৃত হতে পারবেন।

সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ—৩

(সামাজিক উন্নয়নঃ নীতি, পরিকল্পনা ও সেবাকার্যক্রম)

– সৈয়দ শওকতুজ্জামান

সামাজিক উন্নয়ন কথাটি উন্নয়ন সাহিত্যে একটি নোতুন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। উন্নয়নে মানুষ, সমাজ ও পরিবেশ মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে সমাজকর্মী, উন্নয়নকর্মী, নীতি-নির্ধারক ও পরিকল্পনা অনুশীলনকারীদের সামাজিক উন্নয়ন ব্যাপক অধ্যয়ন দরকার হয়। সেজন্য উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা এবং সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে এ বইতে। এসব বিষয়ের পরিচিতিমূলক বিবরণ, মূল্যায়নধর্মী বক্তব্য ও ব্যবহারিক অনুশীলনের জ্ঞান-দক্ষতা অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় বই।

সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ—৪

(সামাজিক সমস্যা ও এদের বিশ্লেষণ, সামাজিক কার্যক্রম, সমাজ সংস্কার এবং সামাজিক আইন)

– সৈয়দ শওকতুজ্জামান

সামাজিক সমস্যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যার কারণ-প্রতিকার এবং সামাজিক কার্যক্রম-সংস্কার ও সামাজিক আইন বিষয়ে এ বইটি একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভিত্তিক আলোচনা। বইটিতে সামাজিক প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যা মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মতৎপরতার বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে সমাজকর্মীরা সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ার সাথে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভে সক্ষম হবেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন সমাজসংস্কার আন্দোলনের স্বরূপ-প্রকৃতি ও অবদান সম্যক অবহিত হবার মধ্য দিয়ে তারা নিজ জ্ঞান-অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাবেন। অন্যদিকে সমাজকল্যাণের একটি দিক বা হাতিয়াররূপে সামাজিক আইনের ধারণাগত দিক তুলে ধরে এর সাথে নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, শ্রমকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ফলে সমাজউন্নয়নে জড়িত বা সমাজকল্যাণ প্রত্যাশী ব্যক্তিবর্গ ও সমাজকর্মী বইটি পাঠ করে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ—৫

(সমাজকর্ম পদ্ধতি ঃ ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্ম)

– সৈয়দ শওকতুজ্জামান

পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনে সমৃদ্ধ জ্ঞান-দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। সমাজকর্ম অনুশীলন পদ্ধতির মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্ম পদ্ধতি অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত। এ দু'টি

www.pathagar.com

পদ্ধতি অনুশীলনের কর্মধারা উন্নত দেশে সুসংহত ও সুসংগঠিত এবং বিস্তৃত কর্ম-পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত কিন্তু অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলো এ ব্যাপারে আশাব্যঞ্জকভাবে অগ্রসর নয়। এ দু'পদ্ধতির সুসংহত জ্ঞান-দক্ষতা অর্জনে সমাজকর্মীদের কার্যকরভাবে সমৃদ্ধ হতে এ বইটি ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে।

সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ—৬

(জনসমষ্টি সমাজকর্ম ঃ গ্রামীণ ও শহর সমাজ প্রেক্ষিত)

– সৈয়দ শওকতুজ্জামান

জনসমষ্টি উন্নয়ন কি, কিভাবে কোন পদ্ধতি কৌশলে সমষ্টিগতভাবে জনগণের উন্নয়ন আনা যায় এ বিষয়টি এদেশে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় অনুশীলন হলেও এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান-দক্ষতার ব্যাপকতর ও কার্যকর প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ বইটিতে উল্লেখিত দিকগুলোর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাতে পল্লী জনসমষ্টি উন্নয়ন ও শহর সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় এবং বর্তমান বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত মূল্যায়নধর্মী বিবরণ বিবৃত করা হয়েছে। পল্লীবাসীর উন্নয়ন এবং শহর সমাজ উন্নয়নের কার্যকর কর্মপ্রক্রিয়া গড়ে তোলা এবং বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান-দক্ষতার প্রয়োগ ক্ষমতা অর্জনে এ বইটি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আবশ্যক।

সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ—৭

(সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান)

– সৈয়দ শওকতুজ্জামান

সামাজিক গবেষণা একটি অতি প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা হিসাবে স্বীকৃত। সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞান সম্মত অনুসন্ধান, সামাজিক উন্নয়নের সঠিক পথ-নির্দেশনা লাভ এবং সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম গ্রহণ মূল্যায়নে সামাজিক গবেষণার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এ বইটিতে সামাজিক গবেষণার কর্ম পদ্ধতির বিবরণ ও অনুশীলন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ আবশ্যকীয় বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে। এর সাথে প্রসঙ্গক্রমে তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি তথা পরিসংখ্যান কৌশল সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় আলোচনা বিবৃত করা হয়েছে। সমাজকর্মীসহ সামাজিক গবেষণায় আগ্রহী ও এ কাজে জড়িত সকলেই এ বই পাঠে উপকৃত হবেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

To distribute knowledge,
education, and pleasure is our mission.